বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩:
একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

**(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির
৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সভায় অনুমোদিত)**

ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com; barkatabul71@gmail.com

প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপিত "বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩"
(বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা: ২২ মে, ২০২২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির
৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সভায় অনুমোদিত)

ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com; barkatabul71@gmail.com

প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপিত "বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩"
(বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে)

অনলাইনে সংযুক্ত:

জেলা (৬৪টি): কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, খুলনা, গাজীপুর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালপুর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, দিনাজপুর, নওগাঁ, নরসিংদী, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, পাবনা, পিরোজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাগেরহাট, ভোলা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, মুন্সিগঞ্জ, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ী, রাজশাহী, লক্ষীপুর, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

উপজেলা (১০৭টি): ইটনা, কটিয়াদি, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন ও হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা, ৭টি); উলিপুর, চিলমারী, কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ি (কুড়িগ্রাম জেলা, ৪টি); কুমারখালী ও ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া জেলা, ২টি); দাকোপ, ডুমরিয়া, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, কয়রা ও ফুলতলা (খুলনা জেলা, ৬টি); ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশিগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ি (জামালপুর জেলা, ৬টি); নলছিটি, রাজাপুর (ঝালকাঠি জেলা, ২টি); পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও জেলা, ১টি); কহারোল, বিরামপুর (দিনাজপুর জেলা, ২টি); লোহাগড়া (নড়াইল জেলা, ১টি); কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার, সৈয়দপুর (নীলফামারী জেলা, ৫টি); আটপাড়া, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, বারহাট্টা, মদন, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা জেলা, ৬টি); আটোয়ারী, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও বোদা (পঞ্চগড় জেলা, ৪টি); কলাপাড়া, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, রাঙাবালি (পটুয়াখালী জেলা, ৪টি); পাবনা সদর, বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর (পাবনা জেলা, ৪টি); নাজিরপুর, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর জেলা, ৪টি); আমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা (বরগুনা জেলা, ৩টি); আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী (বরিশাল জেলা, ৮টি); ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও মোংলা (বাগেরহাট জেলা, ৩টি); চরফ্যাশন, তজুমদ্দিন, লালমোহন (ভোলা জেলা, ৩টি); গফরগাঁও, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ত্রিশাল, ফুলপুর, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলা, ৭টি); শ্রীপুর (মাগুরা জেলা, ১টি); অভয়নগর, কেশবপুর, শর্শা, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা (যশোর জেলা, ৫টি); রংপুর সদর, কাউনিয়া, গংগাচড়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর (রংপুর জেলা, ৬টি); আদিতমারী, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট জেলা, ৪টি); গাইবান্ধা সদর, সাদুল্যাপুর (গাইবান্ধা জেলা, ১টি) ঝনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদি (শেরপুর জেলা, ৪টি); কলারোয়া, তালা ও শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা, ৩টি)।

ইউনিয়ন (২১টি): নাওডাঙ্গা (কুড়িগ্রাম); দামোদর, ফুলতলা, কৌলাসগঞ্জ ও রংপুর (খুলনা); সিদ্ধকাঠি (ঝালকাঠী); চলিশিয়া, সুন্দলী ও সিদ্দিপাশা (যশোর); শ্রীপুর (মাগুরা); মৌডুবি ও লালুয়া (পটুয়াখালী); মিরুখালী (পিরোজপুর); ছোটবগী (বরগুনা); চরবাড়িয়া, নলচিড়া ও নাজিরপুর (বরিশাল); মাগুরা, চন্দনপুর ও খলিশখালী (সাতক্ষীরা); শশীভূষণ (ভোলা)।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ঢাকা: ২২ মে, ২০২২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট

স্বত্ব ২০২২ © বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬; মোবাইল : ০১৭১৬-৪১৮৫০০
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bea-bd.org

মূল্য: ৩০০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউরো ৩০, ব্রিটিশ পাউন্ড ২৫
(বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে)

প্রচ্ছদ
সৈয়দ এসরারুল হক

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭১-১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

ISBN : 978-984-35-2528-4

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০২২), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা: ২২ মে, ২০২২।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা: ২২ মে, ২০২২।

কৃতজ্ঞতা

একবিংশ শতকের বৈশ্বিক জীবনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্য-ফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, বর্বর পুঁজিবাদ, তথাকথিত নব্য উদারবাদ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, যুদ্ধ, সভ্যতার সংকট, মৌলবাদ, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে চরম অংসংগতি এমনিতেই 'বাংলাদেশ' নামের আমাদের রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভাবনায় রেখেছে; তার সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে কভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত অবস্থা এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভুত অনিশ্চিত এক প্রেক্ষাপট। সর্বব্যাপ্ত চরম নৈরাজ্যকর এই অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রায় পাঁচ হাজার সদস্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি'কে প্রতিনিয়তই তাড়িত করে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত ও চরম মেরুকৃত বর্তমান সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় "জনগণের স্বার্থ সবার উর্ধ্বে" তুলে ধরার জন্য কোনো পথের অনুসন্ধান দুরূহ এবং সুকঠিন এক কাজ। তবু মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদদের সংঘ হিসেবে সেই পথে অগ্রসর হওয়াকে আমরা সর্বদা পবিত্র দায়িত্ব হিসেবেই গণ্য করি।

আর সে কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমাত্রিক জ্ঞান, পারদর্শিতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি—সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতকে বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিকল্প একটি জাতীয় বাজেট প্রণয়নের গুরুদায়িত্বটি প্রদান করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সভাপতি তাঁর গভীর মেধা, শ্রম ও একনিষ্ঠতা দিয়ে বিকল্প বাজেটের খসড়া কার্যনির্বাহক কমিটির একাধিক নিয়মিত সভায় (জরুরি সভাসহ) উপস্থাপন করেন, যা ৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে (কার্যনির্বাহক কমিটির পঞ্চম সভায়) সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

যেখানে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে সরকারের অসংখ্য বিভাগ ও মন্দ্রণালয়েরর কয়েক সহস্রাধিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং সে বাজেট নিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন থাকেন—সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে 'বিকল্প বাজেট' প্রণয়ন করার মতো দুঃসাধ্য একটি কাজ প্রায় এক দশক ধরে সাফল্যের সঙ্গে পালন করার জন্য 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কার্যনির্বাহক কমিটি' গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

বিকল্প বাজেট প্রণয়ণের এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫২ জেলার বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশবিদ, উন্নয়ন ও সংস্কৃতি কর্মী, সাংবাদিক ও কৃষক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণিপেশার ৩৫১ জন প্রতিনিধি আঞ্চলিক সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে তাদের মতামত তুলে ধরে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির উদ্যোগে দেশের ৮টি বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যম জুম-এ মোট ৬টি প্রাক্-বিকল্প বাজেট আলোচনা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং বাজেটে অন্তর্ভুক্তযোগ্য সুপারিশ উপস্থাপন করে বিকল্প বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে সহায়তা করেছেন—**(খুলনা বিভাগ থেকে)** সহযোগী অধ্যাপক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক সুকুমার ঘোষ, ড. বিশ্বাস শাহীন, অধ্যাপক শাহানারা বেগম, অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া, সহকারী অধ্যাপক শাহেদ আহমেদ; **(ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগ থেকে)** অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান, পার্থ সারথী ঘোষ, অধ্যাপক ড. এম আব্দুস সাত্তার, কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত, শংকর সাহা, সজল কোরায়শী, মলয় মোহন বল, অধ্যাপক এ জেড এম রেজাউল করিম খান, মোঃ ফজলে এলাহি মাকাম, জিয়াউল কবির, কামাল হোসেন, ড. মোঃ মহিউদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আকবর কবীর; **(রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ থেকে)** অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান, অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন, অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক হাফিজ ইকবাল, আব্দুল আজিজ মজনু; **(বরিশাল বিভাগ থেকে)** সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান, কাজী মিজানুর রহমান, প্রভাষক মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা; **(সিলেট বিভাগ থেকে)** অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী, তানিয়া সুলতানা তন্বি, সৈয়দ আরাফাত জুবায়ের এবং **(চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে)** অধ্যাপক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ, এ টি এম কামরুদ্দিন চৌধুরী, মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম, খোরশেদুল আলম কাদেরী, অধ্যাপক হান্নানা বেগম—আমরা তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব" প্রণয়ণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর (এইচডিআরসি) কর্মীরা—গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন সারণি ও লেখচিত্র প্রস্তুতে সহযোগিতায় আবু তালেব, অজয় কুমার সাহা, এস এম ওবায়দুর রহমান; মূল পাণ্ডুলিপি বাংলা টাইপ ও পুনঃটাইপে মোঃ আরিফ মিয়া, মো. সাবেদ আলী, মোজাম্মেল হক, মো. কবিরুজ্জামান লাপ্পু ও সেলিম রেজা—এদের সবার কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির বাংলা বানান রীতি নিষ্ঠার সাথে দেখে দিয়েছেন অর্থনীতি সমিতির গবেষণা সহযোগী এস এম তারিকুল ইসলাম মুন্না এবং সময়মতো বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন অর্থনীতি সমিতির প্রশাসনিক কর্মকর্তা আনিসুর রহমান—তাদের ধন্যবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণের কাজটি মনোযোগসহকারে করেছেন সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন, ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ—এদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ছাপাখানায় যারা নিভৃতে দিন-রাত শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন—নিত্যচন্দ্র বর্মণ, আরিফ রাব্বানী, আবদুল লতিফ, আল ইমরান, গিয়াসউদ্দিন, ইমরান—সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে)

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা			iii
অধ্যায় ১:	ভূমিকা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে হবে জনগণতান্ত্রিক		১
অধ্যায় ২:	বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা		৫
অধ্যায় ৩:	বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩: জনগণতান্ত্রিক বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি		১১
অধ্যায় ৪:	বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩: জনগণতান্ত্রিক বাজেটে বৃহৎ বর্গভিত্তিক সুপারিশ		১৭
	৪.১	ভূমিকা	১৭
	৪.২	বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা	১৯
	৪.৩	সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনী-মানবকল্যাণ	২১
	৪.৪	মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট	২৪
	৪.৫	বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি	২৫
	৪.৬	রেমিটেন্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার	২৭
	৪.৭	পুঁজিবাজার	২৭
	৪.৮	ব্যাংক	২৮
	৪.৯	বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি	২৯
	৪.১০	বৈদেশিক ঋণ	৩০
	৪.১১	কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ	৩৩
	৪.১২	ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়	৪৫
	৪.১৩	ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা	৪৬
	৪.১৪	শিক্ষা—শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার	৪৮
	৪.১৫	স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত	৫৩
	৪.১৬	শিল্পখাত	৫৭
	৪.১৭	নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ	৬১
	৪.১৮	প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬৮
	৪.১৯	প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা	৭০
	৪.২০	গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ	৭৩
	৪.২১	দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা	৭৪
	৪.২২	সরকার টাকা পাবে কোথায়?	৭৬
	৪.২৩	মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ) এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ)	৮৮
	৪.২৪	বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়	৯১

	৪.২৫	শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৯২
অধ্যায় ৫:		২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিকল্প বাজেট: জনগণতান্ত্রিক বাজেট	৯৩
	৫.১	প্রাক্-কথন	৯৩
	৫.২	সরকারের বাজেট: প্রণয়ন ও মঞ্চায়নপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে	৯৪
	৫.৩	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প "জনগণতান্ত্রিক বাজেট": লক্ষ্য-অভীষ্ট ও কয়েকটি পদ্ধতিগত দিক প্রসঙ্গে	৯৯
	৫.৪	বিকল্প বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়?	১০৩
	৫.৫	বিকল্প বাজেট নিয়ে সম্ভাব্য সংশয়বাদী ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে	১০৬
	৫.৬	বিকল্প বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ হবে কোথায়?	১১৩
		৫.৬.১ তিনটি বড় মাপের বরাদ্দ-সংস্কার প্রস্তাব	১১৩
		৫.৬.২ খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাব	১১৫
	৫.৭	বিকল্প বাজেটের আয় আসবে কোথা থেকে?	১৩৮
		৫.৭.১ আয়ের নতুন উৎস	১৩৮
		৫.৭.২ রাজস্ব প্রাপ্তি	১৩৮
অধ্যায় ৬:		শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণতান্ত্রিক বাজেট—উপসংহার	১৪৯

সারণি ও ছক

সারণি ১:	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩" প্রণয়নের প্রাক্কালে বিভাগভিত্তিক পরামর্শ সভা/ মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের দেওয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তযোগ্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা	৪
সারণি ২:	২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বৃহৎ বর্গের বিষয়াদি ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা	১৮
সারণি ৩:	বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯	৮৪
সারণি ৪:	কেন্দ্রিভূত (ঢাকাকেন্দ্রিক) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব	৮৯
সারণি ৫:	ব্যয়ের বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট	১১৮
সারণি ৬:	বাজেট ব্যয়ের (বরাদ্দে) খাতওয়ারি অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২১-২২) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩)	১৩৬
সারণি ৭:	বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট ও অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩	১৩৭

সারণি ৮:	আয়ের বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট	১৩৯
সারণি ৯:	বাজেট আয়ের রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসসমূহের অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২১-২২) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩)	১৪৬
সারণি ১০:	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০২১-২২ বাজেটের তুলনা	১৫১
ছক-১:	জনগণতান্ত্রিক বাজেট বাস্তবায়নে আগামী ৫-৭ বছরে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন ও বৈষম্যাবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন সম্ভব—একটি ধারণাত্মক কাঠামো	১৫৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১:	২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা	১৫৭
পরিশিষ্ট ২:	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের নানা শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যম জুম-এ বাজেট প্রস্তুতি আলোচনা ও মতবিনিময়	১৬৯

অধ্যায় ১
ভূমিকা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে হবে জনগণতান্ত্রিক

যেহেতু ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধানমতে ***"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"*** [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১)] এবং যেহেতু ***"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"*** (অনুচ্ছেদ ১১), সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **বাজেট হতে হবে জনগণতান্ত্রিক**। এ নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সন্দেহ হবে অসাংবিধানিক। যুক্তিসংগত এসব কারণেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের উপ-শিরোনাম **"একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব"**।

আগামী ৯ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটের খসড়া বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবেন। এর ১৮ দিন আগে, অর্থাৎ আজ ২২ মে ২০২২ তারিখে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে "বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ এই প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপন করছি।

এ মুহূর্তে আজকের প্রেস কনফারেন্সে জুম-মাধ্যমে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন ঢাকাসহ দেশের **৬৪টি জেলা:** কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, খুলনা, গাজীপুর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালপুর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, দিনাজপুর, নওগাঁ, নরসিংদী, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, পাবনা, পিরোজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাগেরহাট, ভোলা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, মুন্সিগঞ্জ, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ী, রাজশাহী, লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ; **১০৭টি উপজেলা:** ইটনা, কটিয়াদি, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন ও হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা, ৭টি); উলিপুর, চিলমারী, কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম জেলা, ৪টি); কুমারখালী ও ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া জেলা, ২টি); দাকোপ, ডুমরিয়া, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, কয়রা ও ফুলতলা (খুলনা জেলা, ৬টি); ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ী (জামালপুর জেলা, ৬টি); নলছিটি, রাজাপুর (ঝালকাঠি জেলা, ২টি); পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও জেলা, ১টি); কাহারোল, বিরামপুর (দিনাজপুর জেলা, ২টি); লোহাগড়া (নড়াইল জেলা, ১টি); কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার, সৈয়দপুর (নীলফামারী জেলা, ৫টি); আটপাড়া, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, বারহাট্টা, মদন, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোণা জেলা, ৬টি); আটোয়ারী, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও বোদা (পঞ্চগড় জেলা, ৪টি);

কলাপাড়া, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, রাঙাবালি (পটুয়াখালী জেলা, ৪টি); পাবনা সদর, বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর (পাবনা জেলা, ৪টি); নাজিরপুর, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়ীয়া (পিরোজপুর জেলা, ৪টি); আমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা (বরগুনা জেলা, ৩টি); আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী (বরিশাল জেলা, ৮টি); ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও মোংলা (বাগেরহাট জেলা, ৩টি); চরফ্যাশন, তজুমদ্দিন, লালমোহন (ভোলা জেলা, ৩টি); গফরগাঁও, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ত্রিশাল, ফুলপুর, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলা, ৭টি); শ্রীপুর (মাগুরা জেলা, ১টি); অভয়নগর, কেশবপুর, শর্শা, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা (যশোর জেলা, ৫টি); কাউনিয়া, গংগাচড়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর (রংপুর জেলা, ৫টি); আদিতমারী, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট জেলা, ৪টি); ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী (শেরপুর জেলা, ৪টি); কলারোয়া, তালা ও শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা, ৩টি); **২১টি ইউনিয়ন:** নাওডাঙ্গা (কুড়িগ্রাম); দামোদর, ফুলতলা, কৈলাসগঞ্জ ও রংপুর (খুলনা); সিদ্ধকাঠি (ঝালকাঠি); চলিশিয়া, সুন্দলী ও সিদ্দিপাশা (যশোর); শ্রীপুর (মাগুরা); মৌডুবী ও লালুয়া (পটুয়াখালী); মিরুখালী (পিরোজপুর); ছোটবগী (বরগুনা); চরবাড়িয়া, নলচিড়া ও নাজিরপুর (বরিশাল); মাগুরা, চন্দনপুর ও খলিশখালী (সাতক্ষীরা); শশীভূষণ (ভোলা)। এ ছাড়াও সংযুক্ত আছেন দেশের বাইরে থেকে অনেকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এই দেশে একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন যারা গত সাত বছর জাতির উদ্দেশ্যে 'বার্ষিক বিকল্প বাজেট' লিখিতভাবে উত্থাপন করে আসছে। বিকল্প বাজেট প্রণয়ন ও উত্থাপন সংস্কৃতির শুরুটা হয়েছিল ২০১৫-১৬ অর্থবছরে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিকল্প বাজেট"[১] শিরোনাম দিয়ে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দেশপ্রেমিক গণমুখী মতাদর্শিক অবস্থান স্পষ্ট হয় গত ২০২০-২১ অর্থবছর বিকল্প বাজেটে সমিতির নিম্নলিখিত ঘোষণামূলক বক্তব্য থেকে: *"এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত 'দেশজ উন্নয়নদর্শন'-এর অন্তর্নিহিত ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়বোধে সিক্ত সংগঠন। এসব কারণেই যেকোনো অবস্থাতেই আমাদের কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে। সবার ঊর্ধ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের মানুষের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে, এবং দেশের উন্নয়ন-প্রগতির সবকিছু ওই চেতনার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে। আমাদের সমিতির জন্য এ এক ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্যকে আমরা করোনাভাইরাস (কভিড-১৯)-উদ্ভূত এই মহাবিপর্যয়ের সময়ে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে প্রতিফলিত করতে সংকল্পবদ্ধ"*[২]।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি তার প্রায় পাঁচ হাজার সদস্যের পক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

---

[১] দেখুন, বারকাত, আবুল., চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন., এবং আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০১৫), মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬।

[২] দেখুন, বারকাত, আবুল ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০২১), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, বিকল্প বাজেট ২০২০-২১, পৃ. ১৩।

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পরপর মোট ৭টি অর্থবছরে জাতির সামনে বিকল্প বাজেট (Alternative Budget) পেশ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভূত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এ বছরেও আমরা ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে জাতীয় বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশে অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দলমতনির্বিশেষে অর্থনীতিশাস্ত্রের আনুমানিক পাঁচ হাজার সদ্যসের সংগঠন—বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সংগঠনগতভাবে আমরা কয়েকটি মৌলিক বিষয় বিশ্বাস করি:

(১) ১৯৭১-এ "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র", যা ঘোষণা করেছিল, *"জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা"*,

(২) ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে জন-আকাঙ্ক্ষা—*বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা*, এবং

(৩) ১৯৭২-এর সংবিধানের মূল বিধান, "*জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক*।"

যেহেতু আমরা আমাদের পরিচয়, অস্তিত্ব ও বিকাশ-উদ্দিষ্ট এসব মৌলিক বিষয় বিশ্বাস করি, চর্চা করি এবং তা সমুন্নত রাখতে দায়বদ্ধ—সেহেতু প্রকৃত বিচারে আমাদের সমিতি– বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কোনো মতাদর্শনিরপেক্ষ (ideology neutral) এবং রাজনীতিনিরপেক্ষ (politics neutral) সংগঠন নয়। আমাদের মতাদর্শ ও রাজনীতির (অবশ্য এসব প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন গুরুত্বপূর্ণ) মূল কথা হলো—"জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে" কারণ জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। সুতরাং আমাদের সবধরনের কর্মযজ্ঞে তা প্রতিফলিত হবে—এটাই যুক্তিসংগত এবং স্বাভাবিক। এ নিরিখে আমরা যে বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ উত্থাপন করতে যাচ্ছি তা উল্লিখিত "তিন মৌল চেতনার ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে"—এ ধারণা-বিবেচনায় প্রণীত দলিল।

ভূমিকাতেই বলে রাখা জরুরি যে বিকল্প বাজেট প্রণয়নে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকি, এ বছর তার সাথে দুটো নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। বিগত ৭টি বিকল্প বাজেট প্রণয়নপ্রক্রিয়ায় আমরা একদিকে যেমন প্রাক্-বাজেট কালে সরকারের আমন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের কাছে আমাদের মতামত-বক্তব্য উপস্থাপন করতাম, তেমনি আমাদের সমিতির সদস্যদের কাছে বিকল্প বাজেট সম্পর্কে তাদের ধারণা সংগ্রহ করতাম। আমাদের বিকল্প বাজেটকে আরো বেশি তৃণমূলমুখী এবং আরো বেশি ফলপ্রদ দলিল হিসেবে প্রণয়নের লক্ষ্যে এ বছর আমরা দুটো অতিরিক্ত কাজ করেছি:

১) **তৃণমূলমূখী করার লক্ষ্যে:** সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির উদ্যোগে দেশের ৮টি বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যম জুম-এ মোট ৬টি প্রাক্-বিকল্প বাজেট আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান আয়োজন। এসব প্রাক্-বাজেট মতবিনিময় সভায় আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভাগভিত্তিক মোট ৩৬৪টি সুপারিশ প্রদান করা হয় (দেখুন, সারণি ১ এবং বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট-২)।

সারণি ১: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩" প্রণয়নের প্রাক্কালে বিভাগভিত্তিক পরামর্শ সভা/মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের দেওয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তযোগ্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা

বিভাগ	সুপারিশ সংখ্যা
১. ঢাকা	১২
২. চট্টগ্রাম	৫৯
৩. রাজশাহী	৩২
৪. খুলনা	৩৩
৫. সিলেট	৫৪
৬. বরিশাল	৫২
৭. রংপুর	৭৮
৮. ময়মনসিংহ	৪৪
মোট সুপারিশ	৩৬৪

উৎস: পরিশিষ্ট ২-এ বিভাগভিত্তিক পরার্মশ/ মতবিনিময় সভার বিস্তারিত অনুলিখন।

২) **সরকারের কাছে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি লিখিতভাবে উপস্থাপন:** গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আমরা সরকারের কাছে "২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সাথে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা" শিরোনামে আমাদের লিখিত দলিল উপস্থাপন করেছি। ওই দলিলে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি হিসেবে আমরা যেসব বক্তব্য পেশ করেছি, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিম্নরূপ:

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানই হবে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তি, (খ) বাজেট হতে হবে বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট, (গ) বাজেটে আয়-সম্পদ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের বিষয়াদিই হবে প্রধান (বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট-১)।

অধ্যায় ২
বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সঙ্গে তিন মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। প্রথম মহাবিপর্যয় হলে—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯-উদ্ভূত মহামারি। আর তৃতীয় মহাবিপর্যয় হলো—ইউরোপে (যেখান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল) রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এ ধরনের অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হলো—একই সঙ্গে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা, প্রকৃতি-উদ্ভূত কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় এবং মনুষ্যসৃষ্ট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মহাবিপর্যয়**—এই ত্রিমাত্রিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং তার ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হবে/ হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/ অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; হতে কি পারে না যে ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? (৩) ইউরোপে মনুষ্যসৃষ্ট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব-অভিঘাত। এসব নিয়ে আমাদের মূলকথা পরস্পরসম্পর্কিত পঞ্চমাত্রিক। বাজেট প্রণয়নে আমাদের গৃহিত পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি নিম্নরূপ:

বাজেট প্রণয়নের পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি
১. বাজেট হবে বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে
২. সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিপজ্জনক বৈষম্য হ্রাসে যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই দ্রুত প্রয়োগ
৩. ব্যাপকভিত্তিক শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৪. মূল্যহ্রাস ও মূল্যসংকোচনের গূঢ় বিষয়াদি বিবেচনায় দূরদর্শিতা
৫. অর্থ-সম্পদ ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত করতে হবে দরিদ্র, প্রান্তিক, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়, আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি করপোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis)—অবশ্যম্ভাবী। আর

এ সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনো একই সঙ্গে ঘটেনি, তা ঘটেছে এবার। আর তা হলো—একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা; আর অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ জানা নেই; যার শেষ অভিঘাতও কারও জানা নেই)। আর এ সময়েই শুরু হলো ইউরোপে যুদ্ধ—রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যার পরিণতি ও অভিঘাত অনিশ্চিত। অর্থাৎ বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/ horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রোগী এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এ রোগীকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, ২০২৩ সালের এই মে মাসে আমরা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের কভিড-১৯ এর আগের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি কিছু যায়-আসে, তা নয়। তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য স্বীকার করা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতেও খুব যায়-আসে না। কারণ, কভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে আয় বৈষম্য-ধনসম্পদ বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং আমরা 'মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর অতিক্রান্তকালীন বাজেট' বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব, না-কি বাজেটসহ সবকিছুই আমরা নব্য উদারবাদী মতাদর্শের মুক্তবাজার আর করপোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এ সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে; মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে না—হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সঙ্গে এই প্রবণতায় করোনাকালীন এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত, অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে কভিড-১৯ লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরমদরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদণ্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা কভিড-১৯ সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে; আর

অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্র গোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিল না, যাদের বলা যায় 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনো হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরও একটি বিষয় এর আগে কখনো ঘটেনি, তা হলো—দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural migration)। গত দুই বছরে কমপক্ষে ১ কোটি মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামমুখী হয়েছেন—এসব মানুষের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকেই গ্রামে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনের কারণেই স্বাভাবিক বা Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা, সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের জেফ বোজোস কী করে মাত্র একদিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার যোগ করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছেন। এসবের ফলে আয় বৈষম্য (income inequality)-সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality)-স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality)-শিক্ষা বৈষম্যসহ (education inequality) বৈষম্যের সব ধরনই বেড়েছে। আর এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিভিন্নভাবে বৈষম্য-দারিদ্র্য বাড়িয়েছে। আমাদের হিসাবে বাংলাদেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগের** মান লকডাউনের আগে ছিল ০ দশমিক ৪৮২, যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০ দশমিক ৬৫৫-এ; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কত গুণ বেশি)—একই সময়ে ২ দশমিক ৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৮৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং এমনিতেই বৈষম্য-দারিদ্র্যপীড়িত দেশ, আর তার সাথে প্রথমে কভিড-১৯ এবং তারপরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এসবই বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশে রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—আয়-সম্পদ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োগের চেষ্টা করা।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে আছে—আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশু দারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-

দলিত, 'পশ্চাৎপদ' পেশা, চর-হাওর-বাঁওরের মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না-করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানসকাঠামোর দারিদ্র্য। এসব দারিদ্র্য আরও বাড়ছে-বাড়বে।

দারিদ্র্যাবস্থা নিয়ে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ—অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত, যাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প—কুটির শিল্প; কৃষিখাত—শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ—কভিড-উদ্ভূত লকডাউনে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী হয়েছেন। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে; রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ অন্য অনেক ধরনের সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার কারণে সামনে আরও হবে। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদের হাতে টাকাপয়সা নেই; অনেকেই যা কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। জীবন এদের অনিশ্চিত। **এসব মানুষের—সরকারি উদ্যোগে ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচির মতো—ব্যাপক এবং শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। কর্মসংস্থানসহ শোভন আয় প্রবাহ থাকলে এ কথা মিথ্যা না। তবে যে কথা আমরা বলি না, তা হলো—**মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। কারণ মানুষের যদি কাজ না থাকে, আয়ের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে 'জিনিসপত্তের' দাম কমলেই কী? উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দাকালে জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি (মূল্যস্ফীতি ঘটেনি), জিনিসপত্রের দাম কমেছিল (অর্থাৎ ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচন); আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/ মূল্যসংকোচনের' সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গূঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির পঞ্চম মাত্রা: "শোভন সমাজব্যবস্থায়" মানুষের জন্য কোনো কিছুই তথাকথিত জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট দয়াদাক্ষিণ্যের বিষয় নয়—তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, আবাসন, বিশ্রামসহ মানুষের সামাজিক ন্যায়-অধিকার (socially justiciable rights) প্রতিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয়। 'শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়' এসব ন্যায়-অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হলো রাষ্ট্রীয় বাজেট।

আমাদের ধারণার রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রচলিত অর্থের মূলধারার অর্থনীতিবিদদের ধারণার বাজেট থেকে পদ্ধতিগতভাবে ভিন—সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রীকেরা পুঁজির শাসন-আধিপত্য-কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে যে প্রক্রিয়ায় যে পদ্ধতিতে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় বাজেট বিনির্মাণ করে থাকেন, তার বিপরীতে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য

বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি। এখানে যা পূর্ণ গুরুত্বসহ উল্লেখ করা দরকার, তা হলো—"শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" আমাদের ধারণায় রাষ্ট্রীয় বাজেট হলো যুক্তিসিদ্ধ মতাদর্শিক-সাধারণ জ্ঞানের সাথে নতুন একীভূত অর্থশাস্ত্রের সম্মিলনী দলিল। বাজেট প্রণয়নে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা-ভিত্তিকেই (premise) আমরা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করি। কারণ, প্রচলিত প্রথায় বাজেট প্রণয়নের শুরুটাই হয় 'টাকাপয়সাকে' মূল অবজেক্ট অথবা উদ্দিষ্ট-লক্ষ্য-অভীষ্ট ধরে নিয়ে। বাজেটপ্রণেতারা প্রথমেই যা ঠিক করেন, তা হলো "কত টাকাপয়সা আছে" (যাকে বলা হয় resource envelope)। আমরা মনে করি বই-পুস্তকে লেখা এবং বাস্তবে প্রয়োগকৃত বাজেট বিনির্মাণ ভাবনার এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ভ্রান্তি সঠিক ধরে নিয়েই প্রাক্-বাজেট ও বাজেট প্রণয়নপরবর্তী তর্ক-বিতর্ক হয়; গণমাধ্যম অযথা সোচ্চার হয়—**এসবই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাজেটবিষয়ক চিন্তনপদ্ধতিতে শক্তভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এসবের বিপরীতে "শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" আমাদের বাজেট প্রণয়ন কর্মকাণ্ডের শুরুটাই হচ্ছে "কত টাকাপয়সা আছে" দিয়ে নয়, "কী কী প্রয়োজন তা দিয়ে"। অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের হিসাবপত্তর শুরু হচ্ছে "resource envelope" দিয়ে নয় "envelope of things to do" দিয়ে। আর "envelope of things to do" অথবা "envelope of things need to be done"-এর মধ্যে থাকবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল সংবিধান প্রতিশ্রুত মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কাজ, বিশ্রাম-বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে মানুষের সুস্থ-সৃজনশীল বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন—সবই। এক্ষেত্রে 'envelope of resources' অর্থাৎ 'টাকাপয়সা' কোনো অর্থেই অবজেক্ট বা অভীষ্ট বস্তু নয়, তা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র।** কারণ, টাকাপয়সার অভাব কৃত্রিম বিষয়; আসলে টাকাপয়সার কোনো অভাবই নেই, যখন আমরা দেখছি যে—আমাদের সরকারি বাজেট মাত্র ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা, অথচ আমাদের হিসাবে দেশে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯ অর্থবছরে) সৃষ্ট মোট পুঞ্জীভূত কালোটাকার পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৩; যে পরিমাণ অর্থে কমপক্ষে ১১ বছরের বাজেট করা সম্ভব), ঠিক একই সময়ে পাচারকৃত মোট অর্থের পরিমাণ হবে আনুমানিক ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা; সম্পদ কর থেকেই মোট ৫০ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব, যা থেকে ১ বছরের বিকল্প বাজেটের জন্য সম্পদ কর হিসেবে কমপক্ষে ২-৩ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব; উপরন্তু অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর থেকেই ১ বছরে কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। অর্থাৎ **"টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে" তা ধরে নিয়ে বাজেট বিনির্মাণ পদ্ধতিটাই ভ্রান্ত। আমাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত—মানুষের জন্য সুস্থ-সবল-সমৃদ্ধ-সৃজনশীল-অসাম্প্রদায়িক-মুক্তচিন্তার জীবন বিনির্মাণে যা যা দরকার, সেসবের হিসেবপত্তর থেকেই বাজেট বিনির্মাণপ্রক্রিয়া শুরু। সংগত কারণেই আমরা "বাজেট ব্যালেন্স" করার পক্ষে নই** (তা আমাদের প্রয়োজনও নেই), **আমরা "মানুষের জীবনের অর্থনীতি ব্যালেন্স" করার পক্ষে।**

উল্লিখিত পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি মান্য করে বাজেট প্রণয়নে আমাদের লক্ষ্য হবে—পূর্ণ কর্মনিয়োজন, শিশুর জন্য সুস্থ জীবন, সবার জন্য আবাসন, মূল্যস্ফীতি রোধ—এক্ষেত্রে বাজেট কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হবে না, তা হবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র। "শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" এ ধরনের বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টনে ন্যায্যতা বাড়বে, বৈষম্য দূর হবে, তথাকথিত কৃচ্ছ সাধনের (অর্থাৎ বেল্ট টাইট করার) প্রয়োজন হবে না, অর্থনীতিতে মোট চাহিদা (aggregate demand) বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, যা ইচ্ছা তাই-ই উৎপাদন হবে না (যেমন পরিবেশদূষণ, স্বাস্থ্যহানিকর

ঔষধপত্তর, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি), পূর্ণ কর্মনিয়োজন নিশ্চিত হবে (বেকারত্ব থাকবে না), কোনো ধরনের ঘাটতি এবং ঋণ (deficit and debt) নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু শোষণভিত্তিক-ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর-লোভলালসাভিত্তিক-মুনাফা উদ্দিষ্ট পুঁজিবাদ এসব পারবে না। এসব পারবে—'শোভন জীবনব্যবস্থা' বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট শোভন অর্থনৈতিক ও শোভন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যা রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্ন।

এতক্ষণ যা বললাম তার সবই যখন সত্য, তখন এ প্রশ্নই তো অমূলক-অবান্তর যে—পুঁজিবাদ ফলপ্রদ সিস্টেম বা দক্ষ সিস্টেম কি-না? পুঁজিবাদ ফলপ্রদতাবিরোধী, অদক্ষ, জাতীয় সম্পদের অপচয়কারী, অসামাজিক এবং মানবতাবিরোধী সিস্টেম; কারণ তা মানুষ বাঁচাতে ফলপ্রদহীন—আর মানুষ মারতে তার সম্পদ অপচয়ের, দক্ষতার এবং অমানবিকতার জুড়ি নেই। তাহলে তো ফলপ্রদহীন, অদক্ষ, অমানবিক, সম্পদ অপচয়কারী পুঁজিবাদী সিস্টেম বর্জন করে তা মানবিক, সামাজিক, দক্ষ, ফলপ্রদ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকারী অন্য কোনো বিকল্প সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। ওই বিকল্প সিস্টেমই আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থা', 'শোভন অর্থনীতিব্যবস্থা', 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র তত্ত্ব। আর এই 'শোভন সমাজব্যবস্থা'র অবিচ্ছেদ্য হাতিয়ার হিসেবেই প্রণীত হয়েছে "বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট ২০২২-২০২৩"।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে পাঁচটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা মনে করি—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দুটি বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:

<u>প্রথম বিষয় যা নিয়ে তারা ভাববেন:</u> আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো— (১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা, (২) সুপার-ডুপার ধনীদের ক্ষেত্রে কর হার বাড়ানো, (৩) শেয়ারবাজার ও বন্ড বাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে খুব কমসংখ্যক মানুষই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক), (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা (tax on excess profit), (৫) কালোটাকা বাজেয়াপ্ত (জব্দ) ও উদ্ধার করা, (৬) পাচারকৃত অর্থ (money laundering) উদ্ধার করা।

<u>দ্বিতীয় বিষয় যা নিয়ে তারা ভাববেন:</u> সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ সময়কালের মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনো তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। তবে এখনকারটা হতে হবে প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক "সবুজ নিউ ডিল" ("Green New Deal")।

অধ্যায় ৩
বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩: জনগণতান্ত্রিক বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি

মানব ইতিহাসে এর আগে কখনো তিনটি মহাবিপর্যয়–মহাদুর্যোগ-মহাদুর্ঘটনা মোটামুটি একই সঙ্গে ঘটেনি: (১) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, (২) কোভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারি, এবং (৩) ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে আপাতত ইউরোপে যুদ্ধের দামামা। বাংলাদেশে আমরাও এই ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। গত বছর (২০২১) আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করলাম—ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বহুমাত্রিক দারিদ্র্য-বঞ্চনার পরিবেশে। এসবের সাথে ২০২০ সালে যুক্ত হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং একই সাথে কোভিড-১৯ অতিমারির লকডাউনের কারণে বিপর্যস্ত সমাজ ও অর্থনীতি। এসবের সাথে এ বছর যোগ হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যার মরণ-অভিঘাত সর্বব্যাপ্ত।

এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণভিত্তিক একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ প্রত্যাশা করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। উল্লিখিত বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে এসব বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা একদিকে যেমন জানি যে এসব এক বাজেটের কাজ নয়, আবার অন্যদিকে এটাও বিশ্বাস করি যে—কাজটি শুরু করতে হবে।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয় অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া নয় অথবা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়া-উদারবাদী কোনো মতাদর্শ নয়—এসবের বিপরীতে "প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত আলোকিত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি করা। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—মহামারি-বিপর্যয়-যুদ্ধ সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার 'শ্রেষ্ঠ সুযোগ'।

জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি	
১.	সাংবিধানিক ভিত্তি
২.	জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা
৩.	বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত-ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার
৪.	কভিড-১৯-এর অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা
৫.	ব্যয় ও আয়ের কাঠামোগত রূপান্তর
৬.	বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা থেকে মুক্তি
৭.	লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে (দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে) প্রবাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় (বাজেটীয়) আয়ের ক্ষেত্রে লুটেরা-ধনীদের ওপর যুক্তিসংগত চাপ প্রয়োগ
৮.	পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের ওপর জোর
৯.	কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক—এসব খাত-ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার
১০.	বাজেট বরাদ্দে মানুষের জীবনকুশলতার অগ্রাধিকার
১১.	মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নতুন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গঠন
১২.	মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়ন
১৩.	আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি সুরক্ষার প্রাধান্য
১৪.	প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের পথনির্দেশক দলিল

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৫২১-৫২৫

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর আমরা জোর দিয়েছি এবং সরকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবতে সুপারিশ করেছি, তা নিম্নরূপ:

(১) ***সাংবিধানিক ভিত্তি:*** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা অসংগতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

"৭ (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*

(২) *জণগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) ***জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:*** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নিরূপণ ও আয় নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সঙ্গে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে **জনগণের জন্য বাজেট** (অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বাজেট) হতে হবে সম্প্রসারণমূলক। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ঠিক এ রকমই ভারসাম্যপূণ—সম্প্রসারণমূলক (দেখুন, সারণি ৫, ৮)। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে, নব্য-উদারবাদীরা রাষ্ট্র-সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়ার কথা এখন আরও জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন, বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন যে, সরকারের এখন উচিত হবে—যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

(৩) ***বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত:*** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি, যেসব খাত দ্রুতগতিতে বৈষম্য-অসমতা ও বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক; যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের সম্মান-সহায়ক, যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা-সহায়ক। আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় এসব স্পষ্ট প্রতিভাত হয় (দেখুন, সারণি ৫)।

(৪) ***কভিড-১৯-এর অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:*** কভিড-১৯-এর সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) ***ব্যয় ও আয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:*** সংগত কারণেই বাজেটের ব্যয় ও আয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে এ রূপান্তর দৃশ্যমান (দেখুন, সারণি ৫, ৮, ১০)।

(৬) ***বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:*** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব এবং আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮)। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ দ্বিবিধ—(ক) আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, এবং (খ) আমরা মনে করি বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান

রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও করপোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপসমূলক অবস্থান)। আমরা মনে করি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-পরিবেশগত-অর্থনৈতিক প্রভাব-অভিঘাত বিবেচনা না করে কোনো ধরনের প্রকল্প-মেগাপ্রকল্প গ্রহণ করা আত্মঘাতি। আরো আত্মঘাতি—যদি তা বৈদেশিক ঋণনির্ভর হয়।

(৭) ***লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষেত্রে লুটেরা-ধনীদের ওপর যুক্তিসংগত চাপ প্রয়োগ:*** ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসহ করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর—দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য মধ্যবিত্ত—আমরা কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ সমীচীন মনে করি না। আমরা মনে করি, চাপ প্রয়োগ করা দরকার পরজীবি-লুটেরা ধনিক শ্রেণি তথা সম্পদশালীদের ওপর। পরজীবী-লুটেরা-ধনী ও বিত্তসম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান, যারা কখনও সঠিক কর প্রদান করেন না, তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন—তা নিশ্চিত জরুরি। একই সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি—তবে দেখতে হবে তা যেন কখনও সাধারণ মানুষের জন্য 'কর দাসত্ব' না হয় আর পরজীবী-লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করে। আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮ ও ৯)।

(৮) ***পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:*** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে; ফলে তা বৈষম্য-দারিদ্র্য-বঞ্চনা হ্রাস করে না। উল্টো তা বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের কর কাঠামোতে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি হতে হবে। আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮, ৯, ১০)।

(৯) ***কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক:*** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনো ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা বাজেয়াপ্ত (জব্দ/উদ্ধার) করা, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সঙ্গে সেসব খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে, অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক—যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বাজেটে আমরা এসব প্রস্তাব করেছি (দেখুন সারণি ২)।

(১০) ***জনগণতান্ত্রিক বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:*** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই জনগণতান্ত্রিক বাজেটে—বাজেট বরাদ্দে আমাদের **অগ্রাধিকারক্রম** নিম্নরূপ: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, কৃষি, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, সুদ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গণপরিবহন, গৃহায়ণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিবিধ ব্যয়, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) (দেখুন, সারণি ৫)।

(১১) ***মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে নতুন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সংযোজন:*** জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট **১৬**টি বিভাগ প্রস্তাব করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন ২টি মন্ত্রণালয় হলো **গণপরিবহন মন্ত্রণালয়** (Ministry of Public Transport), এবং **গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়** (Ministry of Research, Innovation, Diffusion and Development)। আর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত নতুন **১৬**টি বিভাগ (Division/ Directorate) হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে**—(১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ (দেখুন, সারণি ৫ ও ১০)।

(১২) ***মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়ন:*** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসংগত অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

(১৩) ***আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:*** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি (এসবই দৃশ্যমান সারণি ৫ ও ৬-এ)।

(১৪) ***প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:*** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত ব্যয় ও আয় যেন বৈষম্যহ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন—অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ড়) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের মোট আকার (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হওয়া উচিত কমপক্ষে ২০ লক্ষ কোটি টাকা (পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হবে)। আমাদের প্রস্তাব বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে জনগণ ও রাষ্ট্র আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, চলমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর অভিঘাতসহ ইউরোপে যুদ্ধ এবং তার সম্ভাব্য ঋণাত্মক অভিঘাত মোকাবিলা করে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা এ দেশে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে। কারণ সেটাই ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনসম্মতি।

অধ্যায় ৪
বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩: জনগণতান্ত্রিক বাজেটে বৃহৎ বর্গভিত্তিক সুপারিশ

৪.১ ভূমিকা

এ কথা মনে করার কোনোই যুক্তি নেই যে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আধিপত্যের কাঠামোতে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমাজ (বাংলাদেশ যার বাইরের সত্তা নয়) খুব ভালোই চলছিল, মাঝখান দিয়ে কভিড-১৯ মহামারি আর ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। আদৌ বিষয়টি এ রকম নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মহামন্দা অনিবার্য বিষয়। পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ওই মহামন্দা ঘটার কথা ২০১৯-২০-এর দিকেই। আর এই অনিবার্য মহামন্দা সময়কালের সাথে কভিড-১৯ মহামারির সময়কালটা মিলে গেছে– যা ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। আর তারই সাথে ২০২১-এ ইউরোপে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা। সুতরাং একদিকে যেমন কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর প্রত্যক্ষ প্রভাব-অভিঘাতের স্বরূপ বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমাধান-প্রস্তাব দিতে হবে; তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক-সামাজিক মহামন্দায় কভিড-১৯ যতটুকু প্রভাব-অভিঘাত ফেলেছে এবং ইউরোপে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা—এসবও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শোভন জীবনব্যবস্থার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রস্তাব করতে হবে। এটাই সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়বস্তু। এই অধ্যায়ে পদ্ধতিগত ভাবনার নিরিখে আমরা ঠিক এ কাজটিই করেছি।

আমরা ইতিমধ্যে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং প্রয়োজনীয় উপসংহারসহ সুপারিশ প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এই অধ্যায় তারই যৌক্তিক ধারাবাহিকতা। এই অধ্যায়ের মূল বিষয়াদি শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত। সন্ধানের বিষয়টি অনুসন্ধান করে ওই প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ন-উদ্দিষ্ট বিষয়াদি এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। আর সংগত কারণেই অধ্যায়টির কলেবর তুলনামূলক বড় (কলেবর স্বল্পতায় প্রয়োজনীয় বিষয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে)।

আমরা ইতিমধ্যে স্বল্প পরিসরে বেশকিছু সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। এ প্রক্রিয়ায় শেষপর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ-উপবিষয়াদিকে যুক্তিসংগত শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এসব যৌক্তিক শ্রেণিই হলো বিষয়ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা গ্রুপ। এই প্রক্রিয়ায় যে **২৪টি মূল বিষয় বা বৃহৎ বর্গ** নির্মিত হলো সেগুলো নিম্নরূপ: (১) বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা; (২) সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তা বেষ্টনী-মানবকল্যাণ; (৩) মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট; (৪) বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি; (৫) রেমিট্যান্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার; (৬) পুঁজিবাজার; (৭) ব্যাংক; (৮) বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি; (৯) বৈদেশিক ঋণ; (১০) কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ; (১১) ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়; (১২) ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা; (১৩) শিক্ষা: শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার; (১৪) স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত; (১৫) শিল্পখাত; (১৬) নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার বিকাশ; (১৭) প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (১৮) প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা; (১৯) গবেষণা ও

বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ; (২০) দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ধারণা; (২১) সরকার টাকা পাবে কোথায়?; (২২) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তর); (২৩) বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়; (২৪) শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (দেখুন, সারণি ২)।

বলে রাখা সংগত যে উল্লিখিত ২৪টি বৃহৎ বর্গের খাতসমূহ (বা উপবিষয়সহ মূল বিষয়) পরস্পরসম্পর্কিত, পরস্পরনির্ভরশীল এবং একই সাথে প্রতিটি বৃহৎ বর্গের আছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটিই শর্তসাপেক্ষে স্বাধীন। আমরা ওই ২৪টি বৃহৎ বর্গ বা খাতকে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিবিম্ব (mirror of Bangladesh society and economy) হিসেবে দেখি।

উল্লিখিত ২৪টি মূল বর্গের প্রতিটিকে শোভন বাংলাদেশ—বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের লক্ষ্যে কিছুটা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব-সুপারিশ উত্থাপন করছি। উল্লেখ্য, আমরা যেসব সুপারিশ-প্রস্তাব উত্থাপন করছি, যার বেশির ভাগই এককালীন বা একবছরের জন্য নয়, এসব প্রস্তাবনা "শোভন জীবনব্যবস্থা-উদ্দিষ্ট প্রকৃতির প্রতি অনুগত উন্নয়নদর্শন" প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র। সুতরাং আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশই আশুপ্রকৃতির নয়; যেমন আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সন্নিবেশসংশ্লিষ্ট হলেও তা প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদ বিবেচনায় প্রণীত। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিষয়ভিত্তিক আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নিচে বিধৃত করা হলো:

সারণি ২: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বৃহৎ বর্গের বিষয়াদি ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা

ক্রমিক	বাজেট সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের বিষয়	সুপারিশ সংখ্যা
০১.	বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা	৯
০২.	সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনী-মানবকল্যাণ	৯
০৩.	মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট	৭
০৪.	বিনিয়োগ-সঞ্চয় : সরকারি ও বেসরকারি	৬
০৫.	রেমিট্যান্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার	১
০৬.	পুঁজিবাজার	২
০৭.	ব্যাংক	২
০৮.	বৈদেশিক খাত : আমদানি ও রপ্তানি	৭
০৯.	বৈদেশিক ঋণ	৩
১০.	কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ	৫৪
১১.	ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়	১৪
১২.	ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা	১৪

ক্রমিক	বাজেট সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের বিষয়	সুপারিশ সংখ্যা
১৩.	শিক্ষা: শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার	১৭
১৪.	স্বাস্থ্যখাত : শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত	২০
১৫.	শিল্পখাত	২৯
১৬.	নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার বিকাশ	৪৪
১৭.	প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪
১৮.	প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা	২৪
১৯.	গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ	৮
২০.	দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ধারণা	৮
২১.	সরকার টাকা পাবে কোথায়?	৩৮
২২.	মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তর)	৯
২৩.	বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়	১
২৪.	শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৮
	মোট	**৩৩৮**

৪.২ বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটসহ ভবিষ্যতের সব উন্নয়ন দর্শন-দলিলে অন্তর্ভুক্তি এবং তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য উচ্ছেদে অবশ্যকরণীয়

(১) শুধু আসন্ন ২০২২-২৩ বাজেটই নয়, আগামী অন্তত পাঁচ বছরের বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিল প্রণয়নে যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের প্রধানতম ভিত্তি-নীতি (foundational principle) হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে তা হলো: সমাজ থেকে চার ধরনের বৈষম্য– আয় বৈষম্য (income inequality), সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality) ও শিক্ষা বৈষম্য (education inequality) চিরতরে নির্মূল করা। এ লক্ষ্যে বাজেটের আয় খাত ও ব্যয় খাতে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে।

(২) বাজেটে অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের কর-দাসত্ব আরোপ করা যাবে না। পরজীবী-লুটেরা ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণিমইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করতে

হবে। এই কাজে প্রধানতম পথ-পদ্ধতি হবে: যথেষ্ট বেশি হারে সম্পদ কর (বা wealth tax) আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ (tax on excess profit), পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার (money laundering), কালোটাকা উদ্ধার (black money) (দেখুন, সারণি ৮)।

(৩) বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে "বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শনের" নিরিখে সেসব খাত-উপখাত-ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দিতে হবে, যা আপাতত বড় মাত্রায় বহুমুখী বৈষম্য হ্রাস করবে (পরবর্তীতে উচ্ছেদ করবে)— হ্রাস করবে আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সবধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা (দেখুন, সারণি ৫)।

(৪) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দে অগ্রাধিকার দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের প্রায় সব কর্মকাণ্ড (দেশের মোট ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী), যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত—শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ; স্বাস্থ্যখাতে জরুরি ভিত্তিতে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম" প্রতিষ্ঠা; সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর বহুমাত্রিক প্রসার; শিক্ষাখাতে নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষাখাতের প্রসার; জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন; গণমানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে সার্বজনীন পেনশন, বিধিবদ্ধ রেশনিং, গণপরিবহন ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার, নারীর ক্ষমতায়ন (দেখুন, সারণি ৫)।

(৫) দারিদ্র্য-বৈষম্য উচ্ছেদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্ধার-পুনরুদ্ধার (recovery) কর্মসূচিকে দেখতে হবে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা হিসেবে (treatment of symptoms), যা আশু ও স্বল্পমেয়াদি; আর সংস্কারজাতীয় কর্মসূচিকে (reform) দেখতে হবে রোগমুক্তির স্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে, যা দীর্ঘমেয়াদি এবং যথেষ্ট শ্রেণিস্বার্থসংশ্লিষ্ট কাঠামোগত বিষয়। রাষ্ট্রের সব উন্নয়নসংশ্লিষ্ট দলিলে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ পথনির্দেশনা থাকতে হবে। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাবনায় আমরা এসব বিবেচনা করেছি।

দারিদ্র্যের ধরনভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (multiple poverty) দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই "দারিদ্র্যের তথ্যভাণ্ডার"-এ দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম-ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের পকেট, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য, ধর্ম-বর্ণ-পেশা উদ্ভূত দারিদ্র্য, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের দারিদ্র্য প্রভৃতি। দারিদ্র্যের বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আসন্ন বাজেট বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন দলিলে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা জরুরি।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণ

(১) এ দেশে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী দারিদ্র্য নিরসনে অন্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বাজেটসহ দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত সব দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: (ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কীভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে—সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা; (খ) দারিদ্র্য নিরসনসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ; (গ) স্বাভাবিক সময়ে দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন, কিন্তু ২০ লাখ মানুষেরই কর্মসংস্থান হয় না।

(২) কভিড-১৯-এর কারণে যেহেতু বেকারত্ব দ্রুত হারে বাড়ছে, সেহেতু বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) দারিদ্র্য-বৈষম্য দূরীকরণে যেসব বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো: (ক) ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কর্মসংস্থান; (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রমভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধি; (গ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারীপ্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী মানুষ (আনুমানিক ৫০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (৪০-৫০ লাখ) মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের স্থায়িত্বশীল বৈষম্য নিরসনমুখী জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনী-মানবকল্যাণ

এ দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ কভিড-১৯ লকডাউনের আগে) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার (household) সংখ্যা ২ কোটি, যাদের ৭৫ শতাংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংখ্যা এখন বেড়ে কমপক্ষে সাড়ে ৩ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সেইসাথে নিঃস্বতর হয়েছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যাপকাংশ মানুষ এবং বেকার হয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। অবস্থা একই রকম থাকলে সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তিযোগ্য মানুষের এই সংখ্যা বাড়বে। এসব বিবেচনায়—

(১) সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় 'সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) বাজেট বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় কমপক্ষে ১২ গুণ বৃদ্ধি জরুরি (আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটে সেটাই করা হয়েছে) (দেখুন, সারণি ৫)। সরকারের চলতি বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে যেখানে মোট বরাদ্দ ৩৪ হাজার ৩১৯ কোটি

টাকা, সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে এই অংকটা ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা।

(২) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুবিধাপ্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-রাজনৈতিক দলীয় পরিচিতিনির্বিশেষে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর 'অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তি' (inclusion error) এবং 'অন্তর্ভুক্ত-না হওয়ার ভ্রান্তি' (exclusion error) দূর করা যায়। এসব 'ভ্রান্তি' দূর করার অন্যতম পন্থা হলো সামাজিক সুরক্ষা জালটাই চাহিদানুযায়ী সম্প্রসারিত করে ফেলা।

(৩) আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" হলো সবোর্চ্চ বরাদ্দ প্রাপ্তিযোগ্য খাত। এই খাতে সরকার যেসব ব্যয়-বরাদ্দ করে থাকে, তা যৌক্তিক নয়; বিধায় আমরা কয়েকটি বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর হিসেবে নতুন খাত অর্ন্তভুক্ত করেছি। সেগুলো নিম্নরূপ: (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ, (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ (দেখুন, সারণি ৫)।

(৪) আজকের 'প্রবীণ' মানুষই একদিকে যেমন ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা, অন্যদিকে তাঁরাই অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। আমাদের সব অর্জনে অবদান রেখেছেন আজকের প্রবীণ মানুষ। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় 'প্রবীণ নীড়' গড়ে তোলা সময়ের দাবি। দেশে একদিকে যেমন মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ছে, তেমনি পুঁজিবাদের ঠেলা-ধাক্কায় বর্ধিষ্ণু পরিবার (extended family) ভেঙে অণুপরিবার (nuclear family) বাড়ছে। বাড়ছে অসহায়-দুঃস্থ-নিঃসঙ্গ প্রবীণ মানুষের সংখ্যা। সেইসাথে ক্রমাগতভাবে অনেক বেশি অসহনীয় হচ্ছে প্রবীণ মানুষের জীবন। এতে করে অনেক প্রবীণ মানুষ, বিশেষত দরিদ্র প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আশ্রয়হীন-ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভাবনা অতীতের তুলনায় গুণিতক হারে বাড়ছে। সামনে আরো বাড়বে। আর এসব যৌক্তিক কারণেই প্রবীণ মানুষদের জন্য 'প্রবীণ নীড়' ('বৃদ্ধাশ্রম' নয়) গড়ে তোলা জরুরি। বিষয়টি বাজেটে অগ্রাধিকারযোগ্য। আমরা এ জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ' নামে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সে জন্য আগামী ৫ বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকাসহ আসন্ন বাজেটে ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)।

(৫) স্বাভাবিক সময়েই পেনশনভোগীদের পেনশন প্রাপ্তির আয় থেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সব আয় থেকে সবধরনের আয়কর, কর, শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করা অত্যন্ত জরুরি। আর কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাতসহ অন্য বহু কারণেই তা আরো বেশি যৌক্তিক। আমরা সার্বজানীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করছি। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সাবর্জনীন পেনশন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা এবং ওই বিভাগে

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (আমাদের মূল প্রস্তাব হলো "সার্বজনীন পেনশন বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—এখনকার বাজারমূল্যে) (সারণি ৫)।

(৬) কভিড-১৯সহ অন্যান্য কারণেই দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে আমূল অধোগতির ফলে ১ শতাংশ ধনী ব্যতীত সকলেই নিঃস্বতর হয়ে শ্রেণিমইয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামছেন। মানুষের জীবনকে সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল করা সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য। এ নিরিখে ভবিষ্যতের জীবনকুশলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন বিষয় নিয়ে এখনই ভাবনা জরুরি। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সরকার এ নিয়ে কার্যকর কী কী পদক্ষেপের কথা ভাবছে, তার সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা-বিবরণী আসন্ন বাজেটে থাকাটা হবে সময়োপযোগী, ন্যায়সংগত এবং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন।

(৭) জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার 'সকল গৃহহীনের জন্য বাড়ি' দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমাদের বিবেচনায় এসব প্রতিশ্রুতি একান্তই "কাগুজে"। আমাদের দেশে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষেরই নিজ মালিকানায় আবাসন নেই (দেখুন, বারকাত, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র, পৃ. xxxii)। এসব মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে আমরা আগামী ৫ বছরের জন্য গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি অর্থাৎ বছরে ৮০ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৫)। গৃহহীন দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য দ্রুততর সময়ে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া ন্যায়সংগত—সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক যুক্তিতে। সময়-নির্দিষ্ট বরাদ্দসহ বাজেটে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ

(১) অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, পরিচ্ছন্নকর্মী, মেথর-মুচি জেলে-বেদেসহ বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশার এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি। এ লক্ষ্যে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবের একটি হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণখাতের আওতায় (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে "আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ) গঠন করা। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবে আগামী ৫ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ (অর্থাৎ বছরে ১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা)।

(২) দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের জন্য চলমান বাজেটে 'নিজ নামে' প্রচলিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হোক। "অনগ্রসর অঞ্চল"-এ নামে বাজেটে কোনো বরাদ্দ থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশে অনেক অনগ্রসর অঞ্চল রয়েছে; এমনকি বৈষম্যের নিরিখে

অনগ্রসর বিভাগও আছে। আমরা মনে করি, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য 'নিজ নামে' ব্যয় সবরাদ্দের রীতি চালু করা প্রয়োজন।

(৩) দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বাজেটে ভিন্ন কোনো বরাদ্দ থাকে না (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, সংযুক্তি)। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এসব বরাদ্দ এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, যা থেকে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ হিসাব করা সম্ভব হয় না। এসবই হলো বাজেটে দরিদ্র মানুষ নিয়ে অস্বচ্ছতা। আমরা আসন্ন বাজেটে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে মাথাপিছু জাতীয় গড় বাজেটের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪ মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট

(১) বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি ৫%-৭% এর মধ্যে রাখতে হবে। তবে শর্ত হলো কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যস্ফীতি এমন কোনো পর্যায়ে নেওয়া যাবে না, যা অর্থনীতিকে মূল্যস্ফীতির মহা-ঘূর্ণনচক্রে (inflationary spiral) ফেলবে। তা হলে বিপদ হবে অনিবার্য।

(২) কোনো অবস্থাতেই ব্যাপক মূল্যহ্রাস (মূল্যসংকোচন) করে মূল্যহ্রাসের ঘূর্ণিচক্রে (deflationary spiral) পড়া যাবে না। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে তা মহাবিপৎসংকেত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৩) অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি' চালিয়ে যেতে হবে কমপক্ষে ততদিন, যতদিন মানুষের কাজ থাকবে না অথবা "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না। এ লক্ষ্যে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য "সংবিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা" চালু করা জরুরি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাব হলো—সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ" প্রতিষ্ঠা এবং আগামী ৫ বছরে দরিদ্র-প্রান্তস্থ-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে রেশন বাবদ মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ (অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা, সারণি ৫)।

(৪) 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি' কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। আবার কোনো অবস্থাতেই ন্যায্য মজুরিযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তা খুব কমানোও যাবে না।

(৫) ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্যে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজ এমন হতে পারবে না, যেখানে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা পাবেন "সমাজতান্ত্রিক সুবিধা" আর কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ পাবেন 'পুঁজিবাদের সুবিধা'। এসব শুধু 'মূল্যস্ফীতি-মূল্যহ্রাস' নীতির ভারসাম্যের কারণেই নয়, তা বিপজ্জনক বৈষম্য ও মেরুকরণ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যেও জরুরি প্রয়োজন।

(৬) কৃষিখাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা যাতে প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৫ বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি

(১) বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদের খপ্পরে পড়লে সঞ্চয়-বিনিয়োগ-উন্নয়নসহ ভয়াবহ বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিণাম হবে—রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন দলিলের প্রতিফলন হিসেবে বাজেটে এ ব্যাখ্যার প্রতিফলন থাকতে হবে। অন্যথায় আমরা ধরে নেব যে রাষ্ট্র-সরকার হয় বড় পর্দায় মানুষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখতে অপারগ-অযোগ্য, অথবা ধরে নেব যে তারা এসবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, অথবা ধরে নেব যে তাদের অন্য কোনো 'এজেন্ডা' আছে। তা হলে 'এজেন্ডা'টা রাষ্ট্রীয় বাজেটে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে—কোনো রাজনৈতিক স্টান্টবাজি ছাড়া।

(২) রাষ্ট্র-সরকার যদি মনে করে যে উন্নয়নদর্শন হিসেবে মুক্তবাজার অর্থনীতি সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প—সেক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে সরকার কী বোঝেন, মুক্তবাজারে এ দেশে মানুষের কী কী কল্যাণ এবং তা কীভাবে হয়েছে এবং হবে—এসব সম্পর্কে বাজেটসহ সব উন্নয়ন দলিলে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতে হবে। বলা যাবে না যে বাজেট বিশ্লেষণমূলক দলিল নয়, সে কারণে বলা গেল না। প্রয়োজনে এ বিষয়ে সরকারের আসন্ন বাজেট দলিলে সংযুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যামূলক ৫-১০ পৃষ্ঠা সংযোজন করার প্রস্তাব করছি। আর যদি তা না-করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ধরেই নেব যে সংবিধানের বিধি "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক"—এটাকে বাজেট প্রণেতারা যথাযোগ্য সম্মান করেন না; তাও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষোত্তর এবং মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির পরের বাজেটে।

(৩) উন্নয়ন ইতিহাসে প্রমাণিত যে, আজকের ধনী দেশগুলোর ধনী হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দেশাত্মবোধ-উদ্ভূত চেতনার সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল (protectionist policies and strategies, যাকে অনেকেই বলেন nationalist policies)। আজকের ধনী দেশগুলোর কোনোটারই ধনী হওয়ার পেছনে নব্য-উদারবাদীদের মুক্তবাণিজ্য বা মুক্তবাজার মতবাদ কাজে লাগেনি; উল্টো কাজে লেগেছে বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশজ শিল্প সুরক্ষা এবং তা বিকশিত করার পথ-পদ্ধতি, যেখানে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ (public expenditure and state intervention) নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এসব ঐতিহাসিক নির্মোহ সত্য। এ নিরিখে মালিকানার নীতি হিসেবে আমাদের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী উৎপাদনযন্ত্র-উৎপাদনব্যবস্থা-বণ্টনপ্রণালীসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাতের প্রাধান্য (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৩) বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক আমাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ হলো—রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর দায়িত্বটা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এবং শিল্পায়ন নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত পাট শিল্প, বয়ন শিল্প, গ্যাস, তেল, কয়লা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য খাতের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আরো কীভাবে শক্তিশালী করা যায় অথবা কীভাবে তা শ্রমিকদের মালিকানাধীন সরকারি ব্যবস্থায় (যা সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে আছে) পরিচালনা করা যায়, সে

বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দসহ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটের ব্যয় ও আয় উভয় ক্ষেত্রেই এসবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে (মূল দিকনিদের্শনার জন্য দেখুন, সারণি ৫ ও ৮)।

(৪) ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ (এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, public sector) বেসরকারি বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তি খাতের (private sector) বরাদ্দের জন্যে বাধাও নয়—এ বিবেচনায়, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। কভিড-১৯-এর লকডাউনের ফলে শিল্প-ব্যবসায়-পরিবহন খাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এসব খাতের ক্ষতিমাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই অপূরণীয়। এসব খাত-ক্ষেত্র উদ্ধার-পুনরুদ্ধারে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ, 'ব্যবসা-ব্যয়' কমিয়ে আনা (cost of doing business) এবং 'ব্যবসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ' (ease of doing business) জরুরি। আমাদের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য নীতিসহ বাজেটে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাপ্তি, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে 'ঝুঁকি হ্রাস কৌশল' ও 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল', বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ প্রক্রিয়াকরণ সহজ করা, ব্যবসা ত্বরান্বিতকরণসংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি নীতিসহায়ক পদক্ষেপ প্রাধিকার ভিত্তিতে নিতে হবে। 'ব্যবসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ'-এর ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনা জরুরি: (ক) 'ব্যবসার প্রক্রিয়াগত' দিক (process অর্থে)—অপ্রয়োজনীয় ধাপসমূহ কমিয়ে আনতে হবে, (খ) 'সময়গত দিক' (time factor অর্থে)—অযথা সময়ক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে, (গ) 'ব্যয়গত দিক' (cost)—যেখানে অযথা-যুক্তিহীন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয়ে সকল সংশ্লিষ্ট নীতি-দলিলে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ১৩) রাষ্ট্রীয় খাত, সমবায়ী খাত ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে ভারসাম্য বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৫) কভিড-১৯-এর লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাত (informal sector)। অনানুষ্ঠানিক খাতের অণুব্যবসা-বাণিজ্যসহ শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকতে হবে। এসবের মধ্যে থাকবে এককালীন অনুদান (যেমন ভ্রাম্যমাণ অণু ব্যবসায়ী হকার, ভ্যানে পণ্য ব্যবসায়ী), বিনাসুদে অথবা অতি অল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ ইত্যাদি। এই খাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এ বছরের বাজেটে "শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস" খাতের অধীনে **"অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ"** গঠনের প্রস্তাব করছি। আর এ জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

(৬) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে জিডিপিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভূমিকা রাখে। কভিড-১৯-এর লকডাউনে এসব খাতে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য ন্যূনতম প্রস্তাব হলো:

(ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল" গঠন করতে হবে। এই ঋণ হতে হবে চাহিদাতাড়িত, সরবরাহচালিত নয়।

(খ) স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(গ) যুবকদের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবক হতে উৎসাহিত করতে স্টার্ট-আপ পুঁজি সরবরাহ করে প্রকল্প সম্প্রসারিত করতে হবে।

৪.৬ রেমিটেন্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার

২০২১ সালে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২২.০৭ বিলিয়ন ডলার (যা চলতি বাজারমূল্যে জিডিপির ৬.৭%)। এই অর্থের ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ পদ্ধতি বের করা জরুরি। উপজেলা কুটিরশিল্প নগরীতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রক্রিয়া চালু করে এই অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব। এ অর্থ বিশেষ বন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীল বিনিয়োগেও প্রবাহিত হতে পারে। এসব দিকনির্দেশনা বাজেটে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৪.৭ পুঁজিবাজার

(১) আমাদের পুঁজিবাজারের আকার তুলনামূলক ছোট, জিডিপির ১২-১৪ শতাংশ। আর বন্ড মার্কেট নেই বললেই চলে। আমাদের পুঁজিবাজারে বড় ধরনের ধস নামে প্রতি ১০ বছর পরপর; সাধারণ বিনিয়োগকারীদের তেমন আস্থা নেই; আর যেসব সাধারণ বিনিয়োগকারী গত ৩০-৪০ বছর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে আসছেন, তাদের অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাজনক; তবে বড় জাল-জালিয়াতিকারীদের তাতে বেশি সুবিধা। পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পুঁজিবাজারে সরবরাহ ঘাটতি ও চাহিদা স্বল্পতা উভয়ই আছে। তবে 'ভালো' শেয়ার যেমন নেই, তেমনি 'খারাপ' শেয়ারে তুলনামূলকভাবে বাজার সয়লাব। পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব আছে। কভিড-১৯ মহামন্দার অভিঘাত কিছুটা লাঘবে এবং মধ্যবিত্তদের জন্য একটু নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য সরকার সরকারি বন্ড মার্কেট সৃষ্টির কথা ভেবে দেখতে পারে। তবে পুঁজিবাজার ও বন্ড মার্কেটের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে (যা আদৌ সহজসাধ্য নয়)। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সরকারি বন্ড প্রচলনের কথা ভাবা যেতে পারে। এসব কার্যক্রম গ্রহণ করলে একদিকে স্টক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সক্ষম হবেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকর মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডের বাস্তব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট অপ্রিয়। বিষয়সমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন করে ভাবা দরকার।

(২) পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়সহ নিয়ন্ত্রক সংস্থার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা দৃশ্যমান করতে হবে।

৪.৮ ব্যাংক

(১) বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ব্যাংকনির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের যৌক্তিক অর্থায়ন যাতে অব্যাহত থাকে, সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিকট অতীতে সংঘটিত ব্যাংকিং অঘটনসমূহ আগ্রহী ব্যাংক কর্মকর্তাদের (ব্যাংক মালিকদের কথা ভিন্ন) ঋণ প্রদানে অনুৎসাহী করছে; আবার অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি লকডাউন ও ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে ভালো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেও উৎসাহ কম। আবার ব্যাংক ঋণ যেভাবে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়েছে, তা মারাত্মক বিপজ্জনক। এই বিপৎমাত্রা সম্পর্কে আমরা এর আগেও বহুবার সুপারিশ করেছি, আশা করি সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সেসব তলিয়ে দেখবে। **বেইল-আউট কর্মকাণ্ডে বৃহৎ ঋণগ্রহীতাদের নির্বিচার নগদ অর্থ প্রদান কোনোভাবেই সমীচীন হবে না**। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারকে সম্মিলিত উদ্যোগে নীতি-কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। ব্যাংকিং শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা নীতি ও ঋণ নীতি হতে হবে বিনিয়োগবান্ধব এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে উপযুক্ত রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। **তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—এসবের ফলে যেন আমাদের দেশে আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং পুঁজি প্রণোদিত না হয়**।

(২) ব্যাংক খাতে ছোটখাটো পরিবর্তন করে তেমন কোনো লাভ হবে না। স্বল্পমেয়াদি এবং এডহক ভিত্তির কোনো কিছুই ব্যাংক খাতকে সম্মানজনক-নিরপেক্ষ অবস্থানে ফেরাতে পারবে না। ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বড় মাপের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং একই সাথে বেশকিছু সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন:

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি স্বাধীন সত্তা, না-কি তা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন সত্তা—বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে। জনমনে সাধারণ ধারণা যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় অর্থমন্ত্রীর অধীনে চাকরি করেন অথবা গভর্নর-ডেপুটি গভর্নররা নিযুক্তি পান বড় বড় জোম্বি কর্পোরেশনের তদবির-লবিংয়ের জোরে—এসব বিষয় স্পষ্টীকরণ জরুরি। আরো স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে আমরাই আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিক কি-না? এ ধরনের সিরিয়াস প্রশ্ন উত্থাপন করে চার্লি রবিনসন তালিকা প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর ১৫৪টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিক আসলে রথচাইল্ড ফ্যামিলি (দেখুন, Robinson, C. 2017. The Octopus of Global Control)।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। এসব প্রতিবেদনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আবার প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই এখানে থাকে

না। বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রকাশ করা উচিত যে দেশে কোটিপতির সংখ্যা কত, কত তাদের ব্যাংক ঋণ, কোন ঋণ তারা পরিশোধ করেননি, কোন ঋণ অগ্রিম কতবার পুনঃতফসিল করেছেন, তাদের পরিচয়টা কী, তারা এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা (family-এর সংজ্ঞা আইন মন্ত্রণালয় ঠিক করে দিক) কে কোন ব্যাংকের পরিচালক, কত বছর ধরে পরিচালক;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংককে বলতে হবে—ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা নিয়ে এত গোঁজামিল দিতে হয় কেন? সমস্যার সমাধান কী;

(ঘ) বিভিন্ন ব্যাংকে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক কে কী বিচার করে নিয়োগ দেন; কেন নির্দিষ্ট গোছের ব্যক্তিরাই ঘুরেফিরে পরিচালক হয়ে যান—আসলে স্বার্থটা কার;

(ঙ) একই ব্যক্তি অথবা একই ব্যবসার মালিকেরা কি একই সাথে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মালিক এবং/ অথবা পরিচালক হতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে 'স্বার্থের সংঘাত' (conflict of interest) সমস্যা কীভাবে দূর করা হয়?

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক যখন টাকা ছাপায়, তখন কে তাকে অনুমতি দেয় এবং সে অনুমতি অর্থনৈতিক ও নৈতিক যুক্তিতে বিধিসাপেক্ষ কি না?

(ছ) বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর লোকজন প্রায়ই বাংলাদেশ ব্যাংকে আসেন (সুপারভাইজারি মিশন ইত্যাদি বহু নামে)। কে তাদের অনুমতি দেয়, কেন তারা আসেন, তাদের আসাতে আমাদের কী উপকার হয়?

৪.৯ বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি

বিশ্ব বাণিজ্য-আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত সুপারিশসমূহ বড় পর্দায় উত্থাপন করছি। আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) আমাদের রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের স্বীকার করতে হবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রপ্তানি-আমদানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়তই অন্যায্যতার শিকার হচ্ছি। আমাদের ঠকানো হচ্ছে—বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন কায়দায়; "আমরা আসলে ভিক্ষুক জাতি নই"—রাষ্ট্রীয়-সরকারি দলিলপত্রে এসব স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করতে হবে।

(২) উন্নয়নসংশ্লিষ্ট দলিলে উল্লেখ করতে হবে যে তথাকথিত 'ভ্যালু চেইন' ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও আসলে এর উদ্দেশ্য ভিন্ন; উদ্দেশ্য হলো—আমাদের যে বিভিন্নভাবে শোষণের জাঁতাকলে ফেলা হয়েছে, তা জায়েজ করা। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে এসব বলতে হবে।

(৩) রপ্তানি-আমদানির মূল্য নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট যেসব জাল-জালিয়াতি আর হিসাবের মারপ্যাঁচ—এগুলো আমাদের রাজনীতিবিদসহ (ক্ষমতাসীন-বিরোধী দলনির্বিশেষে) আমলা ও কূটনীতিকদের খুব ভালোভাবে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষির (negotiation) জন্য এসব খুবই জরুরি। এসব

বিষয়ে নিয়ে ফলপ্রদ আলোচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আনক্‌টাড (UNCTAD), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘের সদরদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি। এ লক্ষ্যে আমরা 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'-এর অধীনে "অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ" গঠনের প্রস্তাবসহ এ বাবদ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)।

(৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্যায্যতার শিকার যত দেশ—সবাইকে সাথে নিয়ে যৌথমঞ্চ (common platform) সামিট-এর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। বাংলাদেশ এ উদ্যোগ নিতে পারে।

(৫) কভিড-১৯-উদ্ভূত সংকট, সাপ্লাই চেইনের সমস্যা এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা—এসব বিবেচনায় রেখে রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ এবং সেইসাথে উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে যুক্তিসিদ্ধ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়সমূহ বাজেট বিবেচনায় থাকতে হবে। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ উৎসাহিতকরণ জরুরি।

(৬) রপ্তানি পণ্যের নতুন গন্তব্য-দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

(৭) গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অধিকতর কার্যকর ও ন্যায্য অংশীদারি নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.১০. বৈদেশিক ঋণ

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য-অনুদান-এর রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অবস্থান খুবই স্বচ্ছ। এ মুহূর্তে আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু দেনা প্রায় ৩৮ হাজার টাকা; জিডিপির তুলনায় বৈদেশিক ঋণ খুব বেশি নয়; বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে আমাদের অবস্থা "স্বস্তিদায়ক" (বা "সবুজ সংকেতবাহী"); আমরাই এখন বিদেশে ঋণ দিই—এসবই সরকারি কথাবার্তা এবং আপাতদৃষ্টে "স্বস্তিদায়ক"।

মেগাপ্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের যে অবস্থা তা বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে যখন থেকে আমরা একসঙ্গে চার-পাঁচটি বড় (মেগা) প্রকল্পের ঋণের সুদ পরিশোধ করা শুরু করব, ঠিক তখন থেকেই ঋণ পরিশোধ অবস্থা "লাল সংকেতবাহী" হবে। আনুমানিক সময়কালটা হতে পারে ২০২৭-২৮ সাল। বৈশ্বিক অর্থনীতির মহামন্দা, কভিড-১৯ উদ্ভূত মহাবিপর্যয়, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রের ভৌগোলিক স্থানান্তর—এসব কারণে বৈদেশিক ঋণ-উদ্ভূত "লাল সংকেত" আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিতে অতি বিরূপ প্রভাব ফেলবে—এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈদেশিক ঋণের রাজনৈতিক অর্থনীতি তাই-ই বলে।

আমরা পত্রপত্রিকায় প্রায়শই দেখি "বৈদেশিক ঋণ" চুক্তি স্বাক্ষরের ছবি। কিন্তু কী বাবদ ওই ঋণ, ঋণের পরিমাণ কত, কী শর্তে দেওয়া হচ্ছে, ঋণ পরিশোধ সূচি কেমন—এসবের কোনো কিছুই

প্রকাশিত হয় না; এমনকি সংশ্লিষ্ট গবেষকেরাও এসব তথ্য পান না। এসব যথেষ্ট গোপনীয়। অর্থাৎ "বৈদেশিক ঋণ" একধরনের "গোপনীয়তার সংস্কৃতি"র বাহক। এসবের কারণ অনুসন্ধানে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি জানা প্রয়োজন। এ নিয়ে এখন থেকে ২১ বছর আগে ২০০১ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন : গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকোনমি" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে আমরা যা বলেছি তা গুরুত্বপূর্ণ, বিধায় নিচে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃত করছি:

> *"ফরেন এইড—একটি সমগ্র শিল্প (Aid as Industry) এবং সেইসাথে নির্ভরশীলতার সংস্কৃতির (culture of dependency) ভিত্তি ও বাহন। 'ফরেন এইড' হ'ল দাতাগোষ্ঠী (কেন্দ্র) কর্তৃক গ্রহিতাকে (প্রাপ্ত) একটি নির্ভরশীল কাঠামোর মধ্যে পরিচালনের শিল্প। 'ফরেন এইড' শিল্পটি দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থে সুক্ষ্ম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সচেতনভাবে পরিচালিত হয়। 'ফরেন এইড' নামক স্বার্থ-সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে যেসব স্বার্থ চরিতার্থ হয় সেগুলো হতে পারে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যময়াদী, দীর্ঘমেয়াদী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক। স্বার্থ সংরক্ষণের 'শিল্প' হিসেবে এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হল দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এলিটশ্রেণী—ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, পরামর্শক ইত্যাদি। 'ফরেন এইড' নামক শিল্পটিকে এদের সকলের জীবনযাত্রা, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণ নিমিত্ত একটি কামধেনুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যার শেষ ফলটি আবার তুলনা করা যেতে পারে মোল্লা নাসিরউদ্দিন হোঁজ্জার সেই গল্পের সাথে যেখানে তার প্রশ্ন "এটা বিড়াল হলে (বাজার থেকে কেনা) মাংস কই, আর এটা মাংস হলে বিড়াল কই" (আর আমাদের প্রশ্ন—এর নাম উন্নয়ন হলে বিদেশী সাহায্য কই, আর এর নাম বিদেশী সাহায্য হলে উন্নয়ন কোথায়)। সেইসাথে 'ফরেন এইড' যেহেতু নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেই চলেছে সেহেতু আমাদের মানসিক কাঠামো ঠিকঠাক রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামকরণের ক্ষেত্রেও যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে সেটা লক্ষণীয়। যেমন, 'ফরেন এইডের' (বৈদেশিক সাহায্য) জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স' (উন্নয়ন সহযোগিতা), 'ডোনার' (সাহায্যদাতা)-এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'ইকনমিক রিলেশন্স ডিভিশন', 'বাংলাদেশ এইড ক্লাবের' জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনার' (উন্নয়ন সহযোগী), 'এক্সটারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন' এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম'। ফরেন এইড সংস্কৃতির দিক থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো টার্মগতভাবে যত বেশী উদারতা দেখানো হচ্ছে ঠিক তত বেশী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাংক-ক্রাট, ইউরোক্রাটসহ 'উন্নয়ন সহযোগীদের' উপদেশ খয়রাতের মাত্রা।*

আমরা দেখিয়েছি যে—

প্রথমত: বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্বগত উপসিদ্ধান্তসমূহ নিঃশর্ত সিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়ত: গত তিন দশকে আমাদের দেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে তার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম যত না ত্বরান্বিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটেছে ঋণগ্রস্ততাজনিত দায়ভারের বোঝা।

তৃতীয়ত: বাংলাদেশে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ (basic needs) পূরণের ক্ষেত্রে (যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব) বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা নগণ্য; বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য নির্ভরতার সাথে জনকল্যাণের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে কিছু ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান ধনস্ফীতির; বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে সম্পর্কিত আমদানি নির্ভরতার সাথে এলিট শ্রেণির চলতি ভোগ-বৃদ্ধি সাযুজ্যপূর্ণ, ঐ আমদানি কাঠামোর সাথে ব্যাপক দরিদ্রগোষ্ঠীর চলতি ভোগের সম্পর্ক ক্ষীণ; এবং বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে কালো টাকার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সরাসরি সম্পর্কিত।

চতুর্থত: বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কতখানি প্রয়োজন—এ প্রশ্নের উত্তরের সাথে সম্পর্কিত সবচে' গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হল সম্ভবতঃ ঐ ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা—এ বিষয়টি। এ মর্মে কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প বিশ্লেষণ করে আমরা কিছু হিসেবপত্তর দাঁড় করিয়েছি (যা আনুমানিক তবে যথেষ্ট মাত্রায় প্রবণতা নির্দেশক)—যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গত তিন দশকে প্রবাহিত বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের মাত্র ২৫ ভাগ পৌঁছেছে তাদের কাছে যাদের উদ্দেশ্যে ঐ সাহায্য এসেছে, আর ৭৫ ভাগ বিভিন্নভাবে লুটপাট হয়েছে (২৫% বিদেশীরা, ৩০% দেশের আমলা, রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক, ঠিকাদাররা ও ২০% শহর ও গ্রামের উচ্চবিত্তরা)। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লুটপাট প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করেছে, এবং অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন স্থায়ীকরণে রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত হতে হয়েছে। দুর্নীতি, ঘুষ, সন্ত্রাস, কালোটাকা, ঋণখেলাপি সংস্কৃতি এসবই উক্ত দুর্বৃত্তায়নের অনুষঙ্গ মাত্র।

পঞ্চমত:বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের (বিশেষ করে প্রকল্প ঋণের) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য প্রতিকূল এবং যা আমাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে—এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত সাহায্যপ্রবাহ মূলতঃ দাতাগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে আমরা বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের উপর যতটুকু নির্ভরশীল সেখানে 'উন্নয়ন' কোন লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ মাত্র। এইড কনসোর্টিয়াম, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ

অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর গত দুই দশকের ঋণ প্রদান কর্মসূচির বিশ্লেষণ সেটাই প্রমাণ করে।

সবশেষে, গত তিন দশকে আমাদের দেশে যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহিত হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের কার্যকারণ বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনকল্যাণকর কোন ভূমিকা রাখেনি, উল্টো সেটা বিদেশী-দেশী সুনির্দিষ্ট স্বার্থ-গোষ্ঠীর ধনস্ফীতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে/ করছে। যে প্রক্রিয়ায় ও যেসব শর্তে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য আমাদের দেশে প্রবাহিত হয়েছে তার অভিঘাত ঐ ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে কঠোর প্রশ্নের সম্মুখীন করে—এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই। আর ***গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা এমনটি হলে ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে কি'না সে বিষয়ে জাতীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।"*** (দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০২, বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন: গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী* ২০০২, পৃ. ১১৩-১১৫)।

৪.১১ কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ

বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত মানুষের 'শোভন বাংলাদেশ' গড়তে চাইলে প্রস্তাবিত সব সুপারিশ-এর যথার্থতা স্বীকার করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা ভাবনাসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাব-সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

কৃষি ও কৃষক স্বার্থ—আপসে মীমাংসনীয় বিষয় নয় (non negotiable বিষয়)

(১) সরকারে যে-ই থাকুন না কেন স্বীকার করতে হবে যে শুধু বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ "শোভন সমাজব্যবস্থা—শোভন জীবনব্যবস্থা" বিনির্মাণের লক্ষ্যেই নয়, বিশ্বব্যাপী ডুবন্ত পুঁজিবাদ ব্যবস্থা থেকে প্রকৃতির বিধানানুযায়ী মানবকল্যাণকামী উন্নততর ব্যবস্থায় উত্তরণে শুধু সম্পদের (সব প্রাকৃতিক সম্পদসহ জমি-জলা-জঙ্গল) ন্যায্য পুনর্বণ্টনই নয়—সম্পদের মালিকানারও বণ্টন করতে হবে (এ কাজটি কোনো সরকার পারবেন কি পারবেন না তা বিচার্য বিষয় নয়, বিচার্য বিষয় হলো—প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মনুষ্যসৃষ্ট নয় তার মালিকানা ন্যায্যতা)।

(২) কৃষি ও কৃষক ভাবনার ভিত্তিমূল হতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত নিম্নলিখিত বিষয় "*নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন*"। সরকারে যে-ই থাকুক না কেন তাকে এ কাজটি করতেই

হবে। কারণ, এসব প্রতিশ্রুতি সাধারণ নয় সাংবিধানিক এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র অন্তর্ভুক্ত। আর এটা সেই রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রটি *'প্রজাতান্ত্রিক'* (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১) এবং সংবিধান মোতাবেকই এই *"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"* (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১)। আর সংবিধান অনুযায়ীই এই প্রজাতন্ত্রে *"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"* [অনুচ্ছেদ ৭ (১)] এবং *"জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"* [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]। তাহলে সংগত প্রশ্ন, সংবিধানের কোন বিধানবলে জমি-জলা-জঙ্গলসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের (মনুষ্যসৃষ্ট নয়) মালিকানা ব্যক্তিগত হয়? এই সবকিছুর মালিকানা হবে জনগণের—জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের। আর এ কথাও তো সংবিধানে স্পষ্ট প্রতিশ্রুত যে, *"উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্য মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা ... , এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা"* (অনুচ্ছেদ ১৩)।

এসবই যদি সংবিধানে বিধৃত বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হয়, তাহলে কোন বিধানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা এবং তা ব্যক্তিমালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়? কোন আইনে সমবায়ী খাস জমি-জলা-জঙ্গলের মালিক বনে যান গুটিকয়েক ব্যক্তি? কোন আইনে খাস জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা দরিদ্র মানুষের হাতছাড়া হয় অথবা তার কাছেই যেতে পারে না? কোন আইনে গ্যাস-তেল-কয়লাসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা কার্যকর হয়? কোন আইনে শত-কোটিপতি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বহাল থাকে? কোন আইনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে জনগণের ব্যাপকাংশ প্রজাতন্ত্রের মালিক না হয়ে 'প্রজা' হয়ে যান? কোন আইনে মানুষ দরিদ্র হন-নিঃস্ব হন-ভিক্ষুক হন-গৃহহীন হন-শিক্ষাহীন হন-বিনেচিকিৎসায় মারা যান? কোন আইনে একজন শিশু অভুক্ত থাকে? কোন আইনে একজন প্রবীণ মানুষ অসহায়-অসুস্থ হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরেন? কোন আইনে অর্থপূজার সম্মান হয় সর্বোচ্চ? কোন আইনে জনগণ হয়ে যান 'প্রজা', আর জনগণের সেবক—শাসক-প্রশাসকেরা বনে যান 'রাজা'? রাষ্ট্র হোক আর সরকার হোক—এ দুয়ের কোনো সত্তাই সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং এসব প্রশ্নের উত্তর তাদেরই দিতে হবে, তাদের মালিকের কাছে—জনগণের কাছে (কারণ সংবিধান অনুযায়ী জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম এবং প্রজাতন্ত্রের মালিক)। আর এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হলে কী হবে তাও সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে *"অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি*

বাতিল হইবে।" তাহলে- যে কেউই অনুমান করতে পারছেন—মুক্তিযুদ্ধ কোথায়, আর আমাদের শাসক-প্রশাসকেরা কোথায়? সংবিধান কোথায়, আর ন্যায়বিচার কোথায়? এসব কারণেই আমরা বহু বছর ধরে বহুবার বলেছি-লিখেছি সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন ও আলোকিত মানুষের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র গঠনের কোনোই বিকল্প নেই—নেই তা সাংবিধানিকভাবে, ন্যায়বিচারিক যুক্তিতে, নৈতিক বিচারে, এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুক্তিতে।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার

(১) আসন্ন ২০২২-২৩ জাতীয় বাজেটসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দলিলে কৃষি ও কৃষক ভাবনার অনুষঙ্গ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সময়-নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথনির্দেশ থাকতে হবে: ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাস জমি-জলা-জঙ্গলের বণ্টন-বন্দোবস্ত, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থার সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন, সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখলস্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ভূমি আইন, বাজার, বিপণন, মজুরি, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তি, কৃষি ঋণ, ভর্তুকি, কৃষি বীমা, পরিবেশবান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), জমি-জলায় নারীর অধিকার-উত্তরাধিকারসহ কৃষিতে নারীশ্রমের স্বীকৃতি, জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের অধিকার, শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, চর-হাওর-বাওরসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সুদবিহীন ঋণ, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ, বিশেষ উৎপাদন অঞ্চল গঠন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিকাশ, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D), প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থরাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ, বিষয়টি উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তিকেন্দ্রিক।

(২) 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও কৃষক ভাবনার' নিরিখে—"৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গণমুখী সমবায় গঠন"— বিষয়টি এবারের বাজেটে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমির বণ্টন, খাসজমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাসজলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গাচাষির বর্গাস্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা (এখন গ্রামের সংখ্যা ৮৭,২২৩; ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ইত্যাদি) বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট দিকনির্দেশনাসহ বরাদ্দ থাকতে হবে।

(৩) সরকারের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১'-এ 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরে আসন্ন বাজেটে তা পূর্ণ কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সে লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বরাদ্দ সময়ের দাবি।

(৪) প্রস্তাবিত বাজেট বছরেই কৃষি ও কৃষক ভাবনার যথার্থতা বিচারে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ বিঘা কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি, ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেওয়া যায়।

(৫) অবৈধ দখলকৃত ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা এখনই জমিদস্যু-জলাদস্যুদের থেকে উদ্ধার করে কীভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের মালিকানায় যাবে—এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৬) খাস জমি-জলা-জঙ্গল সম্পর্কে সরকারকে কয়েকটি সত্য স্বীকার করে নিতে হবে: (ক) খাস জমি-জলা-জঙ্গল আত্মসাৎ করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে দেশে একটি কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যারা খাসজমির সুষম বণ্টনে প্রধান অন্তরায়; (খ) অবৈধ দখলদারদের বড় অংশ সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত; (গ) খাসজমি-জলা চিহ্নিতকরণ ও বিলি-বণ্টন ফলপ্রদ করা জনকল্যাণকামী স্থানীয় সরকার ও সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব নয় (যা সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন"-এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ)।

(৭) খাসজমি-জলা বণ্টন বিষয়টি যেহেতু হতে পারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, সেহেতু আমরা প্রস্তাব করছি যে—আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটসহ সরকারের সকল সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী দলিলপত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বলা হবে: (ক) ২০০৫ সালে ভূমিবিষয়ক সংসদীয় কমিটি যে ৫০ লক্ষ একর খাসজমির (কৃষি, অকৃষি ও জলাভূমি) কথা বলেছে, তা অবিলম্বে চিহ্নিত করে জনগণকে অবহিতকরণ; (খ) সব খাসজমি ও জলা (চিহ্নিত-অচিহ্নিত, কৃষি-অকৃষি-জলা অবিলম্বে দেশের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে বণ্টনের পরিকল্পনা এবং এই বণ্টনে অগ্রাধিকার পাবে—গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩ এবং শহরাঞ্চলে দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-স্বল্প আয়ী মানুষ; (গ) প্রাপ্য সমস্ত অকৃষি শহুরে খাসজমি বস্তি থেকে নগর দরিদ্রদের উচ্ছেদ বন্ধ এবং সহজ শর্তে খাসজমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা; (ঘ) দলিত, বেদে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সবধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ; (ঙ) উপকূলীয় অঞ্চলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত খাসজমি অবিলম্বে ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া; (চ) প্রকৃত পেশাদার জেলে সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাস জলাভূমিসমূহ বণ্টন; (ছ) চরের সব জমি দিয়ারা জরিপপূর্বক খাস খতিয়ানভুক্ত করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা; (জ) খাসজমির বিভ্রান্তিকর শ্রেণিবিভাজন বন্ধ করা (যেমন কৃষিজমিকে জলাভূমি হিসেবে দেখানো); (ঝ) খাসজমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেতমজুর, নারী সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক

সংগঠনসমূহ ও স্কুলশিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা; এবং এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া; (ঞ) খাসজমি চিহ্নিতকরণ, বাছাই, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ত স্থানীয় সরকারের ফলপ্রদ সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা; (ট) খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা; (ঠ) খাসজমি বণ্টনসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম ও ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূলপর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া; (ড) ভূমিহীনেরা যেন তাদের মাঝে বণ্টনকৃত জমি-জলা রক্ষা করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনী-উপকরণ (ইনপুট) সরবরাহ করা ও আইনি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; (ঢ়) জমির দখলিস্বত্বের সমস্যা ও ফসলের ওপর কর্তৃত্বের সমস্যা নিরসনে আইনি সহায়তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সংস্থার সহায়তা (যেমন আইনগত পরামর্শ) ব্যবস্থা জোরদার করা; (ঢ) উৎপাদনমুখী উপকরণ ও কৃষিজ-ইনপুট কেনার ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে (প্রয়োজনে বিনাসুদে) ঋণ সুবিধার প্রসার ঘটানো; (ঢ়) উৎপন্ন ফসল বাজারজাতকরণে সবধরনের সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা। সরকারের পক্ষ থেকে গরিব ভূমিহীন জনগণকে পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা; (ণ) সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে গণমুখী সমবায়ভিত্তিক খামারব্যবস্থা গঠনে সর্বোচ্চ প্রণোদনা দেওয়া; (ত) ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা; (থ) খাসজমির বণ্টনপ্রক্রিয়াকালীন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসম্পর্কিত সুপারিশমালা

১. আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ"** গঠন করা হোক। এ লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হোক, অর্থাৎ আসন্ন অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)।

২. আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত ৪০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে থাকবে:

   (ক) দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষি ও জলাজীবী খানার মধ্যে খাসজমি ও জলা বিতরণ, ১৫ হাজার কোটি টাকা;

   (খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন/ স্বল্প সুদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান, ১০ হাজার কোটি টাকা;

   (গ) কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, ১০ হাজার কোটি টাকা;

   (ঘ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বীমা, ৩ হাজার কোটি টাকা;

(ঙ) সেটেলার বাঙালিদের সমতলে পুনর্বাসন, ২ হাজার কোটি টাকা।

৩. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট সকল বৃহৎ বর্গের খাত-উপখাতকে বাজেটে ভিন্ন লাইন আইটেম হিসেবে বরাদ্দসহ দেখানো হোক;

৪. কৃষি-ভূমি-জলা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারকি করতে মনিটরিং সেল গঠন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হোক।

পারিবারিক কৃষি

(১) পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর স্বীকৃতির বাস্তবায়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে;

(২) বাজেটে পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে;

(৩) প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভর্তুকিমূল্যে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং সঠিকভাবে বাধাহীন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) যেকোনো দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষককে দ্রুত এবং সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা জরুরি;

(৫) কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমা—আবাসন, শস্য, গবাদিপশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—চালুর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

(৬) শোষণ-বঞ্চনা-দারিদ্র্য-প্রান্তিকতার নিরন্তর শিকার খুদে পারিবারিক কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, তাদের ক্ষেত্রে গড় উন্নয়ন বরাদ্দ জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দের **চলমান গড় থেকে অন্তত তিনগুণ বেশি হওয়া উচিত;**

(৭) চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' বরাদ্দে মাথাপিছু জাতীয় গড় ১৪,২৬৪ টাকা; সেই হিসেবে খুদে পারিবারিক কৃষকদের জন্য এই গড় বরাদ্দ হওয়া উচিত তিনগুণ বেশি, অর্থাৎ ৪২,৭৯২ টাকা। সুতরাং, **৬ কোটি ২০ লাখ পারিবারিক শস্য-কৃষি খানা সদস্যের জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১০ কোটি টাকা।**

আদিবাসী মানুষ

(১) আদিবাসী মানুষের জীবনবঞ্চনা বিশ্লেষণে আমরা ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতের আওতায় (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) **"আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। আমাদের প্রস্তাবিত এই বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে মোট ৫ হাজার কোটি টাকা এবং আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

(২) ২০২১-২২ অর্থবছরের মাথাপিছু 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দ ১৪,২৬৪ টাকা হলে নিরন্তর বঞ্চনাক্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এই গড় বরাদ্দ হওয়া উচিত ৪২,৭৯২ টাকা। সুতরাং, **৩০ লাখ আদিবাসী মানুষের জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ১২ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা।**

(৩) আদিবাসী মানুষের গোষ্ঠীসংখ্যা (number of specific communities) এবং তাদের জনসংখ্যা নিয়ে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। ২০২১-এর আদমশুমারিতে আদিবাসী মানুষের গোষ্ঠীভিত্তিক সঠিক জন-গণনা নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে;

(৪) আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট সকল খাত-উপখাতভিত্তিক লাইন আইটেমসহ বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে; 'পার্বত্য' ও 'সমতল' এর আদিবাসী মানুষের জন্য ওই বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্ন দেখানো স্বচ্ছতার নিরিখে যুক্তিসংগত হবে;

(৫) আদিবাসী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, উপকরণ, হোস্টেলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে;

(৬) শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে আদিবাসী মানুষ দ্বিবিধ শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্য-অবদমনের শিকার: একবার দরিদ্র-প্রান্তস্থ-বহিঃস্থ মানুষ হিসেবে; আরেকবার আদিবাসী মানুষ হিসেবে। **বংশপরম্পরা বৈষম্য-দারিদ্র্যের শিকার আদিবাসী মানুষের মানবসত্তার স্বীকৃতি এবং তাদের ক্ষমতায়নে উন্নয়ন বরাদ্দের জাতীয় গড়ের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া যুক্তিসংগত;**

(৭) পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ৩ ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে:
(ক) আদিবাসী মানুষের জন্য, (খ) বাঙালিদের জন্য, এবং (গ) উভয়ের জন্য।

(৮) পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই যুগপূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বাজেটীয় বরাদ্দ দিয়ে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি ; 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সম্পর্কিত' এই ধরনের কোনো লাইন আইটেমে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার রক্ষায় মধ্য মেয়াদে **আগামী ৫ অর্থবছরে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭) কমপক্ষে ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে অর্থাৎ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকা**, যার মধ্যে থাকবে:

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৩ পার্বত্য জেলা * ৫ বছর) = ১,৫০০ কোটি টাকা,

(খ) আঞ্চলিক পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য উল্লিখিত ৫০০ কোটি টাকা আমাদের প্রস্তাবিত "আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিভাগ" থেকে সংকুলান করা যেতে পারে (দেখুন, সারণি ৫)।

(৯) জুমচাষিদের অন্তত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত যে তিন মাস তারা কর্মহীন থাকেন, সেই সময়ের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা জরুরি মানবিক সেবা (Emergency humanitarian service) হিসেবে গণ্য করতে হবে। জুমচাষিদের জন্য রেশন ব্যবস্থার অর্থসংকুলানের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত "বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ"কে দায়িত্ব দেওয়া সংগত।

সমতলের আদিবাসী

(১) সমতলের আদিবাসী মানুষের জীবনমান দেখভাল করার জন্য সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই। এ লক্ষ্যে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় এবং সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ থাকা জরুরি;

(২) পার্বত্য আদিবাসীদের মতো সমতলের আদিবাসীদের জন্যেও একটি ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে;

(৩) ওই কমিশনকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যকর করতে মধ্যমেয়াদি (৫ বছরব্যাপী) বরাদ্দ দিতে হবে;

(৪) হাওর এবং সমতলের অন্যান্য এলাকায় আদিবাসী মানুষের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি-জলার পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দসহ কার্যকর উদ্ধার মেকানিজমের পথ-নির্দেশ থাকতে হবে।

শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ

শত্রু/ অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন। অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৫০ বছর জিইয়ে রাখা হয়েছে; ভূ-সম্পত্তি হাতবদল হয়েছে, যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়তো বা দুষ্কর; সরকার বলছে তাদের হাতে মাত্র ২ লক্ষ ১৫ হাজার একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সব সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে; জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত—সুতরাং কেউ কেউ হয়তো বা ভাবতে পারেন যে সমস্যার সমাধানে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কল্পনাপ্রসূত অথবা যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয়। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট— সমস্যাটি মানবসৃষ্ট কিন্তু মনুষ্যবিরোধী। সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরনের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য।

আমরা মনে করি যে শত্রু/ অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হলো রক্ষক বা জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হলো ওই সম্পত্তি প্রকৃত মালিক এবং/ অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া; সেইসাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত (লিজ) দেওয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধিকার দেওয়া। সরকার যখন নিজেই বলছে যে ২ লক্ষ একরের বেশি জমি-

সম্পত্তি তার হাতে নেই, তখন ধরে নিলে হিসাবে কোনো ভুল হবে না যে ২০ লক্ষ একর জমি-জমা দুর্বৃত্তরা গ্রাস করেছে।

আমরা মনে করি, সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। যেহেতু সমস্যাটি ভূমিসম্পদকেন্দ্রিক এবং তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেহেতু আমাদের সুপারিশ হলো—সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

কৃষিঋণ ও উপকরণ ভর্তুকি

কভিড-১৯-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ কথা অনস্বীকার্য যে কৃষি ও কৃষক না থাকলে দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেত। কভিড-১৯-এর লকডাউনে প্রমাণ হয়েছে যে দেশের সকল অর্থনৈতিক খাত-ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষিখাতের "কভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা" (ইম্যুনিটি লেভেল) সর্বোচ্চ। রপ্তানিমুখী শিল্প খাতসহ বৃহৎ ঋণগ্রহীতারা যেসব সুযোগ/ প্রণোদনা পান কৃষক-কৃষি তা পান না। এখন ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত থেকে এ কথা অনস্বীকার্য যে—এখনই শ্রেষ্ঠ সময় ও সুযোগ—কৃষির প্রতি সর্বোচ্চ মাত্রায় জোর দেওয়া। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে কৃষককে দিতে হবে—

(১) বিনাসুদে ঋণ অন্তত সামনে ৫ বছর (মাইক্রো ক্রেডিট সংস্থাদের জন্যও তা করার নির্দেশনা দিতে হবে),
(২) বিনামূল্যে মৌলিক কৃষি উপকরণ (অন্তত সামনের ৫ বছর) যেমন বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক।

কৃষককে কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রদান

প্রকৃত কৃষক কখনওই তার শ্রমে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না। গত বছর লকডাউনের মধ্যে অসম্ভব প্রতিকূলতর মধ্যে যে বোরো ধান উঠল, তার কথাই ধরা যাক। চালকলমালিক আর পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষক তার ধান বিক্রি করলেন মণপ্রতি ৪০০-৬০০ টাকায় (দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মূল্য), ওই ধানেরই চালের দাম হয়ে গেল মণপ্রতি ১৪০০-১৫০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কেজি চালের দাম গড়ে ৩৭.৫০ টাকা। চালকলমালিক, পাইকার, পরিবহন ও 'নরমাল' মুনাফা (সব পর্যায়ে) যোগ করলে প্রতি কেজি চালের খুচরামূল্য হওয়ার কথা ২২.৫০ টাকা, তাহলে কৃষক প্রতি কেজি ধানে ঠকলেন কমপক্ষে ১০ টাকা। কৃষক উৎপাদন করলেন ২ কোটি মেট্রিক টন। তাহলে কৃষক তো শুধু বোরো ধানেই ঠকলেন ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ। আসলে বলা যৌক্তিক হবে যে, কৃষক ২০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স দিয়েছেন। এসব দেখার কেউ নেই, নেই কোনো সিস্টেম। কৃষক তো বলেছেন "ফসল লাগান ছাড়ি দিমু; ঠেলা বুঝবানে; রাঘব-বোয়াল বুজবে"। সর্বত্র সিন্ডিকেট–চালকলমালিক সমিতি, ধান ক্রেতা আড়তদার সমিতি, পরিবহন সমিতি ইত্যাদি। মারাত্মক যা, তা হলো—চাল বিক্রেতাদের মজুদ বাড়লে। সরকারি ক্রয় যথেষ্ট নয় অর্থাৎ বাজারে খুচরামূল্য বাড়বে, যখন ক্রেতার হাতে টাকা থাকবে না। এসব নতুন কথা নয়—নয়

আমাদের আবিষ্কার। এসবই বাস্তব সত্য। সম্ভাব্য 'লাল অবস্থা' এবং কৃষককে তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে—

(১) সরকারের মজুদ (ধান-চাল) আরো অনেক বাড়াতে হবে (যদিও কয়েক লাখ টন কিনেছে), প্রয়োজনে ভাড়া করা গুদামে চাল রাখতে হবে—এটি একান্ত জরুরি।

(২) সরকারিভাবে সংগ্রহের ক্রয়মূল্য শুধু উৎপাদন খরচের তুলনায় কমপক্ষে ২০ শতাংশ বাড়ালেই হবে না (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বোরো ধানের মণপ্রতি বিক্রয়মূল্য হওয়া উচিত কমপক্ষে ১২০০ টাকা), সেইসাথে নিশ্চিত করতে হবে প্রকৃত কৃষকই (মধ্যস্বত্বভোগী-দালাল নয়) যেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই ওই বাজারমূল্য নিশ্চিতভাবে হাতে পান। সরকারিভাবে সংগ্রহের কাজটি সরকারি উদ্যোগেই বিভিন্ন হাটবাজার-মোকামে সংগঠিত করতে হবে।

(৩) কৃষিপণ্য উৎপাদনের আগেই কৃষক যখন থেকে জমি প্রস্তুত শুরু করবেন, তখন থেকেই তাকে স্বল্প সুদে অথবা পারলে বিনাসুদে (অন্তত দরিদ্র, প্রান্তিক, খুদে কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার কৃষকদের) স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিতে হবে, যাতে তিনি চড়া সুদের ঋণের জালে আবদ্ধ না হন অথবা কৃষিকাজে লোকসানের কারণে সম্পদহীন হয়ে না পড়েন।

(৪) কোনো কারণে কৃষিফসল মার গেলে মূল ঋণ (সুদ তো বটেই যদি থাকে) মওকুফ হয়ে যাবে।

(৫) কৃষককে কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রদানের বিষয়টি আসন্ন বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমরা ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

কৃষি ফসলের উৎপাদন-অঞ্চল গঠন, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ ও বিপণনব্যবস্থা সংস্কার

বাংলাদেশের কৃষি এখনও প্রকৃতিনির্ভর। যত না বাজারের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি নিজ প্রয়োজনে কৃষক ফসল উৎপাদন করেন। বাজারমূল্যের চেয়ে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বেশি। ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। শুধু ফসলই নয়, প্রাণিজ আমিষের বাজারমূল্যও অনিয়ন্ত্রিত। তৈলবীজ ও মসলাজাতীয় শস্য উৎপাদনের সুযোগ ও চাহিদা আছে। কিন্তু সে অনুযায়ী উৎপাদন হয় না। আবার সব এলাকায় সব ফসল হয় না। এসব বিবেচনায় আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) কৃষিপণ্যের সময়ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ করে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য বাজেটের আওতায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিধাজনক এলাকা ভাগ করে কৃষি উৎপাদন অঞ্চল গঠন করা দরকার।

(২) দেশের কৃষি-পরিবেশ জোনভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য বহুমুখীকরণ-এর দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৩) কৃষিখাতের উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য বিপণনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাসে সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ। প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক (প্রয়োজনে বিশেষ গ্রামসহ) কৃষি উপকরণ, পণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ (প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ) নির্মাণকল্পে বিশেষ কর্মসূচিভিত্তিক অবকাঠামো তৈরিতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

হাওর-বাঁওর-বিল-চর-প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য সুদবিহীন ঋণ

দারিদ্র্যপীড়িত ভৌগোলিক এলাকা (হাওর-বাঁওর-বিল-চর) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (climate-natural calamities hotspots) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (ছয় মাস) ঋণ প্রদান একই সাথে দারিদ্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে দেশের ২৬ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—১ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে; ২ লক্ষ ২০ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে; পশু ও মৎস্যসম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; কয়েক লক্ষ গাছপালা উপড়ে গেছে; কমপক্ষে ২০০ ব্রিজ-কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; শতাধিক গ্রাম সম্পূর্ণ পানির তলায় তলিয়ে গেছে; কমপক্ষে ১৫০ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে গেছে; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ১০ লক্ষ মানুষ। বাংলাদেশে এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাইক্লোন আম্ফানসহ এ ধরনের দুর্যোগে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, তা পূরণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। আমাদের সুপারিশ হলো:

(১) দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ, হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন, এবং আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের বিষয়াদি আসন্ন বাজেটে বিবেচিত হওয়া ন্যায়সংগত।

হাওরাঞ্চলের প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন

(১) হাওর-বাঁওর-বিল-চরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা নিরসন ও উন্নয়ন সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—

(ক) **"হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ"** (কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে) প্রতিষ্ঠা করা,

(খ) প্রস্তাবিত এই বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা (দেখুন, সারণি ৫)।

(২) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা নিতে লিজের টাকার পরিমাণ কমাতে হবে;

(৩) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিনাসুদে বা সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

কৃষি বীমা

ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা", "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা", "গবাদিপশু বীমা" প্রভৃতি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ-নির্দেশসহ ব্যয়-বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত

সাম্প্রতিককালে, বাংলাদেশের উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ আজ মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। পোলট্রি, দুগ্ধ, মাংস, ভেজিটেবল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভাবিত এই সাফল্যকে টেকসই করতে পরিকল্পিতভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(১) সবপর্যায়ের খামারিদের প্রণোদনা, ভর্তুকি এবং বীমার আওতায় আনা,
(২) সকল খামারির সাথে টেকনোলজি ও সংশ্লিষ্ট গুণগত ও স্বাস্থ্যগত মান নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণকরণ,
(৩) এই উপখাতে, উৎপাদন ও পণ্যের বাজারজাতকরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সুসমন্বিত করে একটা দায়বদ্ধতামূলক মেকানিজম (কর্মপদ্ধতি) প্রতিষ্ঠাকরণ,
(৪) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ খাতের স্বীকৃতি দিয়ে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। ইনোভেশন ও গবেষণায় বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন

কৃষিতে সরকারিভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন বরাদ্দ (R & D expenditure) যথেষ্ট অপ্রতুল। ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় ছাড়া প্রকৃতিবান্ধব-স্থায়িত্বশীল কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বৈষম্য হ্রাস ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন। কৃষিতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) কৃষিতে ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ দিতে হবে, তবে এ বরাদ্দ শর্তহীন হবে না। 'গবেষণা ও উন্নয়ন'-এর নামে এমন কোনো বরাদ্দ দেওয়া যাবে না অথবা প্রাইভেট সেক্টরে বরাদ্দ হলে তা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেইসব বরাদ্দ—যা শেষপর্যন্ত মানুষসহ প্রাণিকূলের স্বাস্থ্যগত-শরীরগত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংসের কারণ হতে পারে।
(২) এ বছর আমরা "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি। এই মন্ত্রণালয়ের জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ, আর আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)। প্রস্তাবিত এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় সার্বিক কৃষি উন্নয়নের কৌশলগত কারণে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে শুধু কৃষিখাতে গবেষণায়, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও

উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত ১ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে কমপক্ষে **২০ হাজার কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা।

তামাক চাষ বন্ধ করা

কৃষিজমির বাণিজ্যিক ব্যবহার, যা খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, বিশেষত তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নির্দেশনা থাকা আবশ্যক। একদিকে তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে অন্যদিকে এখনকার তামাক চাষিদের তামাক চাষ ছেড়ে পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজে নিযুক্ত হতে প্রণোদনা দিতে হবে।

৪.১২ ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়

এ দেশে ভূমি মামলা বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়নের অংশ হিসেবে। আর এসব বৈপ্লবিক এবং/ অথবা বড় মাপের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব, যা ভূমি মামলাসংশ্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারে: (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইনব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)—বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার প্রচেষ্টাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ, যা বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে:

(১) সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) স্থানীয়পর্যায়েই (গ্রাম/ ইউনিয়ন/ পাড়া/ মহল্লা) প্রচলিত প্রথাগত 'সালিস' পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যদের মধ্যে নারীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) স্থানীয়পর্যায়ে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার জন্য স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

(৪) দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি ট্রাইবুনাল গঠন করা।

(৫) ভূমি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা—তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসম্মত (কারণ দ্রুত নিষ্পত্তি আর্থিক-পেশি প্রতিপত্তিশালী রেন্ট-সিকারদের স্বার্থসিদ্ধিসহায়ক হতে পারে)। ভূমি মামলা শ্রেণিবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণির মামলার নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।

(৬) নৈতিক উন্নত মানসকাঠামোসম্পন্ন অধিকসংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী বিচারক নিয়োগ দেওয়া।

(৭) ন্যায়বিচারের রায় কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (যেমন এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।

(৮) ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।

(৯) মাঠপর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত ছাড়া *মিউটেশন* (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।

(১০) ভূমি মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরত রাখা—বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা)।

(১১) জমির জাল দলিল/ কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে যারা সম্পৃক্ত, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা (এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।

(১২) এমন আইন করা, যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

(১৩) সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলম্যান্টের কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন—সরকারকে এই দায়িত্ব নেওয়া।

(১৪) আইনজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; মামলার শ্রেণিভিত্তিক ফি নির্ধারণ; ম্যালপ্র্যাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।

৪.১৩ ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা

(১) খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ অকৃষি খাসজমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

(২) ১৯৯৪ সালের শিকস্তি-পয়স্তি আইনের সংশোধনী বাতিল করা এবং শিকস্তি-পয়স্তির সকল চর-ভূমি খাস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া।

(৩) রিয়াল এস্টেট ব্যবসা অথবা তথাকথিত গৃহায়ণের নামে খাসজমি, জলাশয়-জলমহাল দখল ও ভরাট কঠোরভাবে দমন করা।

(৪) খাসজমি-জলা ও উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত জমি-সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার (সংবিধানিক অধিকার) ও ভোগদখল নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

(৫) অকৃষিজমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং নির্ধারণপূর্বক আইন প্রণয়ন করা এবং সিলিং উদ্বৃত্ত অকৃষি জমি সরকারের হাতে নিয়ে বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার করা।

(৬) সকল ভূমি জরিপ কাজ প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও স্থায়ী জরিপকারীদের দিয়ে করার ব্যবস্থা নেওয়া।

(৭) ভাগ/বর্গাচাষসহ অন্যান্য ভোগদখল স্বত্বসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের আদলে করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা। বর্গাস্বত্ব আইন যথাদ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যেন তা দরিদ্রবান্ধব হয় এবং বর্গাধীন জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

(৮) কৃষিখাতে কর্মরত দিনমজুরসহ নারী-পুরুষভেদে সবার জন্য বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ।

(৯) ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতর করতে রেকর্ড সংরক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন ও সেটেলম্যান্ট একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা।

(১০) ভূমিপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয়পূর্ণ একক কর্তৃত্বে আনার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট (CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership) প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা (এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকসমূহ জনগণকে অবহিত করা)।

(১১) ভূমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি "জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি" (National Land-Water Utilization Policy; National Land Use Policy) প্রণয়ন করা।

(১২) সরকারিভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা, যে ব্যাংকে ভূমি-জলাসংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হালনাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে-কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাসজমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সব অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত অন্যান্য; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা প্রভৃতি; চিংড়িঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবরদখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সব ভূমি মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধের কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা; সব বর্গাদারের বর্গাস্বত্বসংশ্লিষ্ট তথ্যের হালনাগাদ অবস্থা প্রভৃতি।

(১৩) কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, চরের জমি, আদিবাসীদের ভূমি, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়িমহাল, চা-বাগানের জমি, ওয়াক্ফ, ট্রাস্ট, দেবোত্তর সম্পত্তি, জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, ভূমি ব্যবহার, ভূমি জরিপ, ভূমি সংস্কার, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন—এসব নিয়ে যেসব আইনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।

(১৪) ভূমি সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সমানাধিকারসহ একক উত্তরাধিকার আইন (unitary law of inheritance) প্রণয়ন করা।

৪.১৪ শিক্ষা—শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার

শিক্ষাকে শোভন মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বিবেচনার নিরিখে শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

'শিক্ষা' নিয়ে মূল প্রস্তাব

(১) (প্রধান প্রস্তাব) সরকারে যে বা যারাই থাকুন না কেন প্রথমেই নিঃশর্ত স্বীকার করে নিতে হবে যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো—জ্ঞানসমৃদ্ধ বিচার-বোধসম্পন্ন নৈতিক দৃষ্টিতে উন্নত ও সৌন্দর্যবোধ চেতনায় সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা—যে মানুষ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে সহায়ক হবেন; যে মানুষ তার আত্মিক গভীরতার বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম; যে মানুষ তার সৃজনপ্রতিভার প্রস্ফুটন ঘটাবেন এবং একই সাথে অন্যদের সৃজনশীল ভাবনা-চিন্তা বিকাশে সহযোগী হবেন, যে মানুষ মানুষে-মানুষে বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে উদ্যোগী হবেন, যে মানুষ সমাজ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজের ও অন্যের জ্ঞানভিত্তিক কল্পনাশক্তির বিকাশ, প্রসারণ ও কর্ষণে প্রভাবক হবেন; যে মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার নিরিখে অন্য সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণে অভ্যস্ত হবেন; যে মানুষ হবেন প্রগতিচিন্তার সচেতন বাহন; যে মানুষ জ্ঞানকে খণ্ডিত আকারে দেখবেন না, দেখবেন বড় পর্দায়—সমগ্রকতার নিরিখে।

(২) উল্লিখিত প্রধান প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বিনির্মিত হতে হবে জাতীয় শিক্ষা নীতি।

(৩) 'শিক্ষা'কে কোনোভাবেই 'ব্যয়' (expenditure) হিসেবে দেখা যাবে না। শিক্ষাকে দেখতে হবে শোভন মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিনিয়োগ (social investment) হিসেবে।

(৪) 'শিক্ষার' মূল শাখা যেটাই হোক না কেন—প্রকৃতিবিজ্ঞান অথবা সামাজিক বিজ্ঞান, হার্ড সায়েন্স অথবা সফট্ সায়েন্স—শিক্ষা হতে হবে 'বহুশাস্ত্রীয়' (multidisciplinary)। কারণ, বাস্তব জীবন যেমন কোনো এক শাস্ত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নয়, তেমনি তা স্থির নয়—গতিময় (not static but dynamic)। যিনি এটম বোমা বানানোর শিক্ষা গ্রহণ করে তা বানিয়ে বলেন—"আমি জানতাম না যে এটম বোমা মেরে হিরোশিমা-নাগাসাকি উড়িয়ে দেওয়া হবে"—তিনি ইতিহাস শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত নন—তার শিক্ষার সামাজিক মূল্য নেই। আর যিনি অর্থনীতির কোনো এক তত্ত্ব দিয়ে বলেন—"বুঝিনি, এ তত্ত্বের প্রয়োগে যে নিজের দেশের বা বিশ্বের এত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে"—তিনি ক্ষতির দায় এড়াতে পারেন না। সুতরাং আমাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—শিক্ষা হতে হবে 'বহুশাস্ত্রীয়', যেখানে সকল শাখার শিক্ষার্থীকে যথাযোগ্য মাত্রায় কমপক্ষে যা জানতে হবে, তা হলো— প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জীববিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্ত্ব,

সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, রাজনীতি। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নে বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বেশকিছু মিথ্ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্যভিমান, ভৌগোলিক কর্তৃত্ব-আধিপত্য, অশুভ বিদ্যাভিমান, শ্বেতাঙ্গতা, জ্ঞানজগতের সচেতন কর্তৃত্ববাদী-আধিপত্যবাদ। আমরা অন্য-সবার জ্ঞান থেকে শিখব কিন্তু 'কপি' করব না।

(৫) একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিক হারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি, আর অন্যদিকে বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থাসহ ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যয় প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানালোকিত করে না। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞান এখন সমার্থক নয়। শিক্ষা এখন 'বিদ্যাবস্তু'। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য সমাজজীবনকে প্রগতিবিমুখ করছে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭৫-পরবর্তী বিগত ৪৬ বছরে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এখন বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসাগামী—এটা শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ ফল। এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করছে, অন্যদিকে তা—ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট করছে। প্রবণতাটি মারাত্মক। কাজেই, আসন্ন বাজেটসহ রাষ্ট্র-সরকারের সকল দলিলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট উত্থাপিত প্রধান প্রস্তাবটি (প্রস্তাব ১) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব বিষয়াদি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণসহ সমাধান-উদ্দিষ্ট পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। তবে ভবিষ্যৎ শিক্ষা নীতি প্রণয়নে আমাদের প্রথম প্রস্তাবটি (প্রধান প্রস্তাব) সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। সেইসাথে শিক্ষার স্তরভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল প্রভৃতি, এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্নভাবে দেখানো উচিত। এ বরাদ্দের অন্তঃখাত অনুপাত নির্ধারণে মূলধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যৌক্তিক করতে হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শুরু করা যৌক্তিক।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ জিডিপির ৮%

(১) দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জিডিপির অনুপাতে শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ সবসময় নিম্নগামী। লজ্জার বিষয়, তবে সত্য যে—শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের নিরিখে আমাদের অবস্থান পৃথিবীর ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৮৮তম (জিডিপির ১.৫%;

আমাদের তলায় আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদান)।[৩] আমরা যেখানে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়ে ভবিষ্যতে উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে চাই, সেখানে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাখাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ করতেই হবে। এ লক্ষ্যে, আমরা যৌক্তিকভাবে আসন্ন বাজেটে শিক্ষাখাতে (আসলে সরকারি বাজেটে খাতটির নামকরণ "শিক্ষা ও প্রযুক্তি") বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন মিলিয়ে) এখনকার তুলনায় ২.৫৪ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি, যা জিডিপির ৮ শতাংশের সমপরিমাণ। **আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমরা শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে মোট ২ লক্ষ ৪১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একই সাথে এই বাজেটে নতুন উপখাত হিসেবে 'নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ'-এর জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।**

(২) সরকারি দলিলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট খাতটির বাজেটীয় নাম 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি'। আমরা মনে করি, এর পরিবর্তন দরকার। বাজেটে এখন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে দুটি খাত আমরা প্রস্তাব করছি—প্রথম খাত হবে 'শিক্ষা ও গবেষণা', আর দ্বিতীয় খাত হবে 'প্রযুক্তি'। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুধু 'শিক্ষা ও গবেষণা' খাতে আমাদের বরাদ্দ প্রস্তাব জিডিপির ৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২০ কোটি টাকা।

(৩) 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাতে 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ' নামে যে উপখাত আছে, তা 'কারিগরি শিক্ষা বিভাগ' এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ' নামে আলাদা করা দরকার। সে অনুযায়ী আসন্ন বাজেটে বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে 'পরিচালন' ও 'উন্নয়ন' নামে থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের বরাদ্দ প্রস্তাব 'কারিগরি শিক্ষা বিভাগে' ৩২ হাজার কোটি টাকা আর 'মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে' ৩ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)।

শিক্ষা বাজেটে গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে চিন্তা

(১) এ যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মূলত পুঁজি সঞ্চয়ন (capital accumulation) এবং শ্রমিক উপকরণের সম্প্রসারণ ও গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রগতিমুখী উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের কৌশল ও নীতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এ জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে, যার মধ্যে থাকবে:

(ক) সরকারগৃহীত "জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাস্বত্ব নীতি-২০১৮"-এর আশুবাস্তবায়নে 'রোডম্যাপ' প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা।

[৩] দেখুন, UNDP 2020. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st Century, পৃ. ৭-১৫, ২-৩৭

(খ) প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণার জন্য, সায়েন্স এবং ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রদান।

(গ) R & D এবং Innovation-এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রযুক্তি যথাযথভাবে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন। এ জন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি।

(ঘ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ভালোভাবে পর্যালোচনাপূর্বক শিক্ষা নীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।

(২) শিক্ষা বাজেটে অন্যান্য বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ, সাঁতার শেখার পুকুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুপুরের খাবার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তিঘর ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) শিক্ষাসহ মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ—এসব নিয়ে গতানুগতিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে **"গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন"** নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি **মন্ত্রণালয়** গঠনের প্রস্তাব করছি, যে মন্ত্রণালয়ের জন্য ৮০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মানের অবক্ষয় রোধ

শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি এবং মানের অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে:

(ক) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমনভাবে বাড়াতে হবে, যাতে করে শুধু যোগ্য ও মেধাবী মানুষ শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হন;

(খ) বেসরকারি সকল স্কুল (প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক) ও কলেজে—সরকারের এমপিওভুক্তি নির্বিশেষে—শিক্ষকদের বেতন-ভাতা-বোনাস প্রদানে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না;

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রগতিমুখী সংস্কারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঘ) ক্যাডেট কলেজ পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারি ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার এবং পর্যায়ক্রমে মূলধারার সাথে একীভূত করা;

(ঙ) নোটবই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

(চ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; এবং

(ছ) কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা।

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধি

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধিতে জাতীয় বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এসবের পাশাপাশি, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে, কন্যা শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে যৌক্তিক।

প্রশিক্ষণব্যবস্থা

উন্নত-বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণব্যবস্থা বিদেশনির্ভর। অহেতুক বিদেশ ভ্রমণ ও প্রমোদের পরিবর্তে দেশেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাংলাদেশেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সব মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ একই ছাতার নিচে প্রশিক্ষিত হতে পারে। প্রশাসনিক বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ কাজের জন্য, বিভাগীয় প্রশিক্ষণে স্থানীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞের ব্যবহার স্থানীয় পর্যায়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন; ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীনকরণের পদক্ষেপ এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়

মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা মাতৃদুগ্ধসম (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ)। একজন মানুষ যে 'ভাষায়' ভাবনা-চিন্তা করেন, যে ভাষায় স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় দৈনন্দিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন ওই ভাষার সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রগতি, চিন্তাজগতের বিকাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ভাষাটি 'বাংলা'। সুতরাং শিক্ষার সব স্তরে বাংলা ভাষাকে জ্ঞান-চর্চার মূল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষাকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্য কোনো ভাষা শিখব না। অবশ্যই শিখব এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে সব শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে দুটি বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বলা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে একটি দেশও পাওয়া যাবে না যে দেশটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নতি করেছে নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন ভাষায় জ্ঞান চর্চা করে। বিষয়টি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে নীতিগত বিষয়। বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি এবং সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে যেসব উপখাত-ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ থাকা কাম্য, তা হলো: জাতীয় অনুবাদ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা (যার প্রধান কাজ হবে বাংলা ভাষার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে বিদেশি ভাষায় অনুবাদ এবং বিদেশি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং এসব জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া), বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন (যার প্রধান কাজ হবে উচ্চশিক্ষাপর্যায়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, তবে

বাংলা একাডেমি থাকবে), ব্যাপক হারে গণ-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তৃতি, সারা দেশে শিশুদের মন-মনন-স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য বড় ক্যাম্পাসভিত্তিক শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট প্রণোদনা দেওয়া, ছাপার কাগজের একচেটিয়া ব্যবসার খপ্পর থেকে প্রকাশকদের মুক্তি দেওয়া, লেখক চিকিৎসা তহবিল গঠন করা, সরকারি অর্থায়নে বই ক্রয় বৃদ্ধি এবং ক্রয়প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৪.১৫ স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত

আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য—শোভন সমাজ বিনির্মাণে সবচেয়ে মৌলিক-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য আমাদের দেশে মানুষের স্বাস্থ্য বৈষম্য-অসমতা-বঞ্চনা দূর করা জরুরি। আর মানুষের স্বাস্থ্য বৈষম্য-অসমতা দূর করার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রধান-মৌলিক প্রস্তাব, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব এবং স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নসহ আসন্ন বাজেটসহ সরকারের উন্নয়নসংশ্লিষ্ট সব দলিলে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে মৌলকরণীয়

(১) প্রধান-মৌলিক প্রস্তাব: রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে (সরকারে যে-ই থাকুক না কেন) স্বীকার করতে হবে যে তারা সংবিধানের বিধি মোতাবেক জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা—স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। পুঞ্জীভূত এ ব্যর্থতার দায়ভার নিতে হবে। ইউএনডিপি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের নিরিখে আমাদের অবস্থান পৃথিবীর ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৮৮তম।

(২) উল্লিখিত ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো সংবিধান অগ্রাহ্য করে জনগণের স্বাস্থ্যকে বাজারের হাতে, বাজার অন্ধত্বের হাতে, বিকৃত মুক্তবাজারের হাতে—নির্বিচারে হস্তান্তর—এ কথা স্বীকার করতে হবে।

(৩) জনগণের স্বাস্থ্যসহ পুরো জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বাজারের হাতে সোপর্দ করার যুক্তি থাকলে, সে যুক্তি জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে হবে এবং একই সাথে এ নিয়ে নাগরিক সমাজের সাথে সিরিয়াস তর্ক-বিতর্ক-সংলাপ করতে হবে।

(৪) সরকার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে জনগণের স্বাস্থ্য বাজারের হাতে সোপর্দ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সংবিধানের সেইসব অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে স্পষ্ট লেখা থাকবে যে "স্বাস্থ্য—মৌলিক অধিকার নয় এবং জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব বাজারের ইত্যাদি"। তবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে রাষ্ট্রের দায়িত্বসংশ্লিষ্ট বর্তমান সংবিধানের বিধানসমূহ সাধারণ কোনো বিধান নয়, তা *"রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"*র অংশ, বিধায় তা পরিবর্তন করতে হলে জনগণের সম্মতি নিতে হবে।

(৫) স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকে ব্যয় হিসেবে নয়, বিনিয়োগ হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা

করছে, তখন আমাদের দেশে এই খাত উত্তরোত্তর অধিক হারে বাজারের হাতে সমর্পণ করার মহাবিপজ্জনক প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হচ্ছে—রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকে আশ্রয় নিচ্ছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচরণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে—যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল। এ অবস্থায় একবিংশ শতকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এখন শুধু প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কথা বললে হবে না, বলতে হবে দ্বিতীয় স্তর (secondary health care) ও উচ্চতর ও বিশেষায়িত (tertiary and specialized) স্বাস্থ্যসেবার কথা। আসন্ন বাজেটসহ ভবিষ্যতের সব বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের অগ্রাধিকার এবং বেসরকারি-প্রাইভেট স্বাস্থ্যখাতের যৌক্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে সুর্নিদিষ্ট পথনির্দেশনা আমরা আশা করছি।

(৬) **কভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিচার-বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্যখাতে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা" নামে নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (৫০ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ ও ১০ হাজার কোটি টাকা পরিচালন বরাদ্দ) (দেখুন, সারণি ৫)। প্রস্তাবিত 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ' যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করবে, তার মধ্যে থাকবে: জীবজন্তু প্রাণিবাহিত রোগ, বায়োসেফটি, রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং, সমন্বিত ডেটাবেজ, র‍্যাপিড রেসপন্স, জনস্বাস্থ্য সিস্টেম প্রতিষ্ঠা, জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি, জনস্বাস্থ্য ইমারজেন্সি মোকাবিলায় দক্ষতা এবং সবধরনের টিকাসংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উৎপাদন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্য।**

(৭) স্বাস্থ্যখাতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ চলতি বছরের বাজেটের তুলনায় আমরা প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে যখন স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় ১২ ডলার হওয়া উচিত, তখন তা আমাদের দেশে মাত্র ২.৪ ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বলছে যে একটি মানসম্মত স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৫ শতাংশ, সেখানে গত বছর এই খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল জিডিপির মাত্র ০.৯২ শতাংশের সমপরিমাণ (অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের চেয়ে ৫ গুণ কম)।

দারিদ্র্যের রোগ নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দে প্রাধান্য প্রদান

স্বাস্থ্যখাতে "দারিদ্র্যের রোগ" (diseases of poverty) নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ প্রাধান্য দেওয়া হোক। এসব রোগের অন্তর্ভুক্ত যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদানপ্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়েরিয়া, হাম, এবং আর্সেনিকোসিস। বিষয়টি ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্যের

জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, অনতিবিলম্বে দারিদ্র্যের রোগ হ্রাস করতে না পারলে ভবিষ্যৎ সরকার ও পরিবার—উভয়েই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে। ফলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হবে, আর মধ্যবিত্ত মানুষের বিত্তের অধোগতি হতে বাধ্য। এসবের ফলে সমাজে বৈষম্যও বাড়বে।

মাতৃমৃত্যু হ্রাস

মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৫৭৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে/ প্রসবে) নামিয়ে আনার কথা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী আমাদের দেশে ২০১৭ সালে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ১৭৩ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)। সংশ্লিষ্ট এই খাতে সরকারের সর্বশেষ বাজেট বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ২৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন বছরে কমপক্ষে আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকা। সে জন্য আমাদের প্রস্তাব এ খাতে সরকারি চলমান বরাদ্দের তুলনায় তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হোক। বিকল্প বাজেটে আমরা সেটাই প্রস্তাব করছি।

মাতৃদুগ্ধের অপরিহার্যতা

(১) শিশুদের জীবনসমৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোনোই বিকল্প নেই। যে কারণে একদিকে যেমন নবজাতক শিশুদের জন্য "শুধু মায়ের দুধ" (exclusive breast feeding) নিশ্চিত করার জন্য সবধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, তেমনি অন্যদিকে মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে যেসব গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, আমরা তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে—প্রাকৃতিক কারণেই।

(২) মায়ের দুধের কোনোই বিকল্প থাকতে পারে না এবং মায়ের দুধ (শালদুধসহ) একজন নবজাতক শিশুকে প্রায় সবধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে—এ কথা সরকারিভাবে স্বীকার করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজেট খাতে তা প্রতিফলিত হতে হবে।

শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ

(১) আমাদের দেশে শিশুর জন্মের ১ দিনের মধ্যে, জন্মের ৭ দিন এবং জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যুহার তুলনামূলক অত্যুচ্চ। অথচ এই অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করা শুধু যে সম্ভব তা-ই নয়, তা স্বল্প ব্যয়েই সম্ভব। আর শিশুদের এই অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারলে ওই শিশু সুস্থ-দীর্ঘ জীবন পাবে। স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট এই উপখাতে আমরা ১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

(২) শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ-উদ্দিষ্ট বরাদ্দের গন্তব্যস্থল হতে হবে প্রধানত জেলাশহরের হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল, ইউনিয়নপর্যায়ের হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিক।

নবজাতক শিশুর স্ক্রিনিং সেবা

নবজাতক শিশুদের অনেকেই হাইপোথাইরয়েডইজম-এ আক্রান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ নিউবর্ন স্ক্রিনিং সেবা একদিকে যেমন সাশ্রয়ী, তেমনি অন্যদিকে এই সেবা (পরীক্ষা) প্রদানে তেমন প্রশিক্ষিত কর্মীরও প্রয়োজন হয় না। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মরত মাঠকর্মীরাই এই সেবা প্রদানে সক্ষম। নবজাতক শিশুর থাইরয়েড স্ক্রিনিং খাতে এ বছর প্রাথমিকভাবে আমরা ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। সেইসাথে বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমাদের প্রস্তাব হলো নবজাতক শিশুর স্ক্রিনিং সেবা বিষয়টি স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হোক।

পুষ্টি

এতদিন ধরে মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তদনুযায়ী মোট ক্যালরি হিসেব করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে দরিদ্র-অদরিদ্র পরিমাপ করা হয়েছে (যেমন একজন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করেন তিনি হবেন দরিদ্র, অন্যথায় অদরিদ্র)। এসব হিসেবে পুষ্টিগুণের বিচার নেই। খাদ্য গ্রহণের এসব হিসেবপত্তর বিজ্ঞানসম্মত নয়। আমাদের প্রস্তাব:

(১) খাদ্য গ্রহণের নিরিখে একজন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করতে হবে পুষ্টি দিয়ে। বিষয়টি বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে ব্যয় বরাদ্দ দিতে হবে।

(২) পুষ্টি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত মা, বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে (গর্ভকালীন ও প্রসবপরবর্তী—উভয় সময়েই) এবং দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সবার ক্ষেত্রে।

(৩) শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ-ভেজালমুক্ত খাদ্য

ভেজালহীন, নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়া, জোরদার করা এবং তা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, দীর্ঘদিন বিষাক্ত-ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মা ও তার গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতি হয়, সন্তানও ক্যানসার-কিডনি-লিভারসহ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, জন্ম হয় বিকলাঙ্গ শিশু, গর্ভস্থ শিশুর স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে—এসব ঝুঁকি হতে পারে ভয়াবহ ও বংশপরম্পরা। গবেষণা এও বলছে, খাদ্য বিষমুক্ত-ভেজালমুক্ত করা গেলে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ভেজাল খাদ্য, অনিরাপদ খাদ্য ও গুণমানহীন খাদ্য একদিকে যেমন বহু ধরনের অসুখ-বিসুখের প্রধান কারণ, তেমনি তা ক্রমবর্ধমান আয়ুষ্কালে অসুস্থ-জীবন ও সমৃদ্ধিহীন দীর্ঘায়ুরও

প্রধান কারণ। নিরাপদ, ভেজালমুক্ত, মানসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

(১) সুপেয় পানি (খাওয়ার) ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনসহ) জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। এ দুই উপখাতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তা অনেক বাড়াতে হবে। এ দুই উপখাতের জন্য বাজেটে ভিন্ন লাইন-আইটেম থাকা জরুরি।

(২) সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের দলিলই বলছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। আর খাবার পানির অর্ধেক (৫০%) আর্সেনিক অথবা ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়াযুক্ত। ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিকদূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং অত্যন্ত বড় মাপের জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু, সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি এ পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আবুল হুসসাম আবিষ্কৃত সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বাজেটে উল্লেখ এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

(৩) দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খাওয়ার পানির লবণাক্ততা সমস্যা সমাধান না করতে পারলে এসব অঞ্চলের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও জীবনসমৃদ্ধি কোনো দিনই উন্নত হবে না। এ সমস্যা সমাধানে বাজেটে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১৬ শিল্পখাত

এ কথা সত্য যে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আমরা শিল্পায়নমুখী হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেটাও প্রচলিত পন্থার শিল্পায়ন নয়—রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয়করণকৃত খাতের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে (১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পরে) বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে (যে জন্য মুক্তির মতাদর্শসহ বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করা হলো) নব্য-উদারবাদী মতাদর্শের সামনে নতজানু হয়ে সবকিছু বিরাষ্ট্রীকরণ ও ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার হাতে সোপর্দ করেও শিল্পায়নপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারিনি। যাও বা হয়েছে তা আবার শিল্পের নামে ধনী দেশ থেকে স্থানান্তরিত ও উচ্ছেদিত প্রকৃতি-পরিবেশবিধ্বংসী কিছু শিল্প, স্বাস্থ্য বিপর্যয়কর কিছু শিল্প, উচ্ছিষ্ট শিল্প, সস্তা শ্রম শোষণভিত্তিক অতিশোষণকারী কিছু শিল্প—যা ক্রমবর্ধমান হারে বৈষম্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে এবং যার স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো ধনাত্মক সামাজিক মূল্যই নেই। তাহলে সম্ভবত এ কথা বলা যায় যে বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে বিগত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে যতটুকুই শিল্প গড়ে উঠেছে, তা কোনো অর্থেই 'কল্যাণ শিল্প নয়' তা মানুষের জীবনের জন্য "বিপর্যয়কর শিল্প" এবং খুব ভালো হয়েছে যে ওই শিল্প এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় ও মাত্রায় গড়ে ওঠেনি। এর অর্থ এই নয় যে আমরা

শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার বিরোধী, উল্টো আমরা শিল্প চাই—চাই শিল্পায়ন-জনকল্যাণকামী পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। আর সে লক্ষ্যেই আমাদের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

শিল্পায়নের মৌলভাবনা ও করণীয়

(১) (প্রধান মৌলিক প্রস্তাব) আমরা এমন শিল্পায়ন চাই না, যা ব্রিটেনে শিল্পায়নের মতো গ্রাম থেকে মানুষ খেদিয়ে সেখানে ভেড়ার দল পুষবে (ব্রিটিশ শিল্পায়নে ঘেরাও মুভমেন্ট, enclosure movement, ম্যানর পদ্ধতি)। আমরা চাই মানবকল্যাণকামী শিল্পায়ন, যা মানুষকে উচ্ছেদ করবে না—মানুষকে তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না এবং একই সাথে যা কখনও কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতিবিধ্বংসী হবে না, মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য-মন-মনন বিধ্বংসের কারণ হবে না, বৃহত্তর ও সম্ভাব্য দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক স্বার্থবিরোধী হবে না।

(২) শিল্পায়ন হতে হবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অথবা শ্রমিকদের সমবায়ী উদ্যোগে—যৌথ উদ্যোগে। অর্থাৎ শিল্পের মালিক হবেন তারা, যারা শিল্পে শ্রম দেবেন—মেহনত করবেন। শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে শ্রমিকদের পক্ষে রাষ্ট্র এবং/ অথবা শ্রমিকদের সমবায়ী-যৌথ উদ্যোগ।

(৩) যেকোনো পথ-পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বনে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই। এ প্রতিযোগিতা প্রকৃতিকে ক্ষয় করে, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট করে, সমাজকে ক্ষয় করে, বিশ্বে মানুষে-মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে—এ প্রতিযোগিতা অন্যায্য, অনৈতিক, অন্যায় ও অশুভ।

(৪) শিল্পায়নের শুরুটা হালকা শিল্প দিয়ে হলেও যথাসম্ভব দ্রুত ভারী শিল্পের দিকে (অর্থাৎ যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র বানানোর শিল্প) যেতে হবে।

(৫) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা artificial intelligence-সংশ্লিষ্ট সবধরনের শিল্প (জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাগার থেকে শিল্প উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত) উদ্যোগ হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনশীল এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক সুফল-বিবেচনা উদ্ভূত।

(৬) সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনসহ হালকা শিল্প ও ভারী শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এ জন্য নিয়মিত-ক্রমাগত-লাগাতার "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন বিনিয়োগ" (RID & D investment) বাড়াতে হবে। কারণ ভারসাম্যকরণ বিষয়টি জটিল, যার সুনির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা নেই এবং একই সাথে সমাজ বিকাশপ্রক্রিয়া স্থির বিষয় নয়—তা নিয়তগতিশীল।

(৭) মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট শিল্পায়ন শুধু শিল্পজনিত বৈষম্য-অসমতা দারিদ্র্যই দূর করবে না—তা দূর করবে সংশ্লিষ্ট বহুমুখী বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য।

(৮) মানবকল্যণ-উদ্দিষ্ট শিল্পায়ন শিল্পপণ্য ও কৃষিপণ্যের মধ্যে মূল্যের ভারসাম্য নিশ্চিত করবে (যে ভারসাম্য কখনও ছিল না), যা সমান শ্রমের সমান মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি-অকৃষি কৃত্রিম ভেদ দূর করবে।

(৯) প্রাথমিকপর্যায়ের শিল্পায়ন হতে হবে দেশের অভ্যন্তরীণ মোট চাহিদা (domestic aggregate demand) মেটানোর লক্ষ্যে, আর যে চাহিদা হবে মূলত মানুষের বিকাশমান যৌক্তিক মৌলিক চাহিদা। এখানে মনে রাখা জরুরি যে বাংলাদেশের (এখনকার) ১৭ কোটি মানুষের (ভবিষ্যতে আরো কয়েক কোটি বাড়বে) মৌলিক চাহিদা কম নয়– 'প্রকৃতিকে না ঘাঁটিয়ে' প্রত্যেকের জন্য গুণমানসম্মত অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, বিশ্রাম, বিনোদন, অবকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যের শিল্পায়ন। এসবই যথেষ্ট বড় মাপের নিরন্তর সৃজনশীল কর্মকাণ্ড।

(১০) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় "নির্বিচার প্রবৃদ্ধি" (indiscriminate growth) বিষয়টি মুখ্য বিষয় বলে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ 'প্রবৃদ্ধি' কোনো কিছুরই কারণ (cause) নয়, তা পরিণাম (effect)। 'পরিণামের' ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুই নির্ধারিত হয় 'কারণ' দিয়ে—নীতি প্রণয়নে এ কথা মাথায় রাখতে হবে।

(১১) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় দেশজ কৃষিভিত্তিক (জমি-কৃষি, জলা-কৃষি ও জঙ্গল-কৃষি, শস্য-কৃষি সৃষ্টি, প্রাণিসম্পদ) বিষয়াদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

(১২) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ—জমি-জলা-জঙ্গলসহ তেল-গ্যাস-কয়লা, সূর্যের আলো-তাপ, বাতাস, আকাশ, মহাকাশ—সবকিছুর সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার নিয়ে (ক্ষয় নয়) ভাবতে হবে।

(১৩) শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা যাবে না, যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত ঋণাত্মক।

(১৪) শিল্পায়ন হতে হবে দেশজ, আর দেশজ শিল্প সুরক্ষার জন্য যত ধরনের সংরক্ষণবাদী-সুরক্ষাবাদী নীতি আছে, তা গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) উল্লিখিত প্রধান মৌলিক প্রস্তাবের (প্রস্তাব-১) ভিত্তিতে অন্য ১৩টি প্রস্তাব মেনে 'শিল্পায়ন নীতি' (industrialization policy) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এসবই রাষ্ট্রের মতাদর্শগত বিষয়, যা "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ" নীতি-আদর্শ না মেনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। (এখনও যেহেতু রাষ্ট্র এসব খুব মান্য করে না এবং নীতিনির্ধারকেরা এসব আমলে নেন না, সেহেতু বর্তমান অবস্থাতেই যত দূর সম্ভব—সেসব বিষয়ে আমরা এর পরে সুপারিশ প্রস্তাব করছি)।

শিল্প নীতির সংস্কার

রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০১৫-৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিল্প নীতি ঢেলে সাজিয়ে তা উপরোল্লেখিত দেশজ শিল্পায়ন নীতিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল

(১) মুক্তবাজার ও অসম বিশ্বায়নের তোড়ে জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার জন্য আমদানিমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যৌক্তিক। এ কৌশল কীভাবে আরো শক্তপোক্ত করা যায়, সে বিষয়ে আসন্ন বাজেটসহ উন্নয়ন দলিলে নির্দেশনা দরকার।

(২) কভিড-১৯ এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত সাপ্লাই চেইন চ্যালেঞ্জ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে, রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশলের সাথে শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড-ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত

(১) শিল্পায়নসহ অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎখাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও তা চলমান রাখা জরুরি। এ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণব্যবস্থা টেকসই রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম (তবে এক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যা ব্যাপক), তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং গ্যাসভিত্তিক অনেক কম। যেহেতু গ্যাসের মজুদ কম, কয়লাভিত্তিক বড় আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী হবে (তবে, পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব বিবেচনা না করে কিছু করা সমীচীন হবে না)। পরিবেশগত বিবেচনায় রিনিউয়েবল এনার্জি সবচেয়ে কাম্য। এ বিষয়ে সরকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) বাংলাদেশ বিদ্যুৎসঞ্চালন অবকাঠামো দুর্বল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়) ও দুর্ঘটনাপ্রবণ বাংলাদেশে সঞ্চালনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয়বহুল হলেও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনবে। সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনকার তুলনায় যুক্তিসংগতভাবে বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রিড লাইনের উন্নয়ন-বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার আর্থিক ও কারিগরি প্রক্ষেপণ এবং অডিট প্রচলন জরুরি। একদিকে গ্রিড বিপর্যয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং অন্যদিকে সমাজ-অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নির্ণয় অপরিহার্য। বিদ্যুৎ খাতের "কুইক রেন্টাল"-এ ইতিমধ্যে ৮২ হাজার কোটি টাকার প্রদেয় ঋণের হাল অবস্থা জনগণকে অবহিত করা যৌক্তিক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে আমরা বিদ্যুৎসঞ্চালন ও বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫২ হাজার ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি। তবে বরাদ্দসমূহ কীভাবে কাজে লাগানো হবে বাজেটে তার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৪) তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠনের হাল অবস্থা বাজেটের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

শিল্প উদ্যোক্তা, অর্থায়ন, বিনিয়োগ

(১) স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তায় রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগোলিক—আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হতে পারে, যদি শিল্পায়ন নীতি জনগণের কল্যাণে প্রণয়ন করা হয় (যেটা আমাদের **প্রধান প্রস্তাব**)।

(২) দেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের প্রধান প্রস্তাবের আলোকে সরকারের প্রতিশ্রুত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রাধিকারভিত্তিক বিবেচনায় নিতে হবে।

(৩) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি এ জন্য প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে শিল্পপার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

(৪) শিল্পপার্কে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার যৌক্তিক হবে।

(৫) দেশে শিল্প অর্থায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি বাজেট বরাদ্দ থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা জরুরি। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৬) বিনিয়োগ বোর্ডের বর্তমান কাঠামো দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে তেমন সক্ষম হচ্ছে না। বাস্তবতার নিরিখে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার জরুরি।

(৭) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে আইএমএফতাড়িত নব্য-উদারবাদী মুদ্রানীতি চালু আছে। আমাদের মতে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগবান্ধব করা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি।

৪.১৭ নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশসম্পর্কিত গভীর গবেষণার ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি সুপারিশ উত্থাপন করছি। এসব সুপারিশ একদিকে যেমন দীর্ঘমেয়াদি নীতি পরিবর্তনমূলক ও সংস্কারমূলক, অন্যদিকে আশু-স্বল্পমেয়াদি আসন্ন বাজেটসহ নীতিনির্ধারণী দলিলে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য। আমাদের বেশকিছু প্রস্তাব এক বাজেটে বাস্তবায়ন হওয়ার নয়—কিন্তু আমরা মনে করি, কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়টি আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে যে বহু ধরনের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং করবে, সেসব বিবেচনায় রাখতে হবে—

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ—মৌলভাবনা ও করণীয়[৪]

(১) প্রধান মৌলিক সুপারিশ: নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশসম্পর্কিত মৌলনীতি হিসেবে স্বীকার করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক মানদণ্ডে যুক্তিযুক্ত হলেও প্রধান যুক্তি হলো—প্রাকৃতিক (natural reasoning), এবং একই সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, জীবনে শিশুর বিকাশের সুযোগ থাকে মাত্র একবার—শিশুর বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভে, শিশুর বিকাশ নির্ভর করে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর। মায়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধির কোনোই বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(২) রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে নারীর বহুমুখী ক্ষমতায়ন বিষয়টি সার্বজনীন; তবে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত নারী যেহেতু সবচেয়ে ভঙ্গুর ও অরক্ষিত, সেহেতু এই গ্রুপে নারীর ক্ষমতায়ন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য ক্ষেত্র।

(৩) রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ত মানসিকতার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর কার্যকর অধিকারহীনতা।

(৪) নারীর সকল গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নির্মোহ হিসেব করে স্বীকার করতে হবে যে দেশজ উৎপাদনে নারীর অবদান ২০-২৫ শতাংশ নয়, তা কমপক্ষে ৪৮-৫০ শতাংশ। এ বিষয়ে হিসেবপত্তরের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে দায়িত্ব দেওয়া সমীচীন (কারণ তারাই আদমশুমারিসহ খানার আয়-ব্যয় জরিপকাজ করে থাকে)।

(৫) কভিড-১৯-এর মহামন্দা-মহাবিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেশের দরিদ্র-চরম দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত খানার নারী—এ কথা স্বীকার করে সব আর্থসামাজিক উন্নয়ন দলিলে (আসন্ন বাজেটসহ) সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতির পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৬) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোরী গর্ভধারণের হার কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এ দুই খাতে পৃথক বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(৭) উল্লিখিত ৬টি মৌলভাবনা ও উত্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র লক্ষ্যে প্রণয়ন করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশের জাতীয় নীতি। এবং সময়নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

[৪] এসব সুপারিশ-করণীয়র উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৪০৬-৪১২।

নারীর ক্ষমতায়ন-উন্নয়ন কর্মসূচি

(১) জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখপূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সবার আগে নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জাতীয় বাজেটেসহ সব উন্নয়ন দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই প্রয়াসে দরিদ্র নারী ও শিশুর অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিসহ জীবনধারণের সব মৌলিক চাহিদার সরবরাহ নিশ্চিত হবে। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট-সহজবোধ্য বড় মাপের বরাদ্দসহ সময়-নির্দিষ্ট পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

(২) নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা সবিস্তার উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীদের শোভন কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি-ভাতা-ছুটি-অবসর-বিনোদন, কর্মজীবী নারীর আবাসন, রেশন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, নারীর জন্য পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রয়, বিধবা ভাতা, সন্তানদের শিক্ষা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, দুঃস্থ নারী ভাতা, স্কুলশিক্ষকদের ৬০ শতাংশ নারী, নারীর নিরাপত্তা, গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধা, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: নারীশ্রম, মজুরি বৈষম্য দূর, শ্রমের স্বীকৃতি, জীবনমান উন্নয়ন, আয়-রোজগারের ওপর নিয়ন্ত্রণ

(১) মজুরি বৈষম্য দূর করে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, চুক্তিপত্র, পদোন্নতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের মনিটরিং পদ্ধতি চালু, পছন্দমতো পেশা নির্বাচনের অধিকার নিশ্চিত করা, অর্জিত আয় এবং সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারীর সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ—এসবই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করতে জরুরি।

(২) কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কৃষক কার্ড' দিতে হবে।

(৩) চা-বাগানের শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ এবং চায়ের পাতা সংগ্রহকারীদের ১০০ শতাংশই নারী। এসব শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ। এদের জীবনমান উন্নত করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে (এদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে বাংলাদেশ চা বোর্ডকে সংবেদনশীল করতে হবে)।

(৪) শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(৫) নারীর সবধরনের শ্রমের স্বীকৃতি, মজুরি বৈষম্য দূর, ন্যূনতম মজুরিসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন জরুরি।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ নীতির পরিবর্তন

(১) সকল শ্রেণির নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর উৎসাহিত করার জন্য ঋণ নীতির পরিবর্তন করতে হবে। একই সাথে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার" এবং ২৭ (৪) অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে বিনাসুদে দরিদ্র-চরম দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র স্কেলে কৃষকদের জন্য বিনাসুদে ঋণ কর্মসূচি বেশ সফলতা দেখিয়েছে, যেমন আইলা-সিডর-মঙ্গা-চর-হাওর-বাঁওর এলাকায় ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য জনতা ব্যাংকের সুদবিহীন ঋণ কর্মসূচি ২০১০-১৪। বিনাসুদের এই ঋণ কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সারা দেশে চালু করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

(২) ক্ষুদ্র ঋণের ফাঁদ (trap of micro credit) থেকে দরিদ্র নারীদের মুক্তি দিতে সরকারিভাবে ক্ষুদ্র অনুদানের (micro-grant) মাধ্যমে প্রশিক্ষণসহ স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ

(১) গতানুগতিকতার বিপরীতে আসন্ন বাজেটসহ সামনের কয়েক বছরের বাজেটে নারীর জন্য বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বরাদ্দ কয়েক গুণ বাড়াতে হবে।

(২) বাজেটে গ্রামের নারীদের জন্য কোনো ভিন্ন বরাদ্দ থাকে না। আমাদের হিসাবে চলতি বাজেটে বিভিন্ন প্রকল্পে (মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের ১৫টি প্রকল্পে আংশিক, এডিপিতে আরো ৬টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দে) গ্রামীণ নারীদের জন্য মোট বরাদ্দ হবে আনুমানিক ৩৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। আমরা মনে করি, গ্রামের নারীদের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা।

নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচির বরাদ্দ স্পষ্টীকরণ

(১) জেন্ডার বাজেট বিষয়টি জটিল ও এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট গোঁজামিলে। জেন্ডার বাজেটকে বিচ্ছিন্ন-অসংলগ্ন-জাহেরি দলিল না করে সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছ নারীর ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন জরুরি।

(২) বাজেটে নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে: অশনাক্ত নারী যক্ষ্মা রোগীর শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বরাদ্দ (গত বাজেটের তুলনায়) দুইগুণ বাড়াতে হবে; ১০০ শতাংশ নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ চারগুণ বাড়াতে হবে; ক্রীড়াখাতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ চারগুণ বাড়াতে হবে (আসন্ন বাজেটে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি ৫ হাজার কোটি টাকা); মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ (যে খাতে আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই) দিতে হবে; নারীর প্রতি সহিংসতা রোধসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩০ গুণ বাড়াতে হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় অসহনীয়। এ দেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার অনেক হলেও এসবের প্রকৃত মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

(১) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ-উদ্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো খাতে দেখানো হয় না। এ বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ দেখানোসহ মনিটরিং, ফলোআপ ও সমন্বয় কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে।

(২) আমাদের প্রস্তাব এবারের বাজেটে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা করা হোক।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন

(১) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এটি বাস্তবায়ন জরুরি।

(২) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকারে নারী

(১) স্থানীয় সরকারপর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

(২) স্থানীয় সরকারের নারী জনপ্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ দেশ-বিদেশে স্থানীয় সরকারের সফল ও শিক্ষণীয় কর্মসূচি-প্রকল্প দেখা ও বোঝার জন্য শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আদিবাসী নারী

(১) আদিবাসী নারীদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দসহ তাদের সাথে যৌথভাবে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

জেন্ডার সমতাবিষয়ক গবেষণা

(১) নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকারসম্পর্কিত বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা, পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেখান থেকে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। এ জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় স্টার্ট-আপ বরাদ্দ রাখতে হবে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারীর জন্য বরাদ্দ

(১) মানসম্মত প্রযুক্তিসহায়ক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে এবং জাতীয় দক্ষতা নীতি-২০১১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ভিন্ন করা প্রয়োজন।

(৩) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ খাত এবং সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দ দরকার।

জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তিবান্ধব নীতি বাস্তবায়ন

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অটোমেশন অর্থাৎ জনশক্তির স্থলে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশি জনশক্তি প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে প্রতিস্থাপিত হবে, যা কর্মনিয়োজন কাঠামোতে একুশ শতকের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

(১) জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তিবান্ধব নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম তরুণ-তরণীকে প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী করতে হবে। এ লক্ষ্যে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

(২) পেশাগত ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

জেন্ডার বাজেটের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

নারী উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব যাচাইয়ের জন্য ১৪টি মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়। এসব মানদণ্ডে আছে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, আইন ও ন্যায়বিচার ইত্যাদি। প্রতিটি প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি নারী উন্নয়নে কত অংশ ব্যয় হবে তা এ মানদণ্ড ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য ১৪টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নে মোট প্রকল্প ব্যয়ের কত শতাংশ ব্যবহার হবে তা নির্ধারণের বিধান আছে। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার ৪৭.২ অনুচ্ছেদে বলা আছে—"জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটপ্রক্রিয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে"। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জানার বিষয় প্রতিটি প্রকল্প শেষে মানদণ্ড ব্যবহার করে নিরীক্ষণ করা হয় কি-না এবং প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা যথাযথ ব্যবহৃত হয় কি-না। কারণ আমরা প্রকল্পের বরাদ্দ দেখতে পাই, কিন্তু বছরওয়ারি প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের কতটুকু এবং কী উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে প্রতিবেদনে তা উল্লেখ থাকে না। এ বিষয়ে সরকারের নজর দেওয়া কাম্য।

নারী ও শিশুর বিকাশে বাজেট বরাদ্দ

(১) যেসব প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীন, খামারি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারী কভিড-১৯ সংকটের শিকার হয়ে দুরবস্থায় রয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

(২) নারী কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন ও স্বীকৃতি এবং তাদের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

(৩) কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে;

(৪) গ্রামীণ নারী যাতে খামার এবং খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য দ্রুত এবং ঝামেলাহীনভাবে ঋণ পেতে পারেন, তার জন্য পৃথক বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(৫) নারী-কৃষক ও নারী কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিপণনের জন্য জয়িতা নামের বিপণনকেন্দ্রের মতো প্রকল্প বেশি করে নিতে হবে;

(৬) নারী—সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক গ্রামবাংলায় আবহমানকাল থেকে শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্য-অবদমনের শিকার। নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসে এবং তাদের ক্ষমতায়নে

বাজেটে গ্রামীণ নারীর মাথাপিছু গড় বরাদ্দ জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দের **চলমান গড়ের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি নির্ধারণ যৌক্তিক;**

(৭) চলতি অর্থবছরে 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দের জাতীয় গড় ১৪,২৬৪ টাকা। গ্রামীণ নারীর জন্য **এই গড় বরাদ্দ দ্বিগুণ বেশি হলে** পরিমাণটা হবে ২৮,৫২৯ টাকা। সুতরাং, **৫ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামীণ নারীর জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ২০৫ কোটি টাকা;**

(৮) আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে যেসব বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, তার বেশিরভাগই পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য–বরাদ্দ শুধু ভিন্ন। তবে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ ত্বরান্বয়নে এ বছর আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রস্তাব করছি—

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা, যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে ২ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা,

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা, যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে ৩০ হাজার কোটি টাকাসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ হাজার কোটি টাকা;

(গ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"শিশুবিকাশ বিভাগ"**, যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে ৩ লক্ষ কোটি টাকাসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ৬০ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৫)।

নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

(১) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক, সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নারীবান্ধব কূটনীতি ও রাজনীতি শক্তিশালী করা।

(২) কভিড-১৯ মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণে পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরা অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে সংগঠিত হচ্ছেন। এ ধরনের সংগঠিত প্রয়াসে সক্রিয় কর্মী ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে যোগ দিয়ে পারস্পরিক সংহতি প্রকাশ করলে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার-শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৪.১৮ প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি

(১) দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা এবং প্রতিবন্ধিতার হার (prevalence of disability) প্রকৃত হারের তুলনায় (কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয়ের আদমশুমারিতে) কমপক্ষে ৮-১০ গুণ কম দেখানো হচ্ছে—এ জন্য প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা

করা উচিত। প্রতিবন্ধী মানুষ এ দেশের নাগরিক—প্রজা নন—এবং তাদের জীবনসমৃদ্ধি উন্নয়নে রাষ্ট্র সংবিধানিকভাবেই দায়বদ্ধ।

(২) সকল সরকারি হিসেবপত্তরে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দেশে প্রতিবন্ধীর হার ১%-২% নয়, কমপক্ষে ১০.৬% ধরে নিতে হবে (ততদিন, যতদিন প্রতিবন্ধী মানুষ নিয়ে সঠিক আদমশুমারি না হচ্ছে)।

(৩) দেশে মোট প্রতিবন্ধী মানুষ, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থসামাজিক শ্রেণিগত অবস্থা এবং গ্রাম-শহর (ঠিকানাভিত্তিক) অনুযায়ী অবস্থান নির্মোহ জরিপ করে বের করতে হবে। এবং জরিপকাজ অব্যাহত রাখতে হবে যেন নিয়মিত প্রতিবন্ধীসংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। দায়িত্বটা সংবিধান অনুযায়ী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকেই পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ হবে অপরাধতুল্য। একই সাথে প্রস্তাব করছি যে মানুষসংশ্লিষ্ট শুমারি (census) এবং/ অথবা জরিপকাজে সরকার যেন বিদেশি কোনো পরামর্শক নিযুক্ত না করেন এবং দেশীয় পরামর্শক যিনি/ যারা নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ সত্য উদ্‌ঘাটনে অপারগ অথবা যিনি/ যারা সরকারের ইচ্ছা/ অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত, হয়েছে তাদের কোনোভাবেই নিযুক্ত না করা (সরকারই ভালো জানেন যে তারা এসব কীভাবে করবেন)।

(৪) এ দেশে প্রতিবন্ধী মানুষকে সাংবিধানিক নির্দেশের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনায় আনতে হলে তাদের জন্য সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ কত দেওয়া উচিত? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। হিসাবটি জটিল—তবে ইচ্ছে থাকলে হিসাব কষা সম্ভব। এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে প্রতিবন্ধীর ধরন অনুয়ায়ী সহায়ক উপকরণ ব্যয়, প্রতিবন্ধীর ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ব্যয়, প্রতিবন্ধীর ধরন অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহায়ক ব্যয়, প্রতিবন্ধিতা রোধসংক্রান্ত (অর্থাৎ এখন থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষকে প্রতিবন্ধী হওয়া থেকে রক্ষাসংশ্লিষ্ট) ব্যয়, এবং অবশ্যই ১ কোটি ২৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী, যারা দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত তাদের জন্য খাদ্য অনুদানসংশ্লিষ্ট ব্যয় (শেষোক্ত ব্যয়টি কভিড-১৯-এর মহামন্দার মহামারির এই বাজারে করতেই হবে এবং তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যেতে হবে)।

প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণ হিসেবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ধরনভেদে প্রয়োজন হুইলচেয়ার, ক্রাচ, কৃত্রিম পা; দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন সাদাছড়ি ও চশমা; এবং বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন শ্রবণযন্ত্র। বিভিন্ন তথ্য-উৎস এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এসব সহায়ক-উপকরণের বর্তমান মোট চাহিদা হবে এ রকম: ১ কোটি ৮০ লক্ষ প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের সহায়ক-উপকরণ প্রয়োজন, যার মধ্যে আছে ৯ লক্ষ হুইল চেয়ার, ৯ লক্ষ ক্রাচ, ৪ লক্ষ কৃত্রিম পা, ৯ লক্ষ সাদাছড়ি, ১০ লক্ষ চশমা এবং ৯ লক্ষ শ্রবণযন্ত্র। বর্তমান বাজারমূল্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের উল্লিখিত সহায়ক উপকরণের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন মোট কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা। প্রতিবন্ধী মানুষের সহায়ক

উপকরণের এ হিসাবটি অসম্পূর্ণ। কারণ, এর মধ্যে নেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণাদি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পুস্তক, বহুমুখী প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক উপকরণাদি। এই সবকিছুর পাশাপাশি কভিড-১৯-এর সম্ভাব্য অভিঘাত বিবেচনা করলে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণবাবদ নিম্নতম প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত উল্লিখিত হিসেবের কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আমরা ২ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

৪.১৯ প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা

(১) আমাদের পরিবেশ ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে এখানেই যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রকৃতিকে কীভাবে দেখব? আমরা কি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল-আস্থাবানভিত্তিক উন্নয়ন-প্রগতিপ্রক্রিয়া গ্রহণ করব, না-কি পুঁজিবাদী শিল্পায়ন গত ২০০-২৫০ বছর যা করেছে—সেটাই অনুসরণ করব? আমরা কি বায়ু-পানি-পরিবেশ-প্রতিবেশ দূষণকারী শিল্পায়নের পথে পা বাড়িয়ে "শ্বসনতন্ত্রের রোগের মহামারি"কে (respiratory pandemic) আমন্ত্রণ জানাব? আমরা যদি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল-আস্থাশীল উন্নয়ন-প্রগতিপ্রক্রিয়া গ্রহণ করি, তাহলে একদিকে যেমন প্রকৃতির ক্ষতিতে আমাদের অবদান কমবে আর অন্যদিকে কিন্তু দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাও কমবে। কারণ, অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয় হলো মুনাফা, আরো মুনাফা, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে মুনাফার সর্বোচ্চকরণ।

(২) মুক্তবাজার-উন্নয়ন মতাদর্শের আওতায় নব্য-উদারবাদী পরামর্শদাতারা (প্রধানত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) মনে করে (যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-বিভ্রান্তিকর ধারণা) যে—'অর্থনীতি' (economy) এবং 'ইকোলজি' অথবা 'জীবমণ্ডল-প্রাণিমণ্ডল (biosphere) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, বিচ্ছিন্ন বিষয়; তারা এও মনে করে যে— 'প্রযুক্তি' (technology) সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দেবে। এ-এক ফাঁদ। এ ফাঁদে পা দিলে মহাবিপদ অবশ্যম্ভাবী।

(৩) "প্রযুক্তি" সব রোগের ওষুধ— এ কথা শতভাগ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা– মানবসমাজ হলাম প্রকৃতিরই একটি সাবসেট বা অধীন অঙ্গমাত্র (উল্টোটা নয়)। মানুষের সাথে প্রকৃতির (পরিবেশ, প্রতিবেশ, জলবায়ু যা-ই বলা হোক না কেন) সম্পর্কটা একটা বৃহত্তর সিস্টেমের (= প্রকৃতি) সাথে একটা ক্ষুদ্র সাব-সিস্টেমের (মানবসমাজ) সম্পর্ক, যেখানে বৃহত্তর সিস্টেমকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে ইলাস্টিকের মতো কিছু ভাবা ঠিক নয় যে তাকে টেনে বাড়ানো যাবে—(প্রকৃতিকে বাড়ানো যাবে না) আর সাব-সিস্টেম হিসেবে মানবসমাজ বাড়ছে তো বাড়ছেই।

(৪) জলবায়ু পরিবর্তন হোক অথবা পরিবেশ বিপর্যয় হোক—সবই আসলে 'বর্জ্যের' সমস্যা (problem of wastes), যা আমরা প্রতিনিয়তই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে সৃষ্টি করছি। সুতরাং পরিবেশসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন-প্রগতির যেকোনো বিষয়ের ভাবনা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ

সম্মান-শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই হতে হবে। নব্য-উদরবাদী মুক্তবাজারীয় মতবাদীদের কথা শুনলে বিপদ হবে অনিবার্য। এসবের অন্যথা হবে মহাবিপর্যয়কর।

(৫) দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োজন আছে কি-না ভেবে দেখা দরকার।

(৬) সচেতনভাবে আমাদের এমন কোনো কিছুই করা ঠিক হবে না, যা প্রকৃতির ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব বিবেচনার নিরিখেই বিনির্মিত আমাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাব (যা প্রধানত দিকনির্দেশনামূলক, যেসব প্রস্তাবের প্রতিফলন আমরা আশা করব এ দেশের আসন্ন বাজেটসহ সকল উন্নয়ন দলিলে):

নদ-নদী দখল ও দূষণ প্রতিকার

(১) নদীর নাব্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, নৌপথে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী ও নিরাপদ।

(২) বিগত চার অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার পায়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে 'জাতীয় নদী কমিশন' গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিত। পরিবেশবান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশবিরোধী অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

(৩) নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করতে সরকারের 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের' 'শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাজেটে সমন্বিত উদ্যোগসংশ্লিষ্ট কর্মকৌশল থাকতে হবে।

পরিবেশদূষণ-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(১) পরিবেশদূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে "যে যতটুকু পরিবেশদূষণ করে সে ততটুকু দূষণ রোধ কর প্রদানে বাধ্য থাকবে"—নীতিটি (polluters pay principle) বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ নীতি একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশদূষণ কমাবে এবং কমাবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যহানি। 'সবুজ উন্নয়ন'-এর ক্ষেত্রে এটা হতে পারে অন্যতম বাহন। তবে পরিবেশদূষণ রোধের এই নীতি স্বল্প মেয়াদে গ্রহণযোগ্য হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদে নয়। কারণ, পরিবেশদূষণের অর্থনৈতিক ব্যয়-লাভ (cost-benefit) হিসাব 'নৈতিক দুর্নীতি' (hazard/ moral hazard/ corruption) বাড়ায়। কারণ, ওই হিসাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পরিবেশগত ব্যয়-লাভ আদৌ বিবেচনা করা হয় না। এসব বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্র স্পষ্ট দেখাবে যে দূষণকারীর ওপর দূষণমাত্রা অনুযায়ী দূষণ রোধ কর আরোপ আসলে "দূষণকেই জায়েজ করে"।

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে (waste management) বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে তরল ও কঠিন/ শক্ত বর্জ্য (liquid and solid waste)—উভয় বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। এসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেটে এই কথা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে যে

বর্জ্য যেন 'Regenerated' হয়; অর্থাৎ বর্জ্য যেন বর্জ্য থেকে স্বাভাবিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অংশ হয়। বিষয়টি আধুনিক প্রযুক্তিগত। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি ঘটবে, পরিবেশ রক্ষা পাবে এবং একই সাথে বিকশিত হবে 'সবুজ অর্থনীতি'।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

(১) সরকারের গৃহীত শতবর্ষমেয়াদি 'ব-দ্বীপ-পরিকল্পনা'—ধারণাগতভাবে সুদূরচিন্তাপ্রসারী। 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা'কে সমগ্রক প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেখা দরকার। প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রেখে 'ব-দ্বীপ-পরিকল্পনা'র অন্তঃস্থ মৌল উপাদানসমূহ প্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা দরকার।

(২) পূর্ণাঙ্গ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বিনির্মাণে কারিগরি-প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। তবে তার চেয়ে বেশি জোর দিতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকৃতির এবং মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব-অভিঘাতের।

(৩) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে যথাসম্ভব বিস্তারিত অবহিত করা জরুরি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়ন

(১) বিগত চারটি বাজেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। গত বছর ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ফসলের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ জন্য বাজেটে থোক বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আমরা এ সমস্ত কর্মসূচির অগ্রগতি জানানোসহ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করছি।

(২) দক্ষিণাঞ্চলসহ সারা দেশে জলাবদ্ধতা যে প্রকট রূপ নিয়েছে, তার কারণগুলো খতিয়ে দেখে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) নগর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে মৌলিক ভাবনা জরুরি।

(৪) হাওর এলাকায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রকৃতিবান্ধব হওয়া জরুরি। হাওরের দায়দায়িত্ব হাওরবাসীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা দরকার।

(৫) এ বছর আমাদের প্রস্তাব হলো (কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) **"হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা এবং এ জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া (আগামী ৫ বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দসহ; দেখুন, সারণি ৫)।

সাইক্লোন ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন নতুন ভাবনা

সাইক্লোন আমাদের জীবনের অংশ। ঠিক এ কারণেই সাইক্লোনের পূর্বাভাস থেকে শুরু করে সমগ্র ব্যবস্থাপনা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত। এ নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(১) মান্ধাতার আমলের "cyclone signal system"-এর পরিবর্তে আধুনিক সিস্টেমে আসতে হবে (যা হবে মানুষ রক্ষার লক্ষ্যে; বন্দর হবে যার অংশ, উল্টোটা নয়)।
(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আমাদের 'relief approach' পাল্টে "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অ্যাপ্রোচে" যেতে হবে।
(৩) বাঁধের মালিকানা হতে হবে স্থানীয় জনগণের।
(৪) আবহাওয়া বিভাগকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার কথা ভাবতে হবে।
(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে করতে হবে (বিদেশি ঋণ/ অনুদান দিয়ে নয়)।

৪.২০ গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ

গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করতে সরকারি বরাদ্দ যথাসম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়াতে হবে। তবে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কোনোভাবেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতে পারবে না, তা হতে হবে প্রকৃতির বিধি-বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গলজনক। গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সংশ্লিষ্ট আমাদের ধারণা ও সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ব্যয় নয় বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে (not expenditure but investment)।
(২) কোনো গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিনিয়োগ করা যাবে না, যা শেষপর্যন্ত মানুষে-মানুষে বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে অথবা যা হতে পারে সমাজবিধ্বংসী।
(৩) গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চায় বিদেশি বিনিয়োগ অথবা ধনী দেশের বিনিয়োগ অথবা কর্পোরেট বিনিয়োগ উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই, অথবা বলা যেতে পারে নির্বিচার উৎসাহিত করা ক্ষতিকর। কারণ, ওরা বিনিয়োগ করে মুনাফার স্বার্থ দেখে। কিন্তু মুনাফা ও জনকল্যাণ সাংঘর্ষিক। এ ধরনের বিনিয়োগ এজেন্ডা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।
(৪) গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে জনগণের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন।
(৫) গবেষণা ও উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development, RID & D) নামক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। RID & D মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

মেধার স্বীকৃতি ও মেধাস্বত্ব অধিকার

(১) বিদেশে অবস্থানরত/ কর্মরত কৃতি গবেষকেরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন অথবা বিদেশে বসেই দেশের মানুষের কল্যাণে

গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা করতে পারেন এবং উৎসাহিত বোধ করেন, সে লক্ষ্যে প্রণোদনার (বস্তুগত ও নৈতিক উভয়ই) বিষয়টি যথামাত্রা গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(২) যদিও আজকের ধনী দেশের ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় মেধাস্বত্ব বলে কিছু ছিল না, তথাপি বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Right) চলমান বিষয়। অন্যেরা মেধাস্বত্ব অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করছে; কিন্তু বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে পেছনে থাকার তেমন কোনো যুক্তি নেই—যখন দাবি করার মতো বাংলাদেশের অনেক কিছুই আছে। যেমন আমাদের লোকজ শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টির অনেক কিছুই আছে (লালনগীতি-হাছন রাজাসহ অনেকে) যার 'কপিরাইট' নিশ্চিত করে আমরা একদিকে উপার্জন করতে সক্ষম, অন্যদিকে আমাদের কৃষ্টিকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারি। সেক্ষেত্রে দেশজ-সৃজনশীল প্রতিভার মানুষেরা পাবেন তাদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি এবং একই সাথে আর্থিক সচ্ছলতা; অন্যদিকে দেশ পাবে উজ্জ্বল এক ভাবমূর্তি। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের দেশে পরিণত হতে সক্ষম। সাম্প্রতিককালে কয়েকজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত গবেষক তাদের বিশ্বস্বীকৃত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যেমন অধ্যাপক ড. আবুল হুসসামের খাওয়ার পানি আর্সেনিক মুক্ত করার প্রযুক্তি 'সনো ফিল্টার' (যে উদ্ভাবনের জন্য তিনি ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যাকাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মিলিয়ন ডলারের গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন) এবং পুরস্কার হিসেবে পাওয়া অর্থের অধিকাংশই তিনি এ দেশে দরিদ্র মানুষের ঘরে সনো ফিল্টার পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুদান দিয়েছেন; (অকালপ্রয়াত) অধ্যাপক ড. মাকসুদুল আলম-এর পাটের জিন রহস্য উদ্‌ঘাটন মৌলিক আবিষ্কার। বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার এবং সুরক্ষার এসব সুবিধা নেওয়ার বিষয়ে ভাবতে হবে। বিষয়টি যেমন সরকারি সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে স্বীকৃত হওয়া জরুরি, তেমনি এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

(৩) সরকার ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ উদ্ভাবন নীতি' প্রণয়ন করেছে। আসন্ন বাজেটে 'বাংলাদেশ মেধাস্বত্ব কমিশন' গঠন করার প্রস্তাব থাকলে ভালো হয়। বিশ্বায়ন ও মেধাস্বত্ব নিয়ে যেহেতু ভাবনা জরুরি, সেহেতু বলা প্রয়োজন যে বিশ্বে এখন চলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব—তথ্য ও প্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী উন্নয়নধারা। এ বিপ্লবে সক্রিয় অংশীদারি নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশকে 'উদ্ভাবন নীতি-কৌশল' (Innovation Policy and Strategy) বাস্তবায়নে রোডম্যাপ তৈরি করে দ্রুততার সাথে এগুতে হবে।

৪.২১ দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা

শোভন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে বড় পর্দায় এবং ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে দেশের মানুষ—জনগণ এবং হতে হবে তা সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রগতির শর্তাধীন।

(১) দেশরক্ষার ধারণা বিনির্মিত-পুনর্নির্মিত হতে হবে। আর সে নবনির্মিত ধারণাটি হতে হবে "জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক" ধারণার ভিত্তিতে "জনগণের দ্বারা, জনগণ কর্তৃক, জনগণের জন্য" জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র কর্তৃক।

(২) দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষার প্রচলিত ধারণাটি গণ-ভীতিকর, বিধায় তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ সবকিছুই শেষ বিচারে প্রগতিবিরুদ্ধ। সুতরাং দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ-ভীতিকর ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে গণ-আস্থাশীল গণ-শ্রদ্ধাশীল ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

(৩) দেশরক্ষা করবে জনগণ। আর জনগণের সম্মতি নিয়ে প্রজাতন্ত্রের চালক রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে দেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ কোনটা—দেশরক্ষা-শক্তি বাড়ানোর জন্য ট্যাঙ্ক, না-কি মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বাড়ানোর লক্ষ্যে মায়ের পুষ্টি বাড়ানো এবং শিশুমৃত্যু কমানো? একটি মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয়, না-কি সেই টাকায় দেশ থেকে কুষ্ঠরোগ-যক্ষ্মারোগ চিরতরে নির্মূল করা? বিনিয়োগপছন্দ নির্ধারণে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ (সরকার) জনগণের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবে, কোনটা ভালো—অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, না-কি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংককে আরো প্রসারিত করে জনগণের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা?

(৪) দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ভিত মজবুত করতে শিশুকাল থেকে উচ্চমান নীতি-নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের দিতে হবে অনেক খেলনা; তবে একটিও যুদ্ধ-খেলনা নয়। শিশুকাল থেকেই অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে—একটি খেলাও যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা না-হয়। অসুস্থ প্রতিযোগিতার সকল পথ রুদ্ধ করতে হবে—শিশুকাল থেকে শেষকাল পর্যন্ত।

(৫) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে আত্মরক্ষা-দেশরক্ষার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেম চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) মানুষের মধ্যে জীবনের সর্বস্তরে আলোকিতকরণ-উদ্দিষ্ট শিক্ষা (education for enlightenment), মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা বোধ ও আশ্রয় বোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নিরন্তর প্রচেষ্টা—এসবই হতে পারে দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। এ ধারণায় বিশ্বাস এবং তা বাস্তবজীবনে অনুশীলন-প্রয়োগই হতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্যতম ভিত্তি।

(৭) দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষা মানে যুদ্ধ নয়—এ কথা দেশের সব মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৮) মানুষের আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ তার সুসংস্কৃতির পরিচায়ক। এ ধারণা মাথায় রেখে প্রচলিত প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণগত দিক থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

৪.২২ সরকার টাকা পাবে কোথায়?

সম্পদ আহরণে মৌল দিগ্‌দর্শন

(১) শোভন সমাজ-অর্থনীতি ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে রাষ্ট্র-সরকারকে সেসব উৎসে হাত দিতে হবে, যেসব উৎসে অতীতে কখনও হাত দেওয়া হয়নি অথবা প্রয়োজনমতো হাত দেওয়া হয়নি। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে এসব উৎসের অন্যতম হলো সম্পদ কর (Wealth tax), অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (Tax on excess profit), অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (Laundered money recovery), কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (Black money recovery), বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, বিভিন্ন কমিশন ও বোর্ড কর্তৃক আহরণ বৃদ্ধি, এবং সরকারের সম্পদ আহরণের প্রচলিত বিভিন্ন উৎসে আদায়ের যৌক্তিক বৃদ্ধি (যেমন আয়কর, মুনাফার ওপর কর, মূলধনের ওপর কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ থেকে প্রাপ্তি প্রভৃতি)। এসবই হবে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব-সংঘাত উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা দূর করার প্রাথমিক শর্ত। এ শর্ত পূরণ না করে প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকেন্দ্রিক মানবিক উন্নয়নপ্রক্রিয়াটা শুরু করাও সম্ভব নয়।

(২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে এখন পরোক্ষ করের ওপর তুলনামূলক বেশি জোর দেওয়া হয়, যা মানুষে মানুষে বৈষম্য বাড়ায়। এখন থেকে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের ওপর বেশি জোর দিতে হবে।

(৩) মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি পর্যন্ত সবাইকে (অর্থাৎ দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত) সামনের কয়েক বছর আয়করবেষ্টনীর (income tax net) বাইরে রাখতে হবে।

(৪) সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার, কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের সাথে দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে (যেমন জমি, জলা, কয়লা, গ্যাস, তেল, খনিজসম্পদ) সেসবের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' (National Wealth Fund), যে তহবিল বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের' বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে।

(৫) ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রভুদের প্রায় ২০০ বছর শোষণ, পাকিস্তান উপনিবেশ প্রভুদের ২৪ বছর শোষণ এবং বিশ্ববাজারে মুক্তবাজার বিশ্বায়নের অন্যায্যতার ফলে বিগত ৪০-৪৫ বছরে আমরা যেভাবে ঠকেছি সেসবের হিসেবপত্তর করে ন্যায্য হিস্যা জায়গামতো চাইতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

(৬) বিশ্বব্যাপী আর্থিক লেনদেনের ওপর কর (টবিন ট্যাক্স) ও আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের ওপর করের (টেরা ট্যাক্স) সমন্বয়ে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' ('Global Wealth Fund') গঠন এবং তা কার্যকর করার পথ-পদ্ধতি নিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

কর রাজস্ব: আয়কর

(১) ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে কর-প্রশাসনের সংস্কারসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশের কর-শুল্ক আদায়কারী প্রশাসন-প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিকভাবেই শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, এসব প্রতিষ্ঠান অশুভ স্বার্থসংশ্লিষ্ট রেন্টসিকিং গোষ্ঠীর ভিত্তি খুবই শক্ত, জটিল, গভীর, সুদূরবিস্তৃত। কোনো দুর্বল সরকারের পক্ষে কর-শুল্ক প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানে জনস্বার্থমুখী সংস্কার প্রায় অসম্ভব।

(২) বর্তমান পদ্ধতিতে 'কস্ট প্রাইস'-এর ভিত্তিতে সম্পত্তির যে কর নির্ধারণ করা হয়, তা নিতান্তই কম। প্রতি তিন বছর পরপর সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর কর ধার্য করা উচিত। সঠিকভাবে পুনর্মূল্যায়িত সম্পত্তির ওপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

(৩) কভিড-১৯-এর লকডাউনে দরিদ্রদের তো বটেই নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত এমনকি মধ্য-মধ্যবিত্তদের ব্যাপকাংশ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে নামতে বাধ্য হয়েছে। এখনও নামছে। এরই মধ্যে ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দামামা—যার প্রভাব এখন আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ পর্যন্ত টের পাচ্ছেন। অবস্থা যা তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকের এসব মানুষ সম্পদ খুইয়েছেন, কাজ হারিয়েছেন, নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন, মানসিক-মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপন্ন-অবসাদগ্রস্ত। এসব মানুষ হলেন ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট ১৩ কোটি ৯ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ৭৭%)। আমরা মনে করি, আগামী অন্তত তিন বছর এসব মানুষকে আয়কর মুক্ত রাখা প্রয়োজন (তিন বছর পরে অবস্থা বুঝে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে)। সেক্ষেত্রে আয়কর প্রযোজ্য হবে শুধু ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের জন্য, যাদের সংখ্যা হবে ৯৬ লক্ষ খানায় ৩ কোটি ৯১ লক্ষ মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ২৩%), যাদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সম্ভাব্য সংখ্যা হবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ। এই ১ কোটি ১৫ লক্ষ সম্ভাব্য করদাতার মধ্যে ধনী শ্রেণিভুক্ত হবেন আনুমানিক ৫০ লক্ষ (৪৩.৫%), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হবেন ৬৯ লক্ষ (৫৬.৫%)। এদের মধ্যেই আছেন উচ্চহার করদাতা, বৃহদাঙ্ক করদাতা, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট করদাতা।

(৪) দেশে সম্ভবত ১০০ জন ব্যক্তি (অথবা তার চেয়ে কম) বছরে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর (personal income tax) প্রদান করেন। আমাদের হিসাবে দেশে মোট অতিধনী খানার সদস্যসংখ্যা আনুমানিক ৮৫ লক্ষ (খানার সদস্যসহ, গড় খানার আকার ৪.০৬ জন) আর তাদের খানার সংখ্যা ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার। এসব অতিধনী খানার মধ্যে ২০% (প্রতি ৫টি অতিধনী খানার ১টি) খানা আছে, যেখানে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যার বছরে ব্যক্তিগত আয়কর হওয়ার কথা কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তার বেশি। সে হিসাবে দেশের অতিধনী শ্রেণিভুক্ত ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার খানার মধ্যে (২০২০ সালের হিসাবে) কমপক্ষে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার খানা পাওয়া যাবে, যে খানাতে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি আছেন যার বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা আয়কর

দেওয়ার কথা। এর অর্থ দেশে অতিধনী খানা থেকেই বছরে আনুমানিক ৪ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি (ব্যক্তিগত) টাকা আয়কর আসার কথা (এখন আসে বড়জোর ২০০ কোটি টাকা)। এই অর্থ আহরণ প্রয়োজন এবং সম্ভব। এ অর্থ ব্যয় হতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট খাতসহ 'সবুজ প্রযুক্তি' উন্নয়নে। বিষয়টি জরুরি এ জন্য যে সম্পদ আহরণের এ উৎসটি এমনই যে এ থেকে আহরিত অর্থ দিয়ে যে বিনিয়োগই করা হোক না কেন (ধরা যাক বড় ধরনের অবকাঠামো যেমন পদ্মা সেতু অথবা জাতীয়ভিত্তিক ব্যাপক পাবলিক ওয়ার্কস), তা হবে বিনিয়োগে সুদমুক্ত বা সুদবিহীন উৎস।

(৫) অতিধনী (ধনীদের মধ্যে ধনী), ধনী (অতিধনী নয়), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত—এই তিন গ্রুপের জন্য আয়কর আরোপে তিন ধরনের স্লাব ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৬) এখন আয়কর রিটার্নধারী (TIN: Tax Identification Number) মানুষের মোট সংখ্যা ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করেন (যাদের আবার ১০ লক্ষ সরকারি চাকরিজীবী এবং অন্যান্য বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত)। কিন্তু আমাদের হিসাবে দেশে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের মোট সংখ্যা ৩ কোটি ৯১ লক্ষ (৩ নম্বর আইটেমে বলেছি)। এই ৩ কোটি ৯১ লক্ষ ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের বাস ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার খানায়; এসব খানার প্রতিটিতে কমপক্ষে ১ জন করে আয়কর প্রদান করলেও তো ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেই তো মোট কর রিটার্নকারীর সংখ্যা হবে ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার। উপরে যে এখন দেশে মোট ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার আয়কর রিটার্নধারীর সংখ্যা বলা হয়েছে যার মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করেন, তাদের ৪০%-৫০% হবেন মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত (হুবহু হিসেব দেওয়া দুষ্কর)। অর্থাৎ ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা হবে বড়জোর ৯-১০ লক্ষ; অথচ এ সংখ্যাটাই হওয়ার কথা ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার। এর অর্থ দাঁড়ায় এ রকম যে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ৮৭% কোনো ধরনের আয়কর প্রদান করেন না। বিষয়টি ভাবনার—দুর্ভাবনার। কভিড-১৯ যে ধরনের মহামন্দা সৃষ্টি করে অর্থনীতি ও সমাজকে বিকল করেছে, আর ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যে ঋণাত্মক প্রভাব ইতিমধ্যে দৃশ্যমান—তাতে উত্তরণের অন্যতম পথ হিসেবে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের থেকে আয়কর আদায়ের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে এবং সে অনুযায়ী পুরো কর আদায় ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে।

(৭) দেশের সম্পদ, ভোগ ও আয়গত অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণার জন্য প্রযোজ্য সবার আয়কর রিটার্ন নম্বর (TIN কার্ড) থাকা দরকার। TIN-নামধারীদের আয়কর প্রদান প্রযোজ্য হোক অথবা না-হোক সবাইকে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন ও রিটার্ন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা যুক্তিসংগত।

(৮) আয়কর রিটার্ন ফরম হতে হবে সহজবোধ্য এবং ফরমটি হবে বড়জোর ২ পৃষ্ঠার, যেখানে থাকবে নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, সম্পদের (জমি, বাড়ি-ফ্ল্যাট, অর্থ,

সোনাদানা, শেয়ার-বন্ড-সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) স্বচ্ছ বিবরণ, মোট বার্ষিক আয় ও ব্যয়, সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত, প্রদেয় কর (সঞ্চয় ও উদ্বৃত্তের ওপর)।

(৯) মানুষকে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং একই সাথে কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর হার কমানো উচিত। ব্যক্তিপর্যায়ে কর হার হতে হবে 'প্রগেসিভ', বিভিন্ন স্লাবভিত্তিক, বেশি আয় বেশি কর হার নীতিভিত্তিক—আপাতত অতিধনী, ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের জন্য।

(১০) কর প্রদান ব্যবস্থা হতে হবে অনলাইন (যে শ্রেণির কথা বলছি তারা অনলাইনে মোটামুটি অভ্যস্ত। প্রয়োজনে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন)।

(১১) কর আদায় কর্মকর্তারা যেন কর প্রদানকারীদের কোনো রকম হেনস্থা করতে না পারেন, সে বিষয়ে কার্যকর মেকানিজম থাকতে হবে (বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ)।

কর-রাজস্ব: ভ্যাট ও ট্যাক্স

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue, NBR) ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (Bureau of Statistics) তথ্যমতে, বাংলাদেশে ভ্যাট লাইসেন্সধারীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে বড়জোর ১ লক্ষ লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে (মোট ভ্যাট লাইসেন্সধারীর ১১%) বর্তমানে ভ্যাট আদায় হয়। এটি সুসংবাদ নয়। আমরা মনে করি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পর্যায়ক্রমে ভ্যাট প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

(২) সমগ্র অর্থনীতিতে প্রাইভেট সেক্টরের যে অবস্থান তার সাথে বর্তমান কর আদায় কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভ্যাটের আদায় বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে মোট আদায়কৃত ভ্যাটের ৬৫ শতাংশ আদায় হয় সরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন (Tax-at-source), আর মাত্র ৩৫ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন। সরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন মানেই জনগণের অর্থের কর্তন। আমাদের অর্থনীতিতে কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে সে অনুযায়ী এই আদায়ের অনুপাতটা ঠিক উল্টো হওয়া যুক্তিসংগত, অর্থাৎ উৎসে কর্তনকৃত মোট আদায়ের ৩৫ শতাংশ হবে সরকারি (যা এখন ৬৫%), আর ৬৫ শতাংশ হবে বেসরকারি-প্রাইভেট (যা এখন ৩৫ শতাংশ)। অর্থনীতির কাঠামোগত এই পরিবর্তন আমলে নিয়ে ভ্যাট আদায় করতে সক্ষম হলে একদিকে সরকারের মোট রাজস্ব কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে, আর অন্যদিকে জনগণের ওপর করের বোঝা কমবে এবং কর বৈষম্য হ্রাস পাবে—এসব নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

(৩) ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায়ের বর্তমান কাঠামো অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভ্যাট-ট্যাক্সের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোট আদায়ের মধ্যে উৎসে কর্তন সূত্রে ৪৫.৫০ শতাংশ, পণ্য খাতে ৪৭ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৮.১৫ শতাংশ। আবার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে দেখা

যায় আয়কর খাতে উৎসে কর্তন ৬৪.৩২ শতাংশ, ব্যক্তি খাতে ৯.৯৩ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠান খাতে ২৫.৭৩ শতাংশ। ভ্যাট এবং কর আদায়ের কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। ভ্যাট আদায়ে সেবাখাত ও পণ্যখাতের অংশ তুলনামূলক বাড়ালে সার্বিক রাজস্ব আয় বাড়বে। গবেষণার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। তবে গবেষণাটি হতে হবে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ (বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ)।

(৪) ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে পারলে শুধু পরোক্ষ করই নয়, প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হতে পারে— ভ্যাট হার ও ট্যাক্স হার পুনর্ভাবনা এবং একই সাথে সমগ্র বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সেইসাথে "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" নীতি বাস্তবায়ন করা। এসবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি জরুরি।

কর রাজস্ব: তামাকজাত পণ্যে বর্ধিত হারে আবগারি শুল্ক

(১) বাংলাদেশে তামাকের অর্থনীতি ও কর রাজস্ব বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড় গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সবধরনের ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াহীন তামাকজাতীয় পণ্যের ওপর উচ্চ হারে কর বসিয়ে তামাকজাত পণ্যের মূল্য বেশ পরিমাণে বাড়াতে পারলে দেশের আনুমানিক ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারীর বহু ধরনের স্বাস্থ্যহানিসহ অকালমৃত্যু কমবে এবং একই সাথে সরকার তামাক খাত থেকেই কয়েক হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে।

(২) ধোঁয়াযুক্ত (সিগারেট ও বিড়ি) ও ধোঁয়াহীন (আলাপাতা, জর্দা, গুল) তামাকজাত পণ্যের ওপর শুল্ক বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো নিম্নরূপ:

(ক) সিগারেটের ওপর প্রচলিত জটিল মূল্য স্তরভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে এর পরিবর্তে সবধরনের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের ওপর ৩৪ টাকা হারে একক কর (specific tax) আরোপ করলে সিগারেটের ওপর এক্সাইজ ট্যাক্সের (সম্পূরক শুল্ক) পরিমাণ দাঁড়াবে গড়ে খুচরা মূল্যের ৭০ শতাংশ (যা এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। সবধরনের সিগারেটের ওপর ৭০ শতাংশ হারে একক সম্পূরক শুল্ক (specific excise tax) আরোপ করতে হবে। এর ফলে সিগারেটের দাম বাড়বে গড়ে ১৩০ শতাংশ, ধূমপান কমবে ৬৬ শতাংশ, প্রায় ৭০ লক্ষ ধূমপায়ী সিগারেট সেবন ছেড়ে দেবেন, প্রায় ৭১ লক্ষ তরুণ ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন, প্রায় ৬০ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে (বর্তমান ধূমপায়ীর মধ্যে) এবং সেইসাথে সরকারের অতিরিক্ত কর রাজস্ব আহরণ হবে কমপক্ষে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্যের ওপর ৪.৯০ টাকা হারে কর আরোপ করা হলে (গড় খুচরা মূল্যের ৪০%) এবং প্রকৃত মূল্যের ওপর ভ্যাট ধার্য করলে (সম্ভাব্য ফলাফল হবে) প্রায় ৩৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক বিড়ি

সেবনকারী বিড়ি সেবন ছেড়ে দেবেন, প্রায় ৩৫ লক্ষ তরুণ নতুন করে বিড়ি সেবন শুরু করবেন না, প্রায় ২৫ লক্ষ অকাল মৃত্যু রোধ সম্ভব হবে (বর্তমান বিড়ি সেবনকারীর মধ্যে) এবং সেইসাথে সরকারের অতিরিক্ত কর রাজস্ব আহরণ হবে কমপক্ষে ৮০০ কোটি টাকা।

(গ) ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন জর্দা, গুল, সাদাপাতা-আলাপাতাসহ সবধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ হারে কর আরোপ করতে হবে, যা এসব দ্রব্যের ব্যবহার কমাবে।

(ঘ) তামাকের মূল্য প্রতিবছর বাড়াতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত মূল্য কমতে পারবে না—এ নীতি মেনে তামাকের ওপর কর-শুল্ক আরোপ করতে হবে।

(৩) তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করতে হবে। এই সারচার্জ থেকে বছরে আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব আয় সম্ভব। এই বাড়তি রাজস্ব আয় সরকার যেসব কাজে ব্যবহার করতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হতে পারে—তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাসে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, কভিড-১৯ মহামারি রোধসংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য খাত, শিক্ষার উন্নয়ন, তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান, তামাক নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচার)।

(৪) তামাকের কর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে এবং কর সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) কর ফাঁকি রোধে শুল্কমুক্ত তামাক পণ্যের বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারকে যা বিবেচনায় রাখতে হবে

(১) বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক্-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে কর ও অন্যান্য সুবিধা দাবি করে থাকে। করোনাকালীন এ বছরও তার ব্যত্যয় তো ঘটেইনি বরঞ্চ এবার তারা সবাই বেশি বেশি চাইছে। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এসব দাবির যৌক্তিকতা যাই-ই হোক না কেন শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে: প্রকৃতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, অসমতা হ্রাস, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

রাজস্ব আয়ের নতুন উৎস

(১) কভিড-১৯-এর মহামন্দা আক্রান্ত সমাজ ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সরকারের নতুন নতুন আয়ের উৎস খুঁজে বের করা দরকার। এ অনুসন্ধানে আমরা বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ২৭টি নতুন উৎস নির্দিষ্ট করেছি, যা অতীতে ছিল না। আমাদের প্রস্তাবিত সরকারি আয় বৃদ্ধির নতুন এসব উৎসের মধ্যে থাকবে (১) কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (২) অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (৩) সম্পদ কর, (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ), (৫) বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর (tax on luxury goods), (৬) সংসদ সদস্যসহ অন্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ, (৭) বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, (৮) সেবা থেকে প্রাপ্ত কর, (৯) বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর, (১০) রয়্যালটি ও সম্পদ থেকে আয়, (১১) প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি, (১২) রেলপথ, (১৩) ডাক বিভাগ, (১৪) সরকারের সম্পদ বিক্রয়, (১৫) সেচবাবদ প্রাপ্তি, (১৬) তার ও টেলিফোন বোর্ড, (১৭) টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন, (১৮) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, (১৯) ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন, (২০) সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, (২১) বিআইডাব্লিউটিএ, (২২) পৌর হোল্ডিং কর, (২৩) ডিজি হেলথ: বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়গনস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফি (permission and renewal fees), (২৪) ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাইসেন্স এবং নবায়ন ফি, (২৫) বিউটিপার্লার সেবালব্ধ কর, (২৬) আবাসিক হোটেল/ গেস্টহাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax), (২৭) বিদেশি পরামর্শক ফি।

(২) উল্লিখিত ২৭টি উৎসের সবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় ভবিষ্যতের জন্য (বৈষম্য হ্রাসে রেন্টসিকিং সিস্টেমকে দুর্বল করার লক্ষ্যে) ৪টি উৎসে বিশেষ জোর দেওয়া শুরু করা প্রয়োজন: কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার, সম্পদ কর এবং অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর।

বাজেট প্রণয়ন, কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(১) সরকারি বাজেট আসলে কে প্রণয়ন করেন, কোথায় প্রণীত হয়—বাজেট প্রণেতারাই এসব ভালো বলতে পারবেন। তবে জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বার্ষিক বাজেট বক্তৃতা শুরু হয় বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন ঋণ জোগানদারদের সার্টিফিকেট দিয়ে। এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে মুক্তবাজারের আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির আওতাধীন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী ত্রিরত্ন—বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জাতীয় অর্থনীতির সামষ্টিক বিষয়াদির নীতিগুলোতে হস্তক্ষেপ ও চালকের আসনে বসাটা বাজেটে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ জরুরি।

(২) আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের বাজেট তৈরি করা হয় সব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং অর্থ বিভাগ তা চূড়ান্ত করে। বাজেট প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়াটা যেভাবে

কাঠামোবদ্ধ, তাতে সৃজনশীল চিন্তা প্রয়োগের সুযোগ কম। প্রক্রিয়াটি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক, যেখানে অতীতের খাতওয়ারি সংখ্যার শতকরা হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এবং তা করা হয় নব্য-উদারবাদী অর্থনীতির মতাদর্শের ফর্দ অনুযায়ী। এ পদ্ধতিতে বড়জোর খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের প্রবণতা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে প্রবণতাটি নিজেই সমস্যা—সমস্যার সমাধান নয়। এতে সমস্যার দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় না এবং বাজেট সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিবর্তনকামী হয় না। রাষ্ট্রীয় বাজেটের এ দুর্দশা কভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আরো বাড়বে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই এ অবস্থার নিরসনে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি 'রাজস্ব কমিশন' গঠনের প্রস্তাব করছি। এই 'রাজস্ব কমিশন' স্থায়ীও হতে পারে। কমিশনের কাজ হবে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের আগে দেশে বৈষম্য-অসমতার ক্রমবৃদ্ধি ও একই সাথে ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থ পাচার বৃদ্ধির কারণ-পরিণাম বিবেচনায় রেখে জনগণকে কম কষ্ট দিয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গতিশীল করা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সহায়তা প্রদান, পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ, সরকারি ব্যয় ও অপচয় হ্রাস—এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া।

(৩) জ্ঞানভিত্তিক-পেশাদার রাজস্ব প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা—বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান ব্যক্তিরা রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষ-অভিজ্ঞ-সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে সেটাই ছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে সামরিক শাসনে জারিকৃত ফরমানে সাধারণ প্রশাসনের আমলাদের স্বার্থে তা বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে (চেয়ারম্যান) রাজস্ব প্রশাসনে দক্ষ-অভিজ্ঞ-সৎ ব্যক্তিদের পদায়ন করতে হবে।

(৪) অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর প্রশাসনের আওতা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নপর্যায় পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে কাজটি তুলনামূলক সহজ। কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং/ অথবা যোগ্য পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নপর্যায়ে 'করদাতা শুমারি' সম্পন্ন করা জরুরি। সুনির্দিষ্ট টার্মস-অব-রেফারেন্সের ভিত্তিতে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশে 'করদাতা শুমারি' এবং 'সম্পদ শুমারির' কাজ সম্পাদন করে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তা ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

(৫) ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরি এবং একই সাথে স্থানীয় সম্পদের স্থানিক ব্যবহার-সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় (৫৪৪টি উপজেলা) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে থানা/ উপজেলা রাজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা উপকারী হবে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে, অন্যদিকে বাড়বে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান। আবার ভ্যাট-ট্যাক্সসংক্রান্ত বিষয়াদি এবং স্থানীয় সম্পদের মজুদ হালনাগাদসহ জাতীয়পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট

তথ্যভাণ্ডারও গড়ে উঠবে। দেশকে প্রকৃতির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাভিত্তিক শোভন সমাজ-অর্থনীতি ব্যবস্থার পথে উত্তরণের ক্ষেত্রেও এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

(৬) ১৯৮৪ সালের আইন অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকেরা বাংলাদেশে ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে পারেন না। কিন্তু এই আইন পাশ কাটিয়ে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই বিদেশিরা এখানে কর এবং ভ্যাট অফিসে প্র্যাকটিস করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ গুরুতর এবং তার সত্যতা যাচাইপূবর্ক অবিলম্বে এসব অবৈধ বিদেশির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি। বিদেশিরা সরকারের জাতীয় বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম দলিল প্রণয়নেরও স্বপ্ন দেখেন; এমনকি তারা এ নিয়ে রাজস্ব বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়। সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনকারী এই অশুভ-অনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবসান ঘটাতে হবে।

কালোটাকা

এক হিসাবে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ৩)।

সারণি ৩: বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়): জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে	
১৯৭২-৭৩	৪,৯৮৫	৫৪,৪০৫	১৮,১১৭
১৯৭৩-৭৪	৭,৫৭৫	৮০,১৬৯	২৬,৬৯৬
১৯৭৪-৭৫	১২,৫৭৪	৭৭,২৯৩	২৫,৭৩৯
১৯৭৫-৭৬	১০,৭৪৬	৬০,৩৫৯	২০,১০০
১৯৭৬-৭৭	১০,৫৩৬	৫৭,০০৯	১৮,৯৮৪
১৯৭৭-৭৮	১৩,০২৯	৭২,৬৯৮	২৪,২০৮
১৯৭৮-৭৯	১৪,৪৭৭	৭৭,৮৩৩	২৫,৯১৯
১৯৭৯-৮০	১৭,২৪৫	৯৭,৯৭৮	৩২,৬২৭
১৯৮০-৮১	১৯,৫৯৬	৯২,৪৫৮	৩০,৭৮৮
১৯৮১-৮২	২৬,৫১৪	১০০,৪৯৬	৩৩,৪৬৫
১৯৮২-৮৩	২৮,৮৪২	৯৯,০০৪	৩২,৯৬৮
১৯৮৩-৮৪	৩৪,৯৯২	১১৬,৮২১	৩৮,৯০২
১৯৮৪-৮৫	৪১,৬৯৬	১২৫,২৬৭	৪১,৭১৪
১৯৮৫-৮৬	৪৬,৬২৩	১২৯,৪২৫	৪৩,০৯৯
১৯৮৬-৮৭	৫৩,৯২০	১৪৬,৩০০	৪৮,৭১৮

সারণি ৩ চলমান.....

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়): জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে	
১৯৮৭-৮৮	৫৯,৭১৪	১৫৯,৪৪৫	৫৩,০৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৯৬০	১৭১,৪৩৮	৫৭,০৮৯
১৯৮৯-৯০	১০০,৩২৯	২৭৩,২৭৯	৯১,০০২
১৯৯০-৯১	১১০,৫১৮	২৫৯,৮৪৪	৮৬,৫২৮
১৯৯১-৯২	১১৯,৫৪২	২৫৭,৮৯৮	৮৫,৮৮০
১৯৯২-৯৩	১২৫,৩৭০	২৬৫,০২৭	৮৮,২৫৪
১৯৯৩-৯৪	১৩৫,৪১২	২৮৩,৪০৪	৯৪,৩৭৪
১৯৯৪-৯৫	১৫২,৫১৮	৩২০,৪০২	১০৬,৬৯৪
১৯৯৫-৯৬	১৬৬,৩২৪	৩৩৫,৫৬৩	১১১,৭৪৩
১৯৯৬-৯৭	১৮০,৭০১	৩৪৮,৬৬৪	১১৬,১০৫
১৯৯৭-৯৮	২০০,১৭৭	৩৬৪,৪৮৩	১২১,৩৭৩
১৯৯৮-৯৯	২১৯,৬৯৭	৩৮১,৮২৩	১২৭,১৪৭
১৯৯৯-০০	২৩৭,০৮৬	৩৯১,৭৮৬	১৩০,৪৬৫
২০০০-০১	২৫৩,৫৪৬	৩৭৭,০৮৮	১২৫,৫৭০
২০০১-০২	২৭৩,২০১	৩৯৯,৯৪৯	১৩৩,১৮৩
২০০২-০৩	৩০০,৫৮০	৪৪০,০৩০	১৪৬,৫৩০
২০০৩-০৪	৩৩২,৯৭৩	৪৭৫,০১৬	১৫৮,১৮০
২০০৪-০৫	৩৭০,৭০৭	৫০৬,৯৩১	১৬৮,৮০৮
২০০৫-০৬	৪৮২,৩৩৭	৬০৩,৪৯৬	২০০,৯৬৪
২০০৬-০৭	৫৪৯,৮০০	৬৬৮,৯৭৯	২২২,৭৭০
২০০৭-০৮	৬২৮,৬৮২	৭৬৯,৯৭৪	২৫৬,৪০১
২০০৮-০৯	৭০৫,০৭২	৮৬১,১১৪	২৮৬,৭৫১
২০০৯-১০	৭৯৭,৫৩৯	৯৬৮,৬৭৮	৩২২,৫৭০
২০১০-১১	৯১৫,৮২৯	১,০৮০,৬০৯	৩৫৯,৮৪৩
২০১১-১২	১,০৫৫,২০৪	১,১১৯,৪১১	৩৭২,৭৬৪
২০১২-১৩	১,১৯৮,৯২৩	১,২৬০,৩২৯	৪১৯,৬৮৯
২০১৩-১৪	১,৩৪৩,৬৭৪	১,৪৫২,৭৬৫	৪৮৩,৭৭১
২০১৪-১৫	১,৫১৫,৮০২	১,৬৩৯,৮১৮	৫৪৬,০৫৯
২০১৫-১৬	১,৭৩২,৮৬৪	১,৮৬০,৪২১	৬১৯,৫২০
২০১৬-১৭	১,৯৭৫,৮১৭	২,০৯৮,০৮৭	৬৯৮,৬৬৩
২০১৭-১৮	২,২৫০,৪৮১	২,৩০৩,১৬৯	৭৬৬,৯৫৫
২০১৮-১৯	২,৫২৪,৪৮৪	২,৫২৪,৪৮৪	৮৪০,৬৫৩
মোট	**২১,৪২৪,২১৪**	**২৬,৬১০,৯২১**	**৮,৮৬১,৪৩৭**

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

কালোটাকার বিগত ৪৬ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯) ইতিহাস থেকে এটাও প্রক্ষেপণ সম্ভব যে সবকিছু যেমন চলছে, তেমনই চলতে থাকলে কালোটাকার মালিকেরা যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম ও ইচ্ছুক—এমন ভাবনা অলীক বৈ কিছু নয়। সবকিছু

বিচারে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তুসহ কালোটাকার মালিকদের এহেন প্রভাব-প্রতাপ ইতিমধ্যে যেসব মারাত্মক 'স্বাভাবিক অঘটন' ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) তারা সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকাঠামোকেই এমন বিকৃত করে ছেড়েছে, যা বজায় রেখে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক সমাজ—শোভন সমাজব্যবস্থা গড়া অসম্ভব;

(২) কালোটাকার ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি—সর্বত্র, যে কারণে এখন 'অর্থপূজা' সর্বজনীনতা পেয়েছে, এখন 'অর্থপূজা'র ওপরে আর কোনো পূজা নেই;

(৩) অতীতে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল, সেটি আর নেই। অতীতে সরকার ও ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেটি বিনষ্ট হয়েছে। অতীতে সরকার-এর (government) হাতে ক্ষমতা (power) ছিল—এখন নেই; এখন সরকার সরকারের জায়গায় আছেন, তবে ক্ষমতাহীন; ক্ষমতা রাজনীতি থেকে অভিবাসিত হয়েছে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কালোটাকার মালিক-রেন্ট সিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল নিকৃষ্ট পুঁজির হাতে (power has migrated from politics to rent seeking economics);

(৪) কালোটাকার মালিক গোষ্ঠী/ শ্রেণি 'গণতন্ত্রমুক্ত জোনের বাসিন্দা' (resides in the 'democracy free' zone) এবং গণতন্ত্রকে তারা ভোটের খেলা বানিয়ে ছেড়েছে-ছাড়বে, যেখানে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকবে না;

(৫) কালোটাকার দেশীয় মালিকেরা বৈশ্বিক কালোটাকা-বৈশ্বিক রেন্টসিকার আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীনস্থ-দোসর;

(৬) কালোটাকার মালিকগোষ্ঠী তাদের কালোটাকা দিয়ে আর যা-ই করুক না কেন দেশের মানুষের 'মোট চাহিদা' (বা aggregate demand) বাড়াতে সক্ষম নয়;

(৭) কালোটাকা এমনকি উৎপাদনশীল অর্থপুঁজিতে রূপান্তরে ভীত অথবা আগ্রহী নয়;

(৮) কালোটাকার বিস্তৃতি সমাজ অর্থনীতিতে বৈষম্য বাড়িয়েছে-বাড়াচ্ছে-বাড়াবে, ফলে উত্তরোত্তর অধিক হারে মানুষ বহুমুখী বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে বাধ্য;

(৯) কালোটাকার এহেন বিস্তৃতি সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-সরকারের চরম ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিতিশীলতার কারণ হতে বাধ্য;

(১০) যেভাবে চলছে, সেভাবে চলতে থাকলে—বাংলাদেশে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে ফ্যাসিস্ট সরকার, ইসলাম ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। আর অবস্থা পরিবর্তিত হলে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তন, যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের—শোভন সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমরা কালোটাকা উদ্ধার থেকে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি টাকা আহরণের প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৮)।

অর্থ পাচার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫,৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আমাদের হিসাবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশের মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমরা অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে ৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা প্রাপ্তি সম্ভব বলে মনে করি (দেখুন, সারণি ৮)।

দুর্নীতি রোধ, কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধার-উদ্দিষ্ট প্রধান সুপারিশ

(১) "দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার"সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বাধীন কমিশন ("Independent Commission on Corruption, Black Money and Money Laundering") গঠন করা হোক। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচারসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া এবং অনুসন্ধান-গবেষণাফল প্রতি তিন মাস অন্তর দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা। একই সাথে কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা। প্রস্তাবিত এই স্বাধীন কমিশন পরিচালনের প্রধান নীতি-দর্শন (principle philosophy) হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের "সংবিধানের প্রাধান্য"—৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ: *"(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।"* প্রস্তাবিত এ কমিশন যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু কমিশন তার কাজের জন্য সরাসরি জনগণের কাছেই জবাবদিহি করবে (প্রয়োজনে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে)। মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে প্রস্তাবিত এ কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে ১ জন প্রধান কমিশনার (নারী অথবা পুরুষ) ও ৮ জন কমিশনার (৪ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ)। কমিশন তার কর্মসম্পাদনে মোট ১০০ জন গবেষক-গবেষণা সহকারী নিযুক্ত করবে। প্রধান কমিশনারসহ সব কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রের প্রধান; নিযুক্তিকাল হবে ৩-৫ বছর; কমিশনারদের যে-কেউ যেকোনো সময় ইস্তফা দিতে পারবেন (ইস্তফার কারণ উল্লেখ অথবা উল্লেখ না করে); এবং নিযুক্তিকালে ছেড়ে চলে যেতে বলার দায়দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। কমিশনের সদস্য হতে পারবেন শুধু তারা, যারা স্ব-গুণাবলি, দেশপ্রেম ও জ্ঞানসমৃদ্ধতার কারণে জনসাধারণ্যে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কমিশনে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির কোনো ব্যক্তি (তিনি ওই ক্যাটেগরিতে বর্তমানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত যেটাই হোক না কেন) কমিশনার (কমিশন সদস্য) হতে পারবেন না:

আমলা, সামরিক বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, (পেশাগত) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, রাজনৈতিক দলের সদস্য, গণমাধ্যমের মালিক। রাষ্ট্র কমিশনকে এককালীন ১০০ কোটি টাকার ৩ বছরের বাজেট অগ্রিম দেবেন (প্রধান কমিশনার রাষ্ট্রের সাথে বাজেটে স্বাক্ষর করবেন), কমিশন প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিশনের আয়-ব্যয় জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে; গঠনের ৩ মাসের মধ্যে রাষ্ট্র কমিশনের জন্য বহুতল স্থায়ী কমিশন ভবনের ব্যবস্থা করবে; রাষ্ট্র কমিশনে কর্মরত সবার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। প্রস্তাবিত এ কমিশন স্বাধীন, বিধায় কমিশনের সাথে বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে স্বাধীন এই কমিশন প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে বলতে পারবে। দুর্নীতির কারণে, কালোটাকার মালিক হওয়ার কারণে, অর্থ পাচার করার কারণে প্রস্তাবিত এই কমিশন কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না; শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক রাষ্ট্রপতি এবং/ অথবা প্রধান বিচারপতির বরাবর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

(২) আমাদের প্রস্তাব হলো—আগামী ১ বছরে (অর্থবছর ২০২২-২৩) মাত্র ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি কালোটাকা এবং ৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করতে হবে। এবং পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এই ধারা উত্তরোত্তর জোরদার করতে হবে। এ কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য যাদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তাদের মধ্যে রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সম্পর্কিত জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি-কমিশন, (প্যারিসভিত্তিক) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট প্রণেতাদের সংস্থা (তবে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণের পরে), প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংসদের সব স্থায়ী কমিটি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রজাতন্ত্রের মহা হিসাব নিরীক্ষক, দেশের আইনশৃঙ্খলা প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সংশ্লিষ্ট অফিস, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য।

৪.২৩ মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ) এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ)

দেশে যেভাবে সবকিছু এককেন্দ্রিক বা ঢাকামুখী হচ্ছে তা উন্নয়নসহায়ক নয়। এ বিষয়ে অর্থনীতির অনেক মৌলিক কর্মকাণ্ড (শিল্পায়ন, নগরায়ণ প্রভৃতি) থেকে শুরু করে অনেক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড (দপ্তর, অধিদপ্তর, এমনকি মন্ত্রণালয়) রাজধানী ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা যুক্তিসংগত। বিষয়টি এমনিতেই জরুরি, আর কভিড-১৯-এর লকডাউনে বিপর্যস্ত সমাজ-অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এ বিষয়ে আসন্ন বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। আমরা মনে করি, সময় এসেছে মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক স্থানান্তর-বিকেন্দ্রীকরণ। এই লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ সারণি ৪-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪: কেন্দ্রিভূত (ঢাকাকেন্দ্রিক) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব

মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান) নাম	যে বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণের (স্থানান্তরের) প্রস্তাব করা হচ্ছে
(১) প্রতিরক্ষা, (২) পরারাষ্ট্র, (৩) অর্থ, (৪) স্বরাষ্ট্র, (৫) জনপ্রশাসন, (৬) শিক্ষা, (৭) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক, (৮) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, (৯) পরিকল্পনা, (১০) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, (১১) খাদ্য, (১২) সড়ক পরিবহন ও সেতু, (১৩) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ, (১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (১৫) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক, (১৬) সংস্কৃতিবিষয়ক, (১৭) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি	ঢাকা
(১) বাণিজ্য, (২) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক, (৪) ধর্ম	চট্টগ্রাম
(১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, (২) শিল্প, (৩) বস্ত্র ও পাট, (৪) রেলপথ	খুলনা
(১) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, (২) যুব ও ক্রীড়া, (৩) মহিলা ও শিশুবিষয়ক, (৪) তথ্য ও সম্প্রচার	রাজশাহী
(১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, (২) শ্রম ও কর্মসংস্থান	সিলেট
(১) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, (২) সমাজকল্যাণ	রংপুর
(১) পানিসম্পদ, (২) নৌ-পরিবহন, (৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, (৪) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	বরিশাল
(১) কৃষি, (২) ভূমি	ময়মনসিংহ

(১) সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্ব-স্ব আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়গুলো এই আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করে না। এক্ষেত্রে পাইলট ভিত্তিতে একটি মন্ত্রণালয়ে "আর্থিক বিবরণী মডেল" করে তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পরে বাকি ৪২টি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণী সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের "সংহত আর্থিক বিবরণী" প্রণয়ন করা যেতে পারে। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে তুলনামূলক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিরবণী প্রণয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সময় বেঁধে দিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়সমূহে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(২) দেশের জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অবস্থা মূল্যায়নে মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন প্রয়োজন। এ বিষয়ে রুলস অব বিজনেস-এর বাস্তবায়ন দরকার।

(৩) সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার-উদ্দিষ্ট নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি: (ক) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামপর্যায়ের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণ; (খ) ঢাকাসহ দেশের সব সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশন (ঢাকা

উত্তর ও দক্ষিণ), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্পোরেশন, খুলনা উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল উন্নয়ন কর্পোরেশন, সিলেট উন্নয়ন কর্পোরেশনের মতো আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা; এবং (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয়পর্যায়ে কর/ ফি আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং তা স্থানীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা।

(৪) সরকারের পরিচালন ব্যয় (operating expenditure) কমানো নিয়ে বাজেটে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা থাকে না। এ বছর কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়ের কারণে বিষয়টির গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। সরকারের আয়-ব্যয়ের কোন কোন খাত-ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও মান অক্ষুণ্ন রেখে কীভাবে কতটুকু পরিচালন ব্যয় কমানো সম্ভব, তার পথনির্দেশ বাজেটে থাকা প্রয়োজন।

(৫) গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রতি সম্মান রেখে সরকারের আয়-ব্যয়সংশ্লিষ্ট 'ফিসক্যাল কর্মকর্তাদের' স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করে ঘুষ-নীতি বিলুপ্তির লক্ষ্যে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' (zero tolerance) দৃশ্যমান করতে হবে। এ বিষয়ে বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। রেন্টসিকার-অধ্যুষিত সমাজ-অর্থনীতিতে বিষয়টি সহজ নয়, তবে তা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আবশ্যিক শর্ত।

(৬) সাধারণ প্রশাসনসংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহে যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সহায়তায় এ দুটো খাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা এবং যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যেই নয়, সেইসাথে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। এসব কর্মকাণ্ড "ব্যবসা ব্যয়" (cost of doing bussiness) হ্রাস এবং "ব্যবসা সহজীকরণ"-এ (ease of doing bussiness) সহায়ক হবে; অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়াবে, বাড়াবে কর্মসংস্থান। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অবৈধ পথে—কালো পথে উৎপাদনশীল খাত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন। আবার আমাদের এসব কথার অর্থ এই নয় যে—আমরা ক্ষুদ্রায়তন সরকারের পক্ষে; আমরা কোনো অর্থেই রাষ্ট্রকে নেহায়েত 'নৈশপ্রহরী' বানানোর পক্ষে নই। আমাদের মতে, রাষ্ট্র মানে শুধু আইন প্রণয়নকারী (Legislative) এবং নিয়ন্ত্রণকারী (Regulator) নয়, রাষ্ট্র মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের প্রধান প্রতিষ্ঠান, যা পরিচালিত হবে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক" নীতির ভিত্তিতে। আমরা মনে করি, বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের সমাজ

বিনির্মাণে রাষ্ট্রকে তার তিনটি বৃহৎবর্গীয় স্বাধীন, দেশপ্রেমিক ও পরস্পরসম্পর্কিত অঙ্গ—আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগসমূহকে (Legislative, Judiciary, Executive) উত্তরোত্তর অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে; এসব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করতে হবে আর্থিক বিচারে শক্তিশালী এবং নৈতিকভাবে জনকল্যাণকামী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরোত্তর জনকল্যাণকামী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাজেটে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্পষ্ট করা জরুরি।

(৭) সরকারপ্রচলিত সংগ্রহ পদ্ধতির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান পদ্ধতি দীর্ঘসূত্রতামূলক, ব্যয় বৃদ্ধিমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের দ্রব্য ও সেবা প্রদানপ্রবণ। এ অবস্থা প্রশমনে ইতিমধ্যে চালুকৃত ইলেকট্রনিক সরকারি সংগ্রহ (e-GP) ও ইলেকট্রনিক দরপত্র (e-tendering) পদ্ধতিতে অনেক দুর্নীতি-অনিয়ম। কিন্তু প্রযুক্তিনির্ভর এসব পদ্ধতি চালুর আগে বলা হয়েছিল যে এসব চালু হলে দ্রব্য ও সেবার মূল্য ১২ শতাংশ কমে যাবে। এসব হয়নি। আসলে যন্ত্রের পেছনের মানুষ এবং যন্ত্র যে আর্থসামাজিক পরিবেশে কাজ করে—সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবনা-কথা সরকারের উন্নয়নদর্শন ও কর্মকাণ্ডে দৃশ্যমান হতে হবে।

(৮) বাজেটে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য আরো কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। বিষয়গুলো এ রকম: (ক) জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্তত ছয় মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয় খাত অনুযায়ী অনুমিত/ সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়) প্রকাশ করা উচিত; (খ) উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের মাঝখানে অননুমোদিত কোনো প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে; (গ) সবধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে; এবং (ঘ) বছরের ১ জানুয়ারি (ইংরেজি ক্যালেন্ডার ইয়ার) কিংবা ১ এপ্রিল (বাংলা নববর্ষ) থেকে অর্থবছর গণনার কথা বিবেচনা করা।

৪.২৪ বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়

বাজেটের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বল্প হার নিয়ে প্রায়ই বলা হয় যে 'প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাটাই প্রধান', 'প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি', 'সরকারি কর্মকর্তাদের ভার বহনে ক্ষমতা কম'। এসবও সত্য নয়। কারণ—ঘুষ তো ঠিকই প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়েছে, এরা বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধা-প্রযুক্তিজ্ঞানেও তো কম যান না, এরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছাত্র বলেই পরিচিত ছিলেন, এরা পোশাক-আশাক-আচার-আচরণ-ভাব-ভঙ্গিতেও যথেষ্ট কেতাদুরস্ত—একদম ঔপনিবেশিক আমলের সাদা সাহেবদের মতো 'স্মার্ট'! আসলে সমস্যাটা সেখানে, যা ওদের আগ্রহকাঠামো ও পছন্দকাঠামোর মধ্যে ঘুষ-দুর্নীতিকে দুর্ভেদ্য বাসা বাঁধতে দেয়—অর্থাৎ সমগ্র আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কাঠামোটাই সমস্যা। এসব থেকে মুক্তির সহজ-সরল পথ নেই। সংস্কার করে দেখা যেতে পারে, তবে ঘুণে ধরা ঘর পেলা দিয়েও খুব বেশি দিন টেকে না। এখানেও তাই। আমলাসকল মাঝেমধ্যেই অন্যদের সাথে (বিশেষত সামরিকদের সাথে) নিজেদের বেতন-ভাতা-বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধার

জন্য সরকারের কাছে চাপ দেন। সরকার দেরি করেন না—কারণ, ওরা-ওরাই সরকার। সংসার চলে না অথবা টানাটানি হয়—এসব কারণে আমলাসকলেরা কিন্তু ওসব দাবিদাওয়া পেশ করেন না। ওসব পেশ ও আদায় করার প্রধান লক্ষ্য ট্যাক্স ফাইল ঠিকঠাক রাখা (অনেকটা অর্থ পাচারের ধৌতকরণ প্রক্রিয়ার মতো)।

৪.২৫ শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

(১) (প্রধান সুপারিশ ভাবনা) দেশজ মেধা-মননসম্পদ (দেশের ভেতরের এবং বাইরের) ব্যবহার করে বহিঃশক্তির চাপাচাপি অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির অধীনস্থতা স্বীকার করে দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনকুশলতা বিচার করে সবধরনের বৈষম্য হ্রাস ও আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটীয় কর্মসূচি (programme) ও তার অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ (projects) প্রণয়ন করতে হবে।

(২) বৈষম্য হ্রাস ও আলোকিত সমাজ-উদ্দিষ্ট উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প বিনির্মাণে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সুস্পষ্ট-পরিচ্ছন্ন ধারণাকাঠামোর মধ্যে কাজটি তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে।

(৩) সম্ভব হলে (যদিও সহজ নয়) পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনের সুযোগ রেখে ৫ বছর মেয়াদি (ক্ষেত্রবিশেষে ১০ বছর মেয়াদি) সুনির্দিষ্ট-সময়ভিত্তিক কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) এসব কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নকালে পাশাপাশি বাস্তবায়নের কর্মকৌশলও প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে দেখতে হবে যেন সম্পদের অপচয় না হয়।

(৫) এসব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন (implementation) ও পরিবীক্ষণের (monitoring) কাঠামো বিনির্মাণে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এসব কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) এসব কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়নের সমন্বয় (coordination) নীতি-কৌশল কর্মসূচি প্রকল্প-উদ্দিষ্ট মানুষের অংশগ্রহণে নির্মাণ করতে হবে। এসব নীতি-কৌশলের মধ্যে থাকবে বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রীয়-সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের (যেমন আমলা, আইন, বিচার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখা) সাথে জনগণের, নির্বাচিত প্রতিনিধির এবং নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, আন্তমন্ত্রণালয়-আন্তবিভাগ সম্পর্কসমূহ।

(৭) প্রতিবছর খসড়া বাজেট সংসদে পেশ করার আগে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন কমপক্ষে দুইবার জাতীয় সংসদে পর্যালোচনা এবং তা গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা ও পর্যলোচনার বিধান চালু করতে হবে। প্রথম প্রতিবেদনটি হতে পারে অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দিকে, আর দ্বিতীয়টি মার্চ মাসে (কোনো অবস্থাতেই মে মাসে নয়)।

অধ্যায় ৫
২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিকল্প বাজেট: জনগণতান্ত্রিক বাজেট

৫.১. প্রাক্-কথন

"আমরা এমন একটি বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব করতে চাই, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেট কাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি না? প্রস্তাবিত বাজেটটি কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে), যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে। একই সাথে প্রস্তাবিত বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হবে সর্বজনীন (universal অর্থে) অর্থাৎ অনেক দেশের জন্য প্রযোজ্য— বিশ্বজনীন। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোটি সর্বজনীন এ জন্য যে তার অভীষ্ট—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি" (দেখুন বারকাত, আবুল, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫১৩)।

প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা একই সাথে সংঘটিত অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা ও কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামোর (conceptual theoretical construct) কথা বলছি, যার তিনটি বৃহৎবর্গীয় পরস্পরনির্ভরশীল উপাদান হলো: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। এই বাজেটে প্রস্তাবিত তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে থেকে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে: পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯ ও মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা এবং আমরা এমনটিও বলতে চেয়েছি যে ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও তা হতে পারে প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত, এবং একই সাথে বলেছি যে ভাইরাস-মহামারি হতে পারে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত; রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে প্রাক্-কভিড-১৯ বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রের বিকাশ প্রবণতা; সমাজ ও অর্থনীতিতে কভিড-১৯-এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং ক্ষতি মোকাবিলার পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে শোভন সমাজ অভীষ্ট প্রাথমিক কর্মকাণ্ডসমূহ; শোভন সমাজ-অর্থনীতি সন্ধান প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের লক্ষ্যে সমাজ সমগ্রকের মৌল উপাদানসমূহের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব-সুপারিশ (দেখুন, বারকাত আবুল, প্রাগুক্ত পৃ. ৫১৩-৫১৪)। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে ইউরোপে

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত যা অনিশ্চিত হলেও যুদ্ধের ঋণাত্মক অভিঘাত আমরা অনুভব করছি।

৫.২ সরকারের বাজেট: প্রণয়ন ও মঞ্চায়নপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে[৫]

আমাদের দেশের 'বাজেট সংস্কৃতিটা' একধরনের "নিরানন্দময় মঞ্চনাটক"-এর মতো (dystopic stage show)। নিরানন্দ এই মঞ্চায়নের ৩টি পর্ব। এ ৩ পর্বের সাধারণ বাহ্যিক সূত্র হলো: "এলেন→পাঠ করলেন→চলে গেলেন"। আর ৩ পর্বের একটু ভেতরের কথাগুলো নিম্নরূপ: প্রথম পর্ব *প্রস্তুতি পর্ব* বা *স্ক্রিপ্ট রচনা পর্ব;* দ্বিতীয় পর্বকে বলা যায় *মঞ্চায়ন পর্ব*, আর তৃতীয় পর্বকে বলা যায় *বছরব্যাপী ভোগ-উপভোগ-দুর্ভোগ পর্ব। প্রস্তুতি পর্ব বা স্ক্রিপ্ট রচনা পর্বটি* খুবই সোজা-সরল এবং খুবই কষ্টকর-জটিল এক পর্ব। এ পর্বটি খুবই সোজা-সরল এ জন্য যে সম্ভবত এ পর্বে অতীতের স্ক্রিপ্টে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে কিছু ঘষামাজা করা হয়। আর ঘষামাজার জন্য মূল ফরম্যাটটা নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজারের প্রেসক্রিপশন হিসেবে উপর থেকে নাজিল হয়, যা তামিল করার বাইরে তেমন কিছু করার থাকে না। তবে পর্বটি একই সাথে খুবই কষ্টকর এবং জটিল এ জন্য যে এই পর্বে প্রায় সব মন্ত্রণালয়-দপ্তর-অধিদপ্তর-পরিদপ্তর-বিভাগ-অনুবিভাগসহ সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালতে অযথা অনেক আলাপ-আলোচনা-বৈঠক-সেমিনার-ওয়ার্কশপ-দৌড়াদৌড়ি করতে হয়—বিষয়টি যথেষ্ট নিরানন্দময়, কারো কারো জন্য অপ্রীতিকর, তবে গুটিকয়েক রেন্ট সিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্তদের জন্য খুবই আনন্দের। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ও তার অধীনস্থ বাহিনীর জন্য এসব কাজ খুব আনন্দের এবং সৃজনশীল হবার কথা নয়। হতে পারে একঘেয়ে, হতে পারে উপরি চাপ সহ্য ক্ষমতার পরীক্ষা। আর আমজনতার জন্য এ পর্বটি খুবই সহজ-সরল-সোজাসাপ্টা। কারণ, তারা জানেন "বাজেট মানেই জিনিসপত্তরের দাম বাড়া, কষ্ট বাড়া", আবার খুবই কষ্টকর-জটিল ও পীড়াদায়ক এ জন্য যে বাজেট মানেই তাদের কাছে "মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়া যে আগামীতে কীভাবে পরিবারের বাজেট বানাবেন" (এসব তাদের সাধারণ উপলব্ধি নয়, এসব অভিজ্ঞতালব্ধ, যা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই)।

নিরানন্দ বাজেট সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব হলো *বাজেটের মঞ্চায়ন*। বাজেট নিয়ে আমাদের যে মঞ্চায়ন রীতি গড়ে উঠেছে তা সংগীতজগতে 'ফিউশন সংস্কৃতি' (বা genre, বিশেষ ধারা) অথবা 'জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি'র সাথে তুলনা করা যেতে পারে (যে সংস্কৃতির কোনো সাংস্কৃতিক মূল্য আছে কিনা তা নিয়ে মোটামুটি সবাই রীতিমতো সন্দিহান)। বাজেট মঞ্চায়ন সংস্কৃতিতে সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ-আধুনিকতাবাদ-পশ্চিমাবাদ-মৌলবাদ-ধর্মবাদ—এই সবকিছুরই মিশ্রিত প্রতিফলন দেখা যায়, যা সাধারণ মননশীল যেকোনো মানুষের চোখেই দৃষ্টিকটু মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মঞ্চায়নপ্রক্রিয়ার শুরু সংসদ ভবনে ঢোকার প্রক্রিয়া দিয়ে। এলাহি কারবার সেখানে। বড় বড় গাড়ি আর জামাইবাবুর পোশাকে আসেন দর্শক-শ্রোতা—যার যত বড় গাড়ি, সালামের জবাব দিতে তাকে তত বেশি ক্লান্ত হতে হয়—এরপর কি আর শক্তি থাকে ওসব কোটি কোটি টাকার হিসেবপত্তর শুনতে। তারপরও তিনি (তারা) খুব কষ্টে নিজ আসন পর্যন্ত পৌঁছান, কিন্তু গিয়ে দ্যাখেন তার আসনের সামনে টেবিলে বিশাল এক বস্তার ব্যাগে ভীষণ মোট মোটা বইপত্তর (খুব কষ্ট

[৫] এই অংশের অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে, বারকাত আবুল, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ.৫১৫-৫২১

করে তিনি টেবিল থেকে তা নিচে নামিয়ে পায়ের কাছে রাখেন—ওটা আর খোলা হয় না); আর টেবিলের ওপর আলাদা করা থাকে ছোট একটি ১০০-১৫০ পৃষ্ঠার বই, যার নাম—"বাজেট বক্তৃতা" (এটা আলাদা করা থাকে এ জন্য যে আয়োজকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে বড় বস্তাটি আর খোলা হবে না)—অর্থমন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতায় যা বলবেন তা অন্তত যেন অনুসরণ করা যায় সে জন্যই বইটি টেবিলের উপর থাকে (তবে দলিলে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বক্তৃতা শুনে নিরূপণ করা কঠিন)। দর্শক-শ্রোতাদের আসনগ্রহণের পর্বের মাঝখানে অথবা শেষের দিকে ব্রিফকেস হাতে আগমন হয় 'একক-বক্তা' মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের; আসেন সরকারপ্রধান—সবাই উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন; এরপরে আসেন মাননীয় স্পিকার মহোদয় সাথে থাকে রাজটুপি পরা কয়েকজন। মাননীয় স্পিকার মহোদয় রীতি অনুযায়ী দু-এক কথা বলেন। এর পরে শুরু হয় একক বক্তা—মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা—তিনি অর্থবছরের খসড়া বাজেট উত্থাপন করেন, পরবর্তীকালে মাসব্যাপী মঞ্চস্থ হয় খসড়া বাজেট নিয়ে আলোচনা—যা নিয়ে আলোচনা শেষে অর্থমন্ত্রীর কোনো স্বচ্ছতা বা প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাড়াই বাজেট বিল আকারে উত্থাপিত হয় এবং টেবিল হাত চাপড়ে পাস হয়ে যায়—অর্থাৎ তখনই খসড়া বাজেট চূড়ান্ত বাজেটে রূপান্তরিত হয়।

মঞ্চস্থ খসড়া বাজেটে যা থাকে, সংক্ষেপে তা হলো—শুরুর দিকে অতিমাত্রায় স্তুতি, উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ দাতাদের দেওয়া সার্টিফিকেট, ফেলে আসা দিনের সাফল্যনির্দেশক 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-এর গল্প, ভণিতা, প্রচুর ইশারা ভাষা, দ্বিচারিতা, তোষামোদি ও মিথ্যা ভাষণ (সবার সামনেই), আর সব শেষে দীর্ঘক্ষণ নিরস-নিরানন্দ সব হিসেবপত্তর আর মাঝেমধ্যে করতালি।

বাজেট বক্তৃতা শুরু হয় জাতির পিতার বিদেহি আত্মাসহ মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের কথা স্মরণ করে। তবে কোনো বাজেট বক্তৃতাতেই দেখানো যাবে না যে বাজেটে কোথাও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনের সর্বোচ্চ দলিল সংবিধান উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে "এই বাজেট প্রণীত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র দলিল সংবিধানে প্রতিশ্রুত 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'– এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে" [সংবিধান অনুচ্ছেদ ৭ (১)]।

সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করে সরকারের আয় ও ব্যয়ের আর্থিক বিবৃতিসমূহ (যাকেই বলে বাজেট) বলার রীতি গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সংবিধানে প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র পরিচালনার ওইসব মূলনীতি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই তো মহান জাতীয় সংসদ। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আছে মালিকানার নীতি, যেখানে বলা—রাষ্ট্রীয় মালিকানা হবে রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার প্রধান ধরন (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৩), আর বাজেট উচ্চকণ্ঠে বলে ব্যক্তিগত মালিকানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কথা; সংবিধান বলে—কৃষক-শ্রমিকের শোষণ মুক্তির কথা (অনুচ্ছেদ ১৪), আর বাজেট এসবে মাথা ঘামায় না; সংবিধান বলে—রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে (অনুচ্ছেদ ১৫), আর বাজেট বলে সবকিছু মুক্তবাজারে ছেড়ে দাও; সংবিধান বলে—বৈষম্য দূর করতে কৃষি বিপ্লবের কথা (অনুচ্ছেদ ১৬), আর বাজেট বলে উল্টোটা; সংবিধান বলে—"কেউ-ই অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবেন না" [অনুচ্ছেদ ২০ (২)], আর বাজেট বলে কালোটাকা সাদা করতে পারবেন কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। তাহলে বাজেটের নামে যে দলিল

মঞ্চায়িত হয় আর বাজেট বক্তৃতার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ ও জাতির পিতার প্রতি যত শ্রদ্ধা দেখানো হয়—এ দুই তো শুধু মেলেই না, তা বিপরীতধর্মী—একেই বলা হয় হিপোক্র্যাসি বা দ্বিচারিতা এবং বৈপরীত্য (এর বেশি আর বলার আসলে কিছু নেই)।

আমাদের 'বাজেট সংস্কৃতি'টা এতক্ষণ যা বললাম সে রকমই। এরপরও আরো কিছু না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রতিবছর জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একবার কয়েক ঘণ্টাব্যাপী খসড়া বাজেট (Draft Budget) পেশ করেন। নাগরিক সমাজ (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ) বাজেটের আগে কিছু বিশ্লেষণ-সুপারিশ পেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির) প্রস্তাবিত জনকল্যাণকামী ও শ্রেণি মইয়ের নিচতলা-স্বার্থীয় কোনো সুপারিশ গৃহীত হয় না। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। হতে পারে আমাদের দেশের বাজেটের ভিত্তি নীতি, আর্থিক নীতি ও মুদ্রা নীতি—আমরা নিজেরা প্রণয়ন করি না; হতে পারে বাজেট লেখনপ্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির স্বার্থের কথা (বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-অর্থ সংস্থার মাধ্যমে) শুনতে ও মানতে আমরা বাধ্য হই; হতে পারে অতিমাত্রায় শুনতে হয় 'ডোনার'দের কথা (এদের আজকাল বন্ধু ভেবে 'উন্নয়ন সহযোগী' বলা হয়, যা তারা আদৌ নয়); হতে পারে রেন্ট-সিকারদের কথা না শুনে উপায় থাকে না; হতে পারে বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতেই হয়; হতে পারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় আন্তর্জাতিক চাপ কমবেশি মান্য করতেই হয়; হতে পারে বিভিন্ন মাত্রায় এ সবকিছুরই মিশ্রণ। বাজেট দলিলটি যে 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রণীত দলিল'—এ কথা যেন বলা যায় সে জন্য সংশ্লিষ্টরা জাতীয় সংসদে খসড়া বাজেট পেশ করার আগে এবং পরে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে বৈঠক করেন, এসব বৈঠককে বলা হয় 'স্টেকহোল্ডার' মিটিং। এসবই হলো 'কোটা পূরণের আনুষ্ঠানিকতা'। এ প্রক্রিয়ায় কাজের কাজটি সারেন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান লবিস্টরা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর, শুল্ক হার বিষয়ে)। দাতাদের অর্থে পরিচালিত সংস্থারাও এই প্রক্রিয়ায় সোচ্চার থাকেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এ রকম: "কাউকে পেছনে রাখা যাবে না" (ঠিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals, SDG-এর মতো)।

এ তো গেল অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়সংবলিত 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' অর্থাৎ খসড়া বাজেট প্রণয়ন (প্রথম পর্ব—*ড্রিফ্ট রচনা পর্ব*) এবং তা জাতীয় সংসদে মঞ্চায়নের (দ্বিতীয় পর্ব—*মঞ্চায়ন পর্ব*) প্রক্রিয়া। এরপরে মাসখানেক ধরে সংসদে এ নিয়ে সংসদ সদস্যরা কথা বলেন (এ সময়কে বলা হয় 'বাজেট অধিবেশন')—বলেন নির্বাচনী এলাকার কথা থেকে শুরু করে কর-শুল্ক, বাজেটের ব্যয় খাত; তবে কিছু বিষয় আছে, যা নিয়ে তারা তাদের মনের কথা বলতে চান; কিন্তু 'স্পর্শকাতর' বিবেচনায় ওসব বিষয় এড়িয়ে যান। আর সংসদের বাইরে এসব নিয়ে টেলিভিশনে টক শো থেকে শুরু করে প্রেস কনফারেন্স, বক্তৃতা-বিবৃতি, বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চলতে থাকে। মওসুমটা অর্থনীতিবিদদের দাম ও ভাব বাড়ায়, ওয়াজ-নসিহতের ভর মওসুম। এসবই হয় রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক। দেশের ৮৭ হাজার ২২৩ গ্রামে এসব নিয়ে কী কথাবার্তা হয় শাসকগোষ্ঠীর এবং তাদের সহকর্মীদের তা জানার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। কারণ, বাজেট সম্পর্কে আমজনতার ধারণা তো তাদের জানাই আছে। বাজেট সম্পর্কে আমজনতার ধারণা নিয়ে শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহমর্মীদের ধারণা হলো: "জনগণ বাজেট ভয় পায়"; "জনগণ মনে করে বাজেট মানেই জিনিসপত্তরের দাম বাড়া, পরিবার-পরিজন নিয়ে কষ্ট বাড়া"; "জনগণকে যত দেয়া হবে, ওরা তত বেশি চাইবে, সুতরাং ওরা কী চাইলো না চাইলো ওসব দেখে লাভ নেই"; "জনগণের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ কম"।

ডাকিনীবিদ্যক পুঁজির মালিকদের 'স্বাধীন' গণমাধ্যম নিশ্চুপ থাকে না। ওরা কেউ কেউ "পাবলিক খায় মার্কা নিউজ" করার চেষ্টা করে। ওরা জনগণের বিভিন্ন অংশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তারা কেমন বাজেট চায়। শুধু সেসব উত্তরই সম্প্রচার করা হয় অথবা দর্শকদের দেখানো হয়—যার উত্তর ওদের আগেই জানা, তবে এসবে সিরিয়াস কোনো কিছু থাকলে বাজেট প্রণেতাদের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করে না। সিরিয়াস কোনো কিছু করলে সাংবাদিক বেশ বিপদগ্রস্ত হন (সম্মতি প্রক্রিয়াজাতকরণ গণমাধ্যম শিল্পে সেসব হওয়ারই কথা)। গণমাধ্যম অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের কাছে যায় খসড়া বাজেট পেশের মাসখানেক আগে যখন বাজেট ইতিমধ্যে প্রণীত হয়ে গেছে। গণমাধ্যমের কেউ কেউ সময় কাটানোর পথ হিসেবে অথবা "সবাই করছে, আমাদের না করলেই নয়"—এ জন্যই এসব করে। আবার বাজেটের মওসুমে মানুষ সম্ভবত একটু বেশি টেলিভিশনে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম দেখেন, যার সাথে আবার বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক আছে (গবেষণা করলে এর সত্যতা পাওয়া যাবে)।

নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার দর্শনের কাঠামোতে রেন্ট-সিকারদের স্বার্থ রক্ষায় প্রণীত সরকারের বার্ষিক (অর্থবছরের) বাজেট (সংবিধানের ভাষায় 'সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়সংবলিত একটি বিবৃতি—বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি') খসড়া বাজেট আকারে মহা তোড়জোরসহ ঘটা করে দু-চার ঘণ্টা ধরে জাতীয় সংসদে মঞ্চস্থ হয়। আগেই বলেছি মঞ্চায়ন পর্বটি যথেষ্ট দর্শনীয়—মোঘল আমলের কথা মনে করিয়ে দেবার মতো, সাথে থাকে পশ্চিমা ধাঁচ আর তার সাথে ধর্মের ছোঁয়া; সংসদ সদস্যরা বেশ কিছুটা অবসর কাটানোর মেজাজে থাকেন। রাষ্ট্রের আইনসভার প্রতিনিধি সংসদ সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত থাকেন দেশের সব গণমাধ্যম, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দূতাবাস প্রতিনিধি, ভিআইপি-সিআইপি। তবে *'মঞ্চায়ন পর্বে'* প্রজাতন্ত্রের মালিক—অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিনিধিত্বকারীরা খুব একটা আমন্ত্রণ পান না (যুক্তি দেখানো হয়—প্রজাতন্ত্রের মালিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তো থাকেন; ওখানে তারা কী করেন, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার)।

সংসদে মাসব্যাপী বাজেট অধিবেশনের পরে অর্থমন্ত্রী মহোদয় একটি বাজেট বিল আনবেন, যা টেবিল হাত চাপড়ে পাস হয়ে যাবে—তবে জনগণ জানতেই পারবেন না কয়েক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় যে খসড়া বাজেট পেশ হলো (এবং মাসব্যাপী যা নিয়ে বক্তৃতা হলো) আর যেটা দু-এক মিনিটেই টেবিলে হাত চাপড়ে চূড়ান্ত বাজেট বলে পাস হলো—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কী? যারা এসব জানেন, শেষপর্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। আর যারা বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পারদর্শী তাদের কোনো দুঃখবোধ থাকে না, কারণ তারা এসব পরিণতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত। এবারো হয়তো বা উপরে যা বললাম তাই-ই হবে। তবে কভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে যে মহামারি ও সংশ্লিষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে (যা অব্যাহত আছে, কত দিন থাকবে এবং অভিঘাত কত দূর গভীর ও ব্যাপক হবে তা কেউই জানেন না) আর এখন ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এসবের কারণে হয়তো বা একটু হলেও বাজেট সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। পরিবর্তনটা হতে পারে সম্ভবত রূপের—গুণের নয়।

অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়সংবলিত 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' অর্থাৎ বাজেট প্রণয়ন (*স্ক্রিপ্ট রচনা পর্ব*), উত্থাপন (*মঞ্চায়ন পর্ব*) ও চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া (প্রাক্-বাস্তবায়ন পর্ব অথবা *প্রাক্-ভোগ-দুর্ভোগ পর্ব*) নিয়ে যা বললাম তা থেকে জনমনে বেশকিছু প্রশ্ন জাগতে পারে: আমরাই কি আমাদের বাজেট প্রণয়ন করি? বাজেট কি অথবা বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ কি আমদানি করতেই হয়? বাজেটের কতটুকু অংশ আমরা প্রণয়ন করি? বাজেটে বিবৃত কর হার, শুল্ক হার, খাতওয়ারি ব্যয়-বরাদ্দ কে নির্ধারণ করে? কীভাবে কোন যুক্তি দিয়ে তা নির্ধারণ করা হয়? খসড়া বাজেটে উত্থাপিত বেশকিছু আমদানি পণ্যের শুল্ক হার এবং রপ্তানি কর হার চূড়ান্ত বাজেটে পরিবর্তিত হয়ে যায়—কেন, কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে? খসড়া বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অথবা খসড়া বাজেট থেকে চূড়ান্ত বাজেট উত্থাপন প্রক্রিয়ায় বেশকিছু স্বার্থগোষ্ঠীর এত দৌড়াদৌড়ি-ছোটাছুটি কেন করতে হয়? এ প্রক্রিয়ায় কেন কিছু ব্যক্তির, কোনো কোনো গোষ্ঠীর দাম বাড়ে? কী যুক্তিতে? কার লাভ তাতে। ক্ষতি কার? কেন সুনির্দিষ্টভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না অথবা বলা হয় না যে—কৃষি খাতসংশ্লিষ্ট বাজেটে উত্থাপিত অমুক অমুক বিষয় কৃষকসমাজের সাথে কথার ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছে; শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অমুক অমুক বিষয় শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলে ঠিক করা হয়েছে; স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট অমুক অমুক বিষয় চিকিৎসকসহ জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছে; আয়কর হার নির্ধারণ করা হয়েছে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত আর ধনীদের অমুক অমুক প্রতিনিধির বক্তব্য-ব্যাখ্যা শুনে; দেশের জননিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, দেশ রক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অমুক অমুক মানুষের (প্রতিনিধির) সাথে কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা জানি—এসব 'কেন'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু এর উত্তর তো দিতেই হবে। কারণ, যারা বাজেট প্রণয়ন করেছেন বা করেন বলে দাবি করেন, যারা তা উত্থাপন করেন, যারা "জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি" হিসেবে তা নিয়ে সংসদে বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা করেন—তাদের সবাই বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনেই দায়িত্ব পালন করা কথা—যে সংবিধানে 'সংবিধানের প্রাধান্য' (অর্থাৎ সংবিধানই সকল কিছুর উর্ধ্বে—'সুপ্রিম') নিয়ে যেসব কথা স্পষ্ট লেখা আছে তা হলো:

> "৭ (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*
>
> (২) *জণগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও মঞ্চায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এ রকম: ভবিষ্যতে বাজেট পেশ করার সময় বাজেট দলিলে সংযুক্তি হিসেবে একটি সারণি দিলে ভালো হয়, যেখানে উল্লেখ থাকবে বাজেটে সুনির্দিষ্ট আয় ও ব্যয় খাত-উপখাত নিয়ে সরকার যাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন তাদের পেশাসহ পরিচয়। এসব একদিকে যেমন বাজেটের

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বাজেটকে উদ্ধার করবে, তেমনি অন্যদিকে তা হবে 'সংবিধানের প্রাধান্য'কে সম্মানপূর্বক সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহির পরিচায়ক।

৫.৩ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প "জনগণতান্ত্রিক বাজেট": লক্ষ্য-অভীষ্ট ও কয়েকটি পদ্ধতিগত দিক প্রসঙ্গে

সমগ্র বিশ্ব এখন মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও কভিড-১৯ মহামন্দা রোগে বিধ্বস্ত। মহামারিতে লকডাউনের কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র সবকিছুই বিপর্যস্ত। আর ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমগ্র বিশ্ববাসীসহ আমাদের বিপর্যস্ততা ও অনিশ্চিয়তা গুণিতক হারে বাড়িয়েছে। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণভিত্তিক বিকল্প বাজেট সুনাগরিক সমাজসহ দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। কারণ অনিশ্চিত এই মহাবিপর্যয়ের সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণভিত্তিক আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হলো আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে করোনা-যুদ্ধ উদ্ভূত মহাবিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হবে সে সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট। সেই কারণেই এই বাজেটের **লক্ষ্য-অভীষ্ট** (Goals) এবং **বাজেট প্রণয়ন** পদ্ধতি উভয়ই প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক বাজেটের তুলনায় ভিন্ন হবে—এটাই স্বাভাবিক। এসব কারণেই অন্ততপক্ষে দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে বলা দরকার: (১) আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট (Goals) কী? (২) ওই বাজেট প্রণয়নে আমরা কোন পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology) অনুসরণ করেছি? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

প্রথম: **<u>আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট (Goals)</u>। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের মূল লক্ষ্য-অভীষ্টসমূহ হচ্ছে আগামী ১০ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ২০৩২ সাল নাগাদ)**—

১) **দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে (৭০%-৮০%) একটি আলোকিত-শক্তিশালী-টেকসই মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তর করা (transformation towards an enlightened-stable mid-middle class)** (দেখুন, ছক-১),

২) **দেশে বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য সম্ভাব্য-সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা** (দেখুন, ছক-১),

৩) পরজীবী-লুটেরা ধনীক শ্রেণির সম্পদের যৌক্তিক অংশ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কাছে প্রবাহিত করা (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.২২, ৫.৪, ৫.৭),

৪) অভ্যন্তরীণ (দেশজ) অর্থনীতির (domestic economy) উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.৫-৪.২১, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৬),

৫) অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মধ্যে কৃষিকে (কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.১১-৪.১৩, ৫.৬),

৬) মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চারিত আলোকিত করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা (তা অব্যাহত রাখা), যেখানে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, নিরাপত্তা-সুরক্ষা—সবই হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.২, ৪.৩, ৪.১৪-৪.১৫, ৫.৬),

৭) মানুষের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা (দেখুন, অধ্যায় ৪, ৫)।

দ্বিতীয়: আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট বিনির্মাণের পদ্ধতিগত (Methodological) বিষয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় বইপুস্তকে বাজেট প্রণয়নের যে পদ্ধতি বলা হয় আমাদেরটা এসবের উল্টো। প্রচলিত প্রথায় বাজেট প্রণয়েনের কাজ শুরু হয় "কত টাকাপয়সা আছে" তা দিয়ে (যাকে বলা হয় "resource envelope") অর্থাৎ বাজেট প্রণয়ন শুরুই হয় "টাকাপয়সাকে" মূল অবজেক্ট অথবা লক্ষ্য-অভীষ্ট ধরে নিয়ে। আমরা মনে করি—"শোভন সমাজ বিনির্মাণে"— এই পদ্ধতির শুরুটাই ভ্রান্ত চিন্তাভিত্তিক। এর বিপরীতে আমাদের বাজেট প্রণয়ন কর্মকাণ্ডের শুরুটাই হচ্ছে "কত টাকাপয়সা আছে" দিয়ে নয়, শোভন জীবন বিনির্মাণে দেশের মানুষের জন্য "কী কী প্রয়োজন তা দিয়ে" ("envelope of things to do" অথবা "envelope of things need to be done")—অর্থাৎ সংবিধান প্রতিশ্রুত প্রজাতন্ত্রের মালিক "জনগণের চাহিদা" দিয়ে। আমাদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরু যে "envelope of things to do" দিয়ে তার মধ্যে যা যা আছে তা উপরোল্লিখিত বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—এসবের মধ্যে প্রধান মৌল হলো মানুষের স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কাজ, বিশ্রাম-বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে মানুষের সমগ্র জীবনকে সুস্থ-সৃজনশীল বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই। আমাদের কাছে "কত টাকাপয়সা আছে" (resource envelope) তা কোনো অর্থেই অবজেক্ট বা অভীষ্ট বস্তু নয়, তা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র। আমাদের বাজেট বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় আমরা প্রথমেই দেশের মানুষের উপরোল্লিখিত প্রয়োজন-চাহিদাসমূহ নিরূপণ করেছি। "জনগণের চাহিদা" নিরুপণে আমরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা সাহিত্য, তথ্যভাণ্ডার, জনমত (public opinion)—এসব বিবেচনা করেছি। যেহেতু চাহিদা অসীম, সেহেতু এসবের

অগ্রাধিকারক্রম (prioritization) নিরূপণ করতে হয়েছে । এ প্রক্রিয়ায় আমরা দেশের সব বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শসভা করেছি (পরিশিষ্ট ২-এসব বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। আমরা দেখেছি যে জন-চাহিদা মেটানো এক বাজেটের কাজ নয়; আর এ কারণেই আমাদের বাজেট প্রস্তাবে অনেক কিছুই দেখা যাবে, যা ৫-১০ বছরব্যাপী করতেই হবে (যদিও বাজেট মাত্র একবছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়)। আর "মানুষের কী কী প্রয়োজন" সেসব নিরূপণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনার পরেই আমরা খুঁজেছি "টাকাপয়সা"। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় সমীকরণটা হলো একদিকে মানুষের জীবনকুশলতা-জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যের বিষয়াদি ("envelope of things to do") আর অন্যদিকে এইসব বস্তুবায়নে প্রয়োজনীয় "টাকাপয়সা" ("envelope of resources")। এই সমীকরণে হিসেবপত্তর করার সময় ভারসাম্যকরণ (যাকে বলা হয় "budget balancing") প্রশ্ন এসেছে। আর তা করতে গিয়ে কখনও নির্দিষ্ট কোনো জন-প্রয়োজন কাটছাঁট করতে হয়েছে, আবার কখনও সম্পদের উৎস নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। এসব হিসেবপত্তর করতে হয়েছে ততক্ষণ, যতক্ষণ না হিসেবের ভারসাম্য তৈরি করা গেছে। এসব হিসেবপত্তর করার সময় আমরা তিনটি বিষয় মাথায় রেখেছি: (১) জনস্বার্থ-জন-প্রয়োজন এবং তা মেটাতে অর্থ-সম্পদের উৎসসমূহ; (২) জনস্বার্থ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা-ভাবনা—যেমন দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত, সুদ হার (interest rate), মূল্যস্ফীতি, কর্মনিয়োজন হার ইত্যাদি; (৩) এসব জটিল সমীকরণ সমাধানে আমরা বাজেট ব্যালেন্স অথবা অর্থনীতি ব্যালেন্স করাকে গুরুত্বহীন মনে করিনি—তবে অগ্রাধিকার দিয়েছি সামাজিক ব্যালেন্সের বিষয়াদি।

"বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব" শিরোনামে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট যৌক্তিক কারণেই কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে মৌলিক এবং গতানুগতিক নয়। আর সে কারণেই আপাতত বেশকিছু বিষয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শগত কারণেও প্রস্তাবিত 'বিকল্প বাজেট' এর কোনো কোনো (সম্ভবত বেশির ভাগ) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রস্তাব নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ, আগেই বলেছি যে—আমরা আর্থসামাজিক উন্নয়নে "মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য-মুক্তকর্মপ্রচেষ্টা-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা"ভিত্তিক নব্য-উদারবাদী মতবাদ (যা আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির স্বার্থবাহী সাম্রাজ্যবাদসহ দাতাগোষ্ঠী আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে) বাতিল ঘোষণাপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-উদ্ভূত আমাদের সংবিধানের মৌল বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো গ্রহণ করেছি।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়, অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া নয়—"প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি।

'বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩' উত্থাপনের আগে এ কথাও বলে রাখা দরকার যে—দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো এবং নীতি-নির্ধারণে শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণিস্বার্থ আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থা' দর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত বাজেট-দর্শন গ্রহণে কুণ্ঠিত বোধ করবে। এত কিছুর পরেও কভিড-১৯ মহামারিতে মহাবিপর্যস্ত এবং ইউরোপে যুদ্ধের দামামার অভিঘাত—এ ধরনের অনিশ্চিত সময়ে আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করছি নিদেনপক্ষে এ কারণেও যে আমরা বোঝাতে চাই—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক সব বিচারেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বোঝাতে চাই যে বৈশ্বিক মহামারি-বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এটা হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো সেসবের ভিত্তিতে "বিকল্প বাজেট" প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর আমরা বিশেষ জোর দেওয়ার ও অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভেবেছি, তা বাজেটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি (যা তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪টি নীতিগত অবস্থান বা মৌল বিধানে বলেছি)। আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত 'বিকল্প বাজেট'-এ আমরা যেসব পদ্ধতিগত অনুসিদ্ধান্ত ও ভাবনা-ভিত্তি প্রয়োগ করেছি তা নিম্নরূপ:

> *উল্লেখ্য, জাতীয় বাজেটকে আমরা প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের "অন্যতম" পথনির্দেশক দলিল মনে করি।* 'অন্যতম' এ জন্য যে সরকারের বার্ষিক বাজেট মূলত তার আগামী এক অর্থবছরের আর্থিক নীতি বা ফিসক্যাল পলিসির (রাজস্ব/ আয় ও পণ্য ও সেবাক্রয় সেইসাথে সামাজিক সুরক্ষা/ নিরাপত্তাবেষ্টনীর ব্যয়) খতিয়ান। উল্লেখ্য, আর্থিক নীতির বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমষ্টি আছে, যা বাজেটে কিছুটা প্রতিফলিত হলেও সরাসরি বাজেটের বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। আর দেশের মুদ্রা নীতি বা মনিটারি পলিসি প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক), যার মূল দায়িত্ব হলো প্রধানত মুদ্রা নীতি বিবেচনায় রেখে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা (মূলত সুদের হার নির্ধারণের মাধ্যমে) এবং টাকা ছাপানো। সরকারের আর্থিক নীতি (যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাধীন) এবং মুদ্রা নীতি (যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বাধীন)—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। আর আর্থিক মন্দা ও কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণে এ সমন্বয় এবং ভারসাম্যায়ন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবে রেন্ট-সিকারদের "ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন"নিয়ন্ত্রিত (Zombie corporation, অর্থাৎ যারা সস্তায় ঋণের পরে ঋণ নিতে থাকবে, কিন্তু ফেরত দেবে না) আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ ভারসাম্যটা হয় রেন্ট-সিকারদের স্বার্থের অনুকূলে সাধারণ মানুষের প্রতিকূলে। এসব কথা বলার যুক্তিসংগত কারণ এ রকম: সরকারের আর্থিক নীতি এমন হবে—যখন অবিবেচক-ডাকিনীবিদ্যক-রেন্টসিকিং কর্পোরেশনদের হাতে ঋণ পৌঁছে যাবে—ওরা কখনও তা ফেরত দেবে না; আর মুদ্রা নীতির প্রণেতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন মুদ্রা নীতি বানাবে,

> যখন ওদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থের জোগান হয়ে যাবে। এসবের ফলে ভবিষ্যতে মন্দা-মহামন্দা হবে—আর এসবে আর্থিক নীতি ও মুদ্রা নীতি প্রণেতাদের কারো কিছু যায়-আসে না (ওরা তো রেন্ট-সিকার ডাকিনীবিদ্যকদের চাকুরে)।

কভিড-১৯-এর মহামারির বিপর্যয় থেকে মুক্তি এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে **আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য যে বিকল্প জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব করছি, তার মোট আকার (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা—যা চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবকৃত বাজেটের তুলনায় ৩.৪০ গুণ বেশি (সারণি ৫ দেখুন)**। চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) সরকারের মোট বাজেট ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা।

আমরা অনুমান করি যে আমাদের প্রস্তাবিত বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট নিয়ে বেশ কথাবার্তা-সংশয়-সন্দেহ হতে পারে। তবে যুক্তি থাকলে আমাদের প্রস্তাব বর্জন করার কোনোই কারণ নেই। কারণ নেই এ কারণেও যে আমরা অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর অভিঘাত এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ঋণাত্মক সবধরনের সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবিলা করে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের কথা বলছি।

৫.৪ বিকল্প বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়?

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমরা যে বিকল্প বাজেট উপস্থাপন করছি তা 'জনগণতান্ত্রিক বাজেট'—কভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত মহাবিপর্যয়কালীন বাজেট, উত্তরণের বাজেট, রূপান্তরের বাজেট, সম্ভাব্য গভীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার বাজেট, মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল শক্তির স্ফূরণের বাজেট। আর এই বিকল্প বাজেট আমরা উপস্থাপন করছি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংসদে প্রস্তাব আকারে যেদিন খসড়া বাজেট উপস্থাপন করবেন (আমাদের জানামতে, ৯ জুন ২০২২) তার ১৮ দিন আগে। সরকার আসন্ন বাজেটে হুবহু কী বলবেন, তা আমরা জানি না। অতীতের মতো এবারও আমরা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ আমাদের বিকল্প বাজেট ভাবনার মূল বিষয়াদি সরকারের কাছে লিখিতভাবে উপস্থাপন করেছি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া আছে)। আর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেহেতু বাজেট পেশ করবেন আরো ১৮ দিন পরে এবং যেহেতু তা ১ মাস ধরে সংসদে আলাপ-আলোচনার পরে চূড়ান্ত হবে, সেহেতু সরকার চাইলে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক সুপারিশাদি দেখে-শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ পাবেন। এখানে আরো বলা প্রয়োজন যে—যেহেতু আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের সরকারপ্রণীত বাজেট সম্পর্কে আমরা এখনও তেমন কিছুই জানি না, সেহেতু ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলনা করা হবে সরকারের চলমান অর্থবছরের অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের সাথে।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমরা যে বাজেট প্রস্তাব করছি, তাতে ইতিপূর্বে উল্লেখিত বেশকিছু মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হবে। **আমাদের প্রস্তাবিত ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকার বিকল্প বাজেটের অন্যতম প্রধান পরিবর্তন সূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:**

(১) **আমাদের বাজেটের আকার ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা**, যা জিডিপির ৬৭.৯১ শতাংশের সমপরিমাণ (চলতি বাজারমূল্যে ২০২১-২২ সালের জিডিপির আকার ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা)। **চলমান অর্থবছরের ২০২১-২২ সরকারের বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৩.৪ গুণ বড় (সারণি ৫, ৮, ও ৯ দেখুন)**। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হলো দ্রুত সম্প্রসারণশীল বৃহদায়তন বাজেট। কারণ হিসেবে আমরা আগেই বলেছি— সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যকর অভিঘাত এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য ঋণাত্মক অভিঘাত মোকাবিলা করে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট যুক্তিসংগত এবং তা দেশের মানুষের এবং অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তিবিচারেও যৌক্তিক।

(২) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় থেকে আসবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বাজেট বরাদ্দের ৯১.২২ শতাংশের জোগান দেবে সরকারের রাজস্ব আয়** (সারণি ৮)। আর বাজেটের বাকি ৮.৭ শতাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়নে জোগান দেবে সম্মিলিতভাবে বন্ড বাজার (মোট ১ লক্ষ কোটি টাকা; অর্থাৎ ঘাটতি অর্থায়নের ৫৫.৫৬ শতাংশ), সঞ্চয়পত্র বিক্রয় থেকে ঋণ গ্রহণ (মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা; ঘাটতি অর্থায়নের ২৭.৭৮ শতাংশ), এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব (মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা, যেখান থেকে আসবে ঘাটতি অর্থায়নের ১৬.৬৭ শতাংশ)। তবে **আমাদের প্রস্তাবে ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণ নিট-এর কোনো ভূমিকা থাকবে না, যা চলতি অর্থবছরের সরকারি বাজেটে ঘাটতি পূরণে ৪৬.৩৭ শতাংশ ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ আমাদের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা বৈদেশিক ঋণের দ্বারস্থ হতে চাই না। আবার একই সাথে বাজেটের ঘাটতি পূরণে আমরা দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব রাখিনি; কারণ, দেশীয় ব্যাংকের ঋণ অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে।** সরকারের চলতি বাজেটে ঘাটতি পূরণে দেশীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার কথা মোট ঘাটতির ৩৬.২ শতাংশ।

(৩) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট রাজস্ব থেকে আয় হবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যা সরকার চলমান অর্থবছরের (২০২১-২২) জন্য যে প্রস্তাব করেছিল তার চেয়ে ৪.৭৬ গুণ বেশি (সারণি ৬); আর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যা চলমান বছরের সরকারি বাজেটের তুলনায় ৩.৪ গুণ বেশি (সারণি ৫)।**

(৪) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট অর্থায়নে কোনো বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হবে না। সুদাসলসহ বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে আমাদের অবস্থান। আর কভিড-১৯-**

এর মহাবিপর্যয়সহ যুদ্ধের অভিঘাত মোকাবিলায় যদি কোনো অনুকূল শর্তে বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তির পথ থেকে থাকে, সে বিষয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে সম্মানজনক অবস্থান বজায় রেখে আলাপ-আলোচনার পক্ষে। আমরা বুঝতে চাই—**যেসব ঋণ আমাদের নামে ওদের ঋণ হিসাবের খাতায় লেখা আছে, তার কোনটা আমরা চেয়েছিলাম আর কোনটা না চাইতেই পেয়েছিলাম। আমরা স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার স্বার্থে অতীত সব ঋণের হিসেবপত্তরের মিটমাট করতে চাই।** যেমন ধরুন, আমরা কারো কাছে যদি ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে থাকি, আর ইতিমধ্যে তা পরিশোধ করার পরেও ৫০ কোটি টাকার ঋণী হয়ে থাকি, তা মওকুফ নিয়ে আমরা আন্তরিকভাবে আলোচনা করতে ইচ্ছুক; অথবা টাকার সাথে মার্কিন ডলারের তথাকথিত বিনিময় মূল্যের (exchange rate) কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ওরা উপকৃত হয়ে থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সমস্যার সুরাহা করতে ইচ্ছুক (**এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭০ সাল থেকে মার্কিন ডলারের মান কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হয়েছে**)। বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট—আমরা নীতিগতভাবেই ঋণ করে ঘি খাওয়ার বিপক্ষে (এর মধ্যে কোনো জাতীয়তাবাদ নেই, নেই মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা)। আমরা জানি যে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং লুটেরা পুঁজির ঋণ যেকোনো দেশে তাদেরই অধীনস্থ লুটেরা গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা জোরদারে সহায়ক হতে বাধ্য। **আমরা মনে করি, শোভন সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট চেতনার অর্থমন্ত্রকের যোগ্যতা ও দক্ষতার মানদণ্ড হবে তিনি/ তারা দেশজ সম্পদ দিয়ে (বৈশ্বিক সার্বভৌম তহবিল ও বৈশ্বিক সম্পদ তহবিলসহ) এবং বৈদেশিক ঋণ না নিয়ে কত দূর মানবপ্রগতি নিশ্চিত করতে পারেন সেই সক্ষমতার ওপর।**

(৫) **আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কাঠামোতে গুণগত রূপান্তর ঘটবে। মোট বরাদ্দে এবং আনুপাতিক বরাদ্দে উন্নয়ন বাজেট হবে পরিচালন বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি, যা এখন ঠিক উল্টো। এখন উন্নয়ন-পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত ৩৯:৬১, যা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে হবে ৬৬:৩৪ (সারণি ৫ ও ১০)। আমাদের প্রস্তাবনায় উন্নয়ন বরাদ্দ চলমান সরকারি বাজেটের তুলনায় ৫.৭৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকায় উন্নীত হবে, আর পরিচালন বরাদ্দ (যার ৮০-৮৫% বেতন-ভাতা) এখনকার তুলনায় ১.৮৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকায় উন্নীত হবে (সারণি ৫)। আমাদের প্রস্তাবনায় পরিচালন বাজেট বরাদ্দ যে এখনকার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে, তার প্রধান কারণ—আমরা ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যৌক্তিক মনে করি, যেখানে বেতন-ভাতা ও সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পরিচালন বাজেটভুক্ত।** এ বরাদ্দ বৃদ্ধির আরো একটা বড় কারণ হলো—সরকারি বাজেট সংজ্ঞায় এখন অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ভর্তুকি ও প্রণোদনা পরিচালন ব্যয়ভুক্ত। আমরা মনে করি ভর্তুকি, প্রণোদনা, অপ্রত্যাশিত ব্যয়-বরাদ্দ পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা ভ্রান্ত এবং তা করা হয় অপ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এসবই যুক্তিগতভাবে উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দের অংশ হওয়া উচিত। আমরা সেটাই করার পক্ষে। আর সেক্ষেত্রে সরকারের এখনকার বাজেটের আকার ঠিক রাখলেও উন্নয়ন বরাদ্দ এখনকার তুলনায় বেশ কিছুটা বাড়বে।

(৬) আমাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাজেটের আয় কাঠামোতে মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটবে। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) হবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৭৭ শতাংশ হবে প্রত্যক্ষ কর এবং ২৩ শতাংশ হবে পরোক্ষ কর (সারণি ৮, ৯, ১০)। কাঠামোগত এই পরিবর্তনটি মৌলিক। কারণ, সরকার-প্রস্তাবিত চলমান অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের (প্রাপ্তির) ৪৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর এবং ৫৪ শতাংশ পরোক্ষ কর। **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের আয় কাঠামোতে যেহেতু ধনী ও সম্পদশালীদের ওপর কর (নতুন নতুন করসহ) অতীতের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে যেহেতু ব্যয় কাঠামো হবে প্রগতিমুখী, সেহেতু বিকল্প বাজেট বাস্তবায়ন করলে তা যৌক্তিক কারণেই সমাজে আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সামাজিক-বৈষম্য ও ক্রমবর্ধমান অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং, আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটকে "বৈষম্য হ্রাসকারী শোভন সমাজব্যবস্থা-উদ্দিষ্ট জনগণতান্ত্রিক উন্নয়নদর্শন" হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত।**

৫.৫ বিকল্প বাজেট নিয়ে সম্ভাব্য সংশয়বাদী ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাত্র একবছরের বাজেট—২০২২-২৩ অর্থবছরের। প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের আকার (টাকার অংকে) চলমান বাজেটের আকারের তুলনায় ৩.৪ গুণ বেশি। আমাদের প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটের আকার ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যেখানে চলমান অর্থবছরের (২০২১-২২) সরকারি বাজেটের আকার ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (সারণি ৫ দেখুন)। আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে—কেউ কেউ বলবেন—যা ওদের মালিকানাধীন টেলিভিশন, রেডিও, পত্রপত্রিকা, অন্যান্য অনেক যোগাযোগ-প্রচার-সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হবে—"বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট উদ্ভট, অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত"। এ নিয়ে সংশয়ও থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিনীত প্রস্তাব হবে নিম্নরূপ:

> আপনারা যারা চ্যালেঞ্জ করবেন (তাদের অনুগত অর্থনীতিশাস্ত্রীক ও সুশীল সমাজের টেলিব্যক্তিত্বদেরসহ) তারা অনুগ্রহ করে আমাদের বিকল্প বাজেটটি এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের সামনে উত্থাপন করে বিকল্প বাজেটের আকার থেকে শুরু করে প্রতিটি আয় খাত ও ব্যয়-বরাদ্দ খাত সম্পর্কে তাদের (জনগণের) প্রশ্ন-সংশয়-দ্বিধা-সিদ্ধান্ত-সম্মতি-অসম্মতিসহ মতামত নিন; জানুন তাদের ভাবনা ও সুপারিশ (এসব মনে করার যুক্তিসংগত কোনো কারণই নেই যে বাজেট প্রণয়ন-উদ্দিষ্ট ভাবনাটা 'বিশেষজ্ঞ'দের একচেটিয়া সম্পত্তি)। দেশের ১৭ কোটি মানুষের সম্মতি নিতেই হবে এ জন্য যে আমাদের পবিত্র সংবিধানমতে তারা প্রজাতন্ত্রের মালিক—আমি-আপনি প্রত্যেকে ব্যক্তি হিসেবে মালিকদের মাত্র একজন। তবে আমি-আপনি রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা গোষ্ঠীর কেউ হলে দেশের মালিক হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হব—সেটাও সংবিধানের বিধান অনুযায়ীই, যেখানে স্পষ্ট লেখা: *"রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ*

হইবেন না" [দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২০ (২)]। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী দলিল—রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ে জনগণের সম্মতি (people's consent) নেওয়া যে গণতান্ত্রিক সমাজে বাধ্যতামূলক এবং তা আমাদের সংবিধান অনুযায়ী পুরোপুরি বাধ্যতামূলক—আশা করি এ নিয়ে কেউ-ই অমূলক-অযৌক্তিক বিতর্ক করবেন না। অযথা এ বিতর্কে অবতীর্ণ হলে একদিকে জনগণের কাছে পরাজিত হবেন—মহা পরাজয় বরণ করবেন; আর তার চেয়েও মারাত্মক যে বিপদে পড়বেন তা হলো, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'-এর মূল চেতনার বিরুদ্ধে চলে যাবেন (বুঝুন তাহলে কী অবস্থা হবে আপনার!)। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন করার আগে দয়া করে আমাদের বিকল্প বাজেটটি দেশের আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে জাতীয়ভাবে ভোট গ্রহণ করুন (ভোটারের বয়স আপনারাই নির্ধারণ করুন; আমরা হাইস্কুলপড়ুয়া বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে)—আপনারা ভোট বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী; প্রয়োজনে দেশের বিশাল যুব গোষ্ঠীর সহায়তা নিন; প্রয়োজনে জাতীয় ও এলাকাভিত্তিক কনভেনশন করুন; প্রয়োজনে সব পেশাজীবী সংগঠনকে ডাকুন; প্রয়োজনে আমাদেরও ডাকুন আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর অবাধ ও সুষ্ঠু সেই ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতেই জাতীয় বাজেট—'সরকারের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' (সংবিধান বাজেটকে এই সুন্দর নামটি দিয়েছে) প্রণয়ন করুন (প্রণয়নের এই পর্বে সত্যিকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক রাখুন)। এতসব পর্ব পেরুলে দেখবেন যে আমরা যে বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি তার চেয়ে জনগণের সম্মতিভিত্তিক বাজেট (একই সময়কালের জন্য) হবে কমপক্ষে দ্বিগুণ বড়, আর আয়ের বাজেট হবে আমাদের প্রস্তাবের 'সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি'র তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বড়—সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিনির্মিত জনসম্মতিভিত্তিক বাজেটের আনুমানিক আকার হবে ৪১ লক্ষ ৭২ কোটি টাকা, আর আয়ের **বাজেটের আনুমানিক আকার হবে ৫১ লক্ষ ১০ হাজার ১০৮ কোটি টাকা অর্থাৎ বাজেটে এখন যেখানে ঘাটতি হয়, সেখানে উদ্বৃত্ত হবে ১০ লক্ষ ১০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা।** কেন এমন হবে? এ প্রশ্নের সদুত্তর বাজেট নিয়ে জনসম্মতিভিত্তিক ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে (আর তার আগে জনসম্মুখে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের দাওয়াত কবুল করুন)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট ব্যয় ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, মোট আয় ("রাজস্ব প্রাপ্তি") ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা কেন যুক্তিসংগত? আমরা ইতিমধ্যে প্রযোজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই এসব বিষয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। তবে প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে টাকা-পয়সার অংক নিয়ে কথা বলার আগে কয়েকটি কথা স্মরণ করা যুক্তিসংগত হবে। আর সেসব স্মরণ করার আগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের অর্থনীতি সমিতির বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচিতি (এটা আমাদের কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, নীতিগত ব্যাপার এবং দেশের মানুষের তা জানার অধিকার আছে অথবা আমাদের সেটা জানানোর দায়দায়িত্ব আছে) বলে রাখা প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে বোঝা যাবে না কেন আমরা এসব বলছি। আমরা আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতি 'বিজ্ঞানের' (?) ছাত্র, তবে ওই বিজ্ঞানের অনেক কিছুই গ্রহণের কোনো যুক্তি দেখি না। যেমন অর্থনীতিশাস্ত্র যখন বলে যে 'ক' হলে 'খ'-এর অবস্থা এমন হবে, তা হলে 'গ'-এর পরিবর্তন হবে—এ রকম; আর সেক্ষেত্রে 'ঘ'-এর ওপর অভিঘাত হবে এখনকার চেয়ে

ভিন্নতর, আর 'ঘ'-এর অবস্থা সে রকম হলে 'ঙ'-এর পরিণতি হবে খুবই শোচনীয়; আর 'ঙ'-এর পরিণতি ও রকম হলে 'গ'-এর এক-একক বৃদ্ধি বা হ্রাস হবে শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার—আর সেক্ষেত্রে 'ক' আর 'খ'-এর যে কী হবে—তা আল্লাহই জানেন (তা হলে আপনি কী জানেন? কী বলতে চান? না-কি এটাই অর্থনীতিশাস্ত্র?)—এ ধরনের যুক্তিতে আমাদের বিশ্বাস নেই; কারণ, তা কোনো ধরনের কার্যকরণ সূত্রের অর্থাৎ causation-এর মধ্যে পড়ে না। যুক্তিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই এসব যুক্তির শাস্ত্রীয় ভদ্র কোনো নাম আছে—এসবের যৌক্তিক নাম হতে পারে 'জগাখিচুড়িবাদ', "হ-য-ব-র-লবাদ" অথবা সবচেয়ে সঠিক নামকরণ হতে পারে 'ভণ্ডবাদ' (কারো মনঃকষ্ট হলে ক্ষমাসুলভ চোখে দেখবেন!)।

আমরা জানি ও বুঝি যে সংশয়-সন্দেহবাদীরা আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনার অনেক কিছুই নিয়েই প্রশ্ন তুলবেন—সংশয় প্রকাশ করবেন। তবে সম্ভবত তাদের প্রশ্নের বেশির ভাগই হবে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের বড় অংকের টাকাপয়সার সম্ভাব্য উৎসকেন্দ্রিক। উদাহরণসহ বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) আমরা বলছি যে আগামী অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হলে সরকারকে রাজস্ব আয় করতে হবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা (সারণি ৮)। কোথা থেকে 'এত টাকা' আসবে? এটাই বিরুদ্ধবাদীদের মূল প্রশ্ন (যে প্রশ্ন সাংবাদিকেরা আমাদের করেন)। এখন তাহলে বিরুদ্ধবাদী ও সংশয়বাদীরা কান পেতে শুনুন 'এত টাকা' (!) কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে যে—আমাদের দেশে ঘুষ-দুর্নীতি আছে, চোরাচালান আছে, অর্থ পাচার আছে, যত ধরনের কর আছে (যেমন আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক)—সবকিছুতেই ফাঁকি আছে—বড় মাপের ফাঁকি। এসবই হলো কালোটাকার (Black money) উৎস।

বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলেও সম্মানিত সংশয়বাদী ও বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলার প্রয়োজনে বোধ করছি যে সরকারের বর্ধিত আয়ের উৎস সম্পর্কে আপনাদের যতই সন্দেহ-সংশয় থাকুক না কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এসব নিয়ে একদিকে যেমন সন্দেহ সংশয় নেই, আর অন্যদিকে রেন্টসিকার-সম্পদশালী কালোটাকার মালিকদের (অবশ্য অর্থমন্ত্রীসহ 'উনারা' এ শব্দটি ব্যবহার করেন না—বলেন 'অপ্রদর্শিত আয়') স্বার্থ রক্ষা না করে পারবেন না। তাহলে শুনুন বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী এসব বিষয়ে কী বলেছেন:[৬]

"'সমতা ও ন্যায্যতা' শীর্ষক প্যারাগ্রাফে (অনুচ্ছেদ ২২১) তিনি সত্য গোপন করতে না পেরে ফটাস্ করে বলে ফেলেন, 'বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই। ... আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না। ফলে প্রদেয় আয়কর কম হওয়ায় তাদের তেমন কোনো সারচার্জও প্রদান করতে হয় না'। তবে এসব সত্যভাষ্যের

[৬] দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯গ), সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ– সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের : বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০, পৃ. ৮০-৮১।

ঠিক এক প্যারাগ্রাফ আগে *'কোম্পানি কর হার'* শীর্ষক ২২০ নম্বর অনুচ্ছেদে সম্পদশালী-বিত্তশালীদের অন্যায়-অন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় তিনি বলেছেন, *'আমাদের দেশে বর্তমানে কার্যকর করপোরেট কর হার ৫ শতাংশ-এর কম। এ ছাড়া গত অর্থবছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করপোরেট কর হার ২.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এতে এই খাত থেকে করপোরেট কর আদায় যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় করপোরেট কর হারের বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি'*। 'বিত্তশালীদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না'—এ বক্তব্যের ঠিক এক প্যারাগ্রাফ পরেই *'প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা এবং ব্যবসায় পরিচালনা সহজীকরণ'* শীর্ষক ২২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রীকে কালোটাকার মালিকদের পক্ষাবলম্বন করে (প্রতিপক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়) বলতে হয়েছে, *'বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে শিল্প স্থাপনে প্রদর্শিত আয় থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর ১০% হারে কর প্রদান করা হলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না– এ সংক্রান্ত একটি বিধান আয়কর অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। বিদ্যমান আইনে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান হলে ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্টের ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ হতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় না। তবে এই হারটি অত্যাধিক হওয়ায় করদাতাগণ খুব একটা সাড়া দিচ্ছেন না। ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগ স্বপ্রণোদিতভাবে আয়কর নথিতে প্রদর্শনে করদাতাগণকে আরও আগ্রহী করার জন্য এ-সংক্রান্ত বিদ্যমান কর হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি এ হ্রাসকৃত কর হারের সুযোগ নিয়ে করদাতাগণ ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে তাদের অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ অতিদ্রুত আয়কর নথিতে প্রদর্শন করবেন এবং স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে করের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবেন'"*।

আমাদের হিসাবে দেশে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সৃষ্ট মোট কালোটাকার পরিমাণ কমপক্ষে ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা; আর বিগত ৪৮ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত) দেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার পরিমাণ কমপক্ষে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (সারণি ৩)। এর সাথে আছে জামায়াত-জঙ্গিদের মৌলবাদের অর্থনীতি, যে অর্থনীতি গত ২০১৯ সালে **নিট অবৈধ মুনাফা করেছে আনুমানিক ৪ হাজার ২৬২ কোটি টাকা** (এর বাইরে আছে ওদের সমর্থকদের, এমনকি অসমর্থনকারী যারা ওদের পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তাদের 'ইয়ানত' বা বেতন থেকে কেটে নেওয়া বাধ্যতামূলক চাঁদা), **আর 'মৌলবাদের অর্থনীতি' বিগত ৪০ বছরে পুঞ্জীভূত মোট অবৈধ নিট মুনাফা করেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি**। তাহলে গত বছরে সৃষ্ট অবৈধ কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (কালোটাকা ৮,৪১,৪১৯ কোটি টাকার সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির অবৈধ নিট মুনাফা ৪,২৬২ কোটি টাকা যোগ করলে)। আর **কালোটাকার বিগত ৪৮ বছর (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর**

পর্যন্ত) এবং মৌলবাদের অর্থনীতির বিগত ৪০ বছরের নিট অবৈধ মুনাফা যোগ করলে পুঞ্জীভূত কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (পুঞ্জীভূত কালোটাকা ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকার সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির পুঞ্জীভূত অবৈধ নিট মুনাফা কমপক্ষে ৩ লক্ষ কোটি টাকা যোগ করলে)। তাহলে হিসেবপত্তর দেখাচ্ছে যে—দেশে বিগত ৪০-৪৫ বছরে পুঞ্জীভূত মোট কালোটাকার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। সরকার তো 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি' (Zero tolerance to corruption) ঘোষণা করেছেন; বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা তো জন্মগ্রহণ করেছে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে; ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তো হয়েছিল বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে; সংবিধান তো স্পষ্ট বলছে—'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অসাম্য বিলোপে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন করার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র' [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)], 'কোন ব্যক্তি যেন অনুপার্জিত আয় ভোগে সমর্থ না হন– সে দায়িত্বও রাষ্ট্রের' [অনুচ্ছেদ ২০ (২)]—তাহলে বিগত চার দশকে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত (কমপক্ষে) ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা কেন উদ্ধার করা হবে না? কেন তা সুদাসলে উদ্ধার করা হবে না? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ (যারা প্রজাতন্ত্রের মালিক) তো বলবেন উদ্ধার হওয়া উচিত ১০০ শতাংশ। কিন্তু 'কালোওয়ালারা' দেবেন না—তারা জান দেবেন তো মান দেবেন না।

এখন ধরুন হারানোর ভয়ে ভীত-দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ[৭] হিসেবে আমি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের (অর্থাৎ জনগণের, যারা প্রজাতন্ত্রের মালিক) বিপক্ষে

---

[৭] ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৮ কোটি (মোট জনসংখ্যার ৫০%)। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিত্তের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত: নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত। দেশে এখন (কভিড-১৯ লকডাউনপরবর্তী সময়ে) নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ২৩%), মধ্য-মধ্যবিত্ত ২ কোটি ৩৮ লক্ষ (১৪%), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত ২ কোটি ২১ লক্ষ (১৩%) (দেখুন, উপ-অধ্যায় ৮.৫, সারণি ২)। মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা অনেক– না পারে এদিকে, না পারে ওদিকে। বিত্তের মাঝামাঝি অবস্থান হলে বিত্ত হারানোর ভয় থাকে, আর বিত্ত হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়ত আপোস করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এসব ভদ্রলোকের কমবেশি একটা বাজারমূল্য আছে, যে মূল্য দিলে এরা অনেক কিছুই করতে পারে (ক্ষেত্রবিশেষ কল্পনাতীত গণবিরোধী কাজও)। পরনিন্দা চর্চায় এদের জুড়ি নেই। তোষামোদিতে এদের জুড়ি নেই। আবার শিক্ষিত হলে জ্ঞানবাজি আর বক্তৃতাবাজিতে তাদের জুড়ি থাকে না; তবে সে বক্তৃতা প্রকাশ্য হলে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে যায়। তবে কদাচিৎ দু-একজন পাওয়া যেতে পারে (সম্ভবত সব কালেই ছিল) যারা একটু ভিন্ন হন; নিজের শ্রেণি অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। একটু বেশি বিত্ত আর একটু বেশি শিক্ষিত হলে ভয় থাকে গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, ব্যবসা-বাণিজ্য হারানোর। ভয়-ভীতির আসল কারণটি এরা কখনও প্রকাশ করে না– এদের চাকরি হারানোর ভয় থাকলেও থাকতে পারে, তবে আসল ভীতি হলো ট্যাক্স ফাইল। আর শাসকগোষ্ঠী সেটা নিয়েই খেলে। ফলে এরা কখনও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে যান না, যেতে পারেন না। এরা সমাজ পরিবর্তনের কথাও বলেন, তবে তা মনের কথা নয়; এবং এসব প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না। এদের বেশির ভাগই স্বার্থপর। এদের বেশির ভাগই জানেন না যে উৎপাদনে সৃষ্ট নতুন মূল্য দিয়েই এদের বেতন-ভাতা হয়। এসব নিয়ে এদের বেশির ভাগ নির্বিকার। শ্রেণি অবস্থানগত কারণে এদের দিয়ে বড় ধরনের সংস্কারমূলক কাজও সম্ভব নয় (সমাজ পরিবর্তনের কথা বাদই দিলাম)। তবে যখনই বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটে, এরা কীভাবে যেন সামনের সারিতে হাজির হয়ে যান। এরা কায়দা করে বাঁচতে জানেন। এরা সবসময় 'উপরের' সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এরা খুবই কার্যকর দালাল, আপসপটিয়সী, বসের সামনে বিড়াল আর অধীনস্থদের সামনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এরা যত না বুদ্ধিমান ও চালাক তার চেয়ে ঢের বেশি চতুর, প্রয়োজনে

অবস্থান নিয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কালোটাকার মালিকদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বললাম ৮০ শতাংশ ছাড় দেব না—ছাড় দেব মাত্র ২০ শতাংশ অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মোট কালোটাকার ফেরত দেব মাত্র ২০ শতাংশ (৮০ শতাংশ হাতে রাখব)—সেক্ষেত্রে ফেরত দেব ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা। এটাই হবে সরকারের আয়ের একাংশ, যা দিয়ে সরকার বাজেট বানাবেন। আর অন্য অংশ হবে সরকার সাধারণভাবে যে আয় করে থাকেন ("রাজস্ব প্রাপ্তি") যার পরিমাণ চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা (যাকে সরকারের বাজেট দলিলে বলা হয় 'সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি; সারণি ৬ দেখুন)। তাহলে ওপরের দু'টো যোগ করলে—সরকারের সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২২ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। আর একটু আছে, যা নিয়ে কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়কালে সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ-ই দ্বিমত পোষণ করবেন না, তা হলো সম্পদ কর (wealth tax, যা আমাদের আইনে আছে, কিন্তু আদায় করা হয় না) এবং অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit)। এই দুই উৎস থেকে সরকারকে আয় করানোর জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি এ জন্য যে (ক) ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে এখন দেশের জনসংখ্যার ৫ শতাংশ অতিধনীর হাতে আছে দেশের মোট খানার আয়ের (total household income of the country) কমপক্ষে ৪০ শতাংশ, আর আয় বৈষম্য মহাবিপৎসীমা অতিক্রম করেছে; (খ) করোনার সময়ে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে; তবে অফলাইনে নয় অনলাইনে, যেখানে মুনাফা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত এবং একচেটিয়া।

এ অবস্থায় আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের আয় খাতে সম্পদ কর থেকে মাত্র ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা, আর অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর থেকে মাত্র ৭৫ হাজার কোটি টাকা আহরণের প্রস্তাব করেছি। তাহলে দুর্বলচিত্তের মধ্যবিত্ত মানুষ হিসেবে যত ধরনের আপস সম্ভব সবকিছু প্রয়োগ করলেও তো বাজেটের জন্য সরকারের বার্ষিক আয় হতে পারে ২৫ লক্ষ ৯ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। অথচ আমাদের প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, আর ব্যয় ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা। তাহলে সরকার সম্ভাব্য যে আয় করতে পারে, তা দিয়ে তো আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের তুলনায় দ্বিগুণ বড় বাজেট নির্মাণ সম্ভব। সমস্যাটা কার এবং কোথায়? কভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় আর সেইসাথে ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত—এহেন সময়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, প্রয়োজন বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন—শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণ—আর সে জন্য দরকার সম্প্রসারণশীল বাজেট, যে বাজেটের অর্থ তো আমাদের আছে। হিসেবপত্তর তো স্পষ্ট। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? বাধা কোথায়? অসম্ভাব্যতা কোথায়?

চোখ ওল্টাতে এরা সময় অপচয় করেন না, আর উপরে উঠতে এদের কাছে নীতি-নৈতিকতা বলে কিছু কাজ করে না। (উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০) বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)

আমরা জানি, কালোটাকার মালিকেরা ভয় পাচ্ছেন যে জনগণ তো জেনে গেল মোট কালোটাকার ২০ শতাংশ মানে কত টাকা, তাহলে ওরা ১০০ শতাংশ সমান সমান কত টাকা সেটাও হিসেব করে ফেলবেন—ভবিষ্যতে কী যে হয় (!)। ধরুন, কালোওয়ালাদের দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন নিশ্চিত করতে জনগণের সম্মতি নিয়ে দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত—মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমরা আপনাদের প্রস্তাব দিলাম যে আপনারা যদি ওই ২০ শতাংশের অতিরিক্তটার অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা আগামী ৫-৬ বছরে (২০২৮-২৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) এমন ধরনের শিল্পকলকারখানা ও কৃষিতে বিনিয়োগ করেন, যা কোনো অবস্থাতেই বাতাস-পানি-পরিবেশেরদূষণ করবে না (কারণ ওই দূষণ শ্বসনতন্ত্রের রোগজনিত মহামারি respiratory pandemic-এর কারণ হবে, যা থেকে আপনিও রেহাই পাবেন না)—তাহলে আপনাদের অতীত কৃতকর্ম ক্ষমা করা হবে। আর এই আপসমূলক প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরেও তো আপনার কাছে তো ৩৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা থেকেই যাচ্ছে। কালোওয়ালারা এখন একবার ভেবে দেখতে পারেন—অথবা অন্য কোনো ধরনের আপস প্রস্তাব থাকলে সেটা জনগণের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। এ দেশের আমজনতা যথেষ্ট ক্ষমাশীল; চেতনায় মুক্তিযোদ্ধা। 'কালোওয়ালারা' আরো একটা বিষয় জেনে রাখলে উপকৃত হবেন, আর তা হলো—বিদেশে আপনাদের যেসব অবৈধ সম্পদ-সম্পত্তি আছে, যাকে বলা হয় "সার্বভৌম সম্পদ" বা "sovereign wealth"—আন্তর্জাতিক আইনকানুনে ওইসব সম্পদের মালিক কিন্তু আপনার দেশের জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র। এতকিছুর পরেও "জান দেব কিন্তু, মান দেব না—কালোটাকা দেব না"—এই মত পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে (দেখুন: বারকাত, আবুল (২০২০) বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫৩৭)।

(২) আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা (সারণি ৫)। আমরা কোথায় কোন খাত-ক্ষেত্রে কেন কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেব (অথবা দেওয়া উচিত)? এ বিষয়ে আমাদের সরাসরি উত্তর: আমাদের দেশের সংবিধানই হলো ব্যয়-বরাদ্দের প্রধান নির্দেশদাতা; অগ্রাধিকার বিবেচনা ওই নির্দেশনা মেনেই করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা তা করি না—আমরা গুটিকয়েক মানুষ স্বজনতুষ্টিবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (যাকে বলা যায় অলিগার্খিক-ক্রনি-ফাইন্যান্সিয়ালাইজড ক্যাপিটালইজম) স্বার্থ মেনে নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতাদর্শ মোতাবেক ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণ করি। আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমাদের বিবেচনা যেহেতু প্রকৃতির প্রতি অনুগত থেকে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট, সেহেতু স্বাভাবিক যে আমাদের বরাদ্দ কাঠামোটাও সাযুজ্যপূর্ণ হবে। বাজেটে আমাদের বরাদ্দ কাঠামো হবে দেশে ধন বৈষম্য, আয় বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্যসহ—সবধরনের বৈষম্য নিরসন-

উদ্দিষ্ট। বাজেটে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হবে এ রকম: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, শিক্ষা, ও প্রযুক্তি, কৃষি, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, সুদ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গণপরিবহন, গৃহায়ণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিবিধ ব্যয়, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) (দেখুন, সারণি ৫)। আমাদের এই বরাদ্দ কাঠামো সরকারের প্রচলিত বরাদ্দ কাঠামোর সাথে মিলবে না। যেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট সম্প্রসারণশীল বাজেট, সেহেতু (আমাদের প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দ চলমান বাজেটের তুলনায় ৩.৪ গুণ বেশি)। অর্থনীতির প্রতিটি খাতেই ব্যয়-বরাদ্দ বাড়বে। তবে সে বাড়ার হারটাও হবে *সংবিধানে প্রতিফলিত—সংবিধানের প্রাধান্য—'জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক'* চেতনার প্রতিফলন। আর সেইসাথে কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়ের কারণে বাজেটে এমনকি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ নতুন নতুন বরাদ্দ খাতও থাকতে হবে। যেমন **আমাদের প্রস্তাবে খাত-উপখাত** হিসেবে এ ধরনের নতুন কয়েকটি হলো—**সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ, দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য আবাসন বিভাগ, প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ, ভূমি সংস্কার বিভাগ, আদিবাসী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা পৃথক্করণ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি পৃথক্করণ, নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ, শিশুবিকাশ বিভাগ, সংস্কৃতি ও ধর্ম পৃথক্করণ, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন, প্রতিবন্ধী মানুষ, হাওর অঞ্চলের প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন, অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, কৃষকদের স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র অনুদান, জেনোমিক মেডিসিন, অসংক্রামক রোগ (ক্যানসার, হার্ট, কিডনি, ডায়াবেটিস) নিরাময়ে সরকারি চিকিৎসাসেবা, জাতীয় অনুবাদ প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার**। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো নিয়ে যারা বিরোধিতা করবেন, তাদের যুক্তিসহ লেখালেখির আহ্বান রইল। আহ্বান রইল সময় নিয়ে আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের—যেসবে জনগণ সরাসরি রিয়েলটাইমে অংশ নিতে পারেন। তবে একই সাথে বাজেটের আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা যে জনগণের সম্মতির প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন ধরনের পথ-পদ্ধতি নিয়ে বলেছি—আশা করি, সে বিষয়েও তারা কথা বলবেন।

৫.৬ বিকল্প বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ হবে কোথায়?

৫.৬.১ তিনটি বড় মাপের বরাদ্দ-সংস্কার প্রস্তাব

কভিড-১৯ উদ্ভূত মহারোগ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতসহ বিভিন্নমুখী আর্থ-সামাজিক মহামন্দা মোকাবিলাসহ ভবিষ্যতে শোভন রাষ্ট্র-শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সংবিধানের প্রাধান্য "জনগণই হইবেন

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক" [অনুচ্ছেদ ৭(১)] এবং "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশে স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৯(১)]—এই প্রতিশ্রুতি দুটি আত্মস্থ করে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি বড় মাপের পরিবর্তন-সংস্কার প্রস্তাব করছি:

প্রথম প্রস্তাব: বর্তমান ৩৯টি মন্ত্রণালয় রাজধানী ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত না রেখে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে স্থানান্তর করা (দেখুন, সারণি-৪)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: সংবিধানের প্রাধান্য "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" [অনুচ্ছেদ ৭ (১)]; সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি [অনুচ্ছেদ ১০]; গণতন্ত্র ও মানবাধিকার [অনুচ্ছেদ ১১]; বিকেন্দ্রীভূত-স্থানীয় শাসন উন্নয়নব্যবস্থা [অনুচ্ছেদ ৫৯ (১)]; মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা [অনুচ্ছেদ ১৫] এবং বৈষম্য রোধে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব [অনুচ্ছেদ ১৬]—এসব মেনে অতিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে তৃণমূল-মানুষমুখী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে আমরা যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ভৌগোলিকভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছি, তেমনি জনসমৃদ্ধি (peoples wellbeing অর্থে) নিশ্চিত করার প্রয়াস হিসেবে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় (New Ministries) এবং বিদ্যমান মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশকিছু নতুন বিভাগ (New Division/ Directorate) গঠন এবং এ লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি (দেখুন, সারণি ৫)। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়দ্বয় হলো: (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Transport) এবং (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ, ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Research, Innovation, Diffusion, and Development Ministry)। আর বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমরা ১৬টি নতুন বিভাগ (New Division/ Directorate) প্রস্তাব করছি, যা হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ **(দেখুন, সারণি ৫ ও ১০)**।

এ ছাড়া যদিও আমরা আসন্ন বাজেটে প্রস্তাব করিনি, তথাপি মনে করি—দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত মন্ত্রণালয় (Ministry of informamal sector) গঠন করা উচিত। কারণ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। একইসাথে শক্তিশালী **কৃষি-**

ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ গঠনের পাশাপাশি আমরা প্রস্তাব করছি যে—বর্তমান **ভূমি মন্ত্রণালয়ের** নাম বঙ্গবন্ধু প্রদেয় **ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়**-এ পরিবর্তন করা; পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে **আদিবাসী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়** গঠন করা, যার দু'টো বিভাগ হবে পার্বত্য আদিবাসী বিভাগ এবং সমতলের আদিবাসী বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর পল্লী উন্নয়ন এবং গণমুখী-বহুমুখী সমবায় বিভাগ গড়ে তোলা (যার প্রতিটিতেই একজন করে ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন); শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন **শিল্প সুরক্ষা/ সংরক্ষণ বিভাগ** (Industry Protection Division) গড়ে তোলা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে **বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ** গঠন করা; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী কার্যকর **নদী খনন বিভাগ** প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয় প্রস্তাব: আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে এক বছরের জন্য নয়, পরিকল্পিতভাবে পাঁচ বছরের জন্য বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন) দিতে হবে, যা থেকে প্রতিবছরের বরাদ্দ বার্ষিক বাজেটে প্রতিফলিত হবে। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি বরাদ্দ প্রস্তাবনা আসন্ন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উপস্থাপন করেছি (দেখুন, সারণি ৫)।

৫.৬.২ খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাব

এখন আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে ব্যয়ের খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করব। প্রথমেই বলে রাখি, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট—'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি; সে কারণেই জনগণতান্ত্রিক বাজেটে—বাজেট বরাদ্দে আমাদের নিম্নরূপ: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (প্রস্তাবিত বাজেটে মোট বরাদ্দের ২১.৪ শতাংশ), শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১১.৮ শতাংশ), কৃষি (৯ শতাংশ), জনপ্রশাসন (৮.২ শতাংশ), স্বাস্থ্য (৭.৭ শতাংশ), পরিবহন ও যোগাযোগ (৬ শতাংশ), সুদ ৫.১ শতাংশ), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৫.১ শতাংশ), গণপরিবহন (৪.৯ শতাংশ), গৃহায়ণ (৪.৩ শতাংশ), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (৪.১ শতাংশ), গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন (৩.৯ শতাংশ), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (৩.৪ শতাংশ), জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (২.১ শতাংশ), প্রতিরক্ষা (১.৮ শতাংশ), বিবিধ ব্যয় (০.৬ শতাংশ), বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (০.৬ শতাংশ) (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) **(দেখুন, সারণি ৫)**।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত

শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে চলতি অর্থবছর ২০২২-২২ এর বাজেটে সরকারের মোট বরাদ্দ (পরিচালন + উন্নয়ন) ছিল ৯৪ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশকে জ্ঞানালোকিত মানুষের সমাজ রূপান্তরে মানবশক্তি উন্নয়নের কোনো বিকল্পই নেই। আর অন্তত সে কারণেই শিক্ষার অগ্রাধিকার এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এ খাতের জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ২ লক্ষ ৪১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছি, যা আমাদের মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের ১১.৮

শতাংশ এবং চলমান বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২.৫৪ গুণ বেশি (দেখুন, সারণি ৫, ৬, ৭)। 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাতে আমাদের এই বরাদ্দ প্রস্তাব বর্তমান (২০২২ সালের) জিডিপির প্রায় ৮ শতাংশের সমান। আসন্ন অর্থবছরের জন্য শিক্ষাখাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষায়' চলমান বছরের সরকারি বরাদ্দ ২৬ হাজার ৩১৪ কোটি টাকার স্থলে ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (২.৪১ গুণ বৃদ্ধি) প্রস্তাব করছি। 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ' উপখাতে সরকারের মোট ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকার বরাদ্দ ১.৯৭ গুণ বৃদ্ধি করে আমাদের প্রস্তাব ৭২ হাজার কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সরকারি চলতি বাজেট ২১ হাজার ২০৪ কোটি টাকার বিপরীতে আমরা ২.১৬ গুণ বৃদ্ধি করে ৪৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। মূলত আইসিটিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে সরকারি বরাদ্দ ১ হাজার ৭২০ কোটি টাকার জায়গায় আমাদের প্রস্তাব ১৮ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা, যা চলমান সরকারি বরাদ্দের তুলনায় ১১ গুণ বেশি, 'কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ' খাতে সরকারি বরাদ্দ ৯ হাজার ১৫৩ কোটি টাকার বিপরীতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৩৫ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩২ হাজার কোটি টাকা যাবে কারিগরি শিক্ষাখাতে (উচ্চ উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়তে প্রয়োজন দক্ষ জনসম্পদ)।

'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাত নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হলো (১) 'শিক্ষা' ও 'প্রযুক্তি'কে এখন একসাথে দেখিয়ে সরকার বলেন যে তারা শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেন। দাবিটা সঠিক নয়। আমাদের প্রস্তাব হলো 'শিক্ষা' ও 'প্রযুক্তি'কে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে দেখাতে হবে। যে ক্ষেত্রে 'শিক্ষা ও গবেষণা' হবে একটি খাত আর 'প্রযুক্তি' হবে অন্য খাত। একই সাথে 'শিক্ষা ও গবেষণা' বাজেট বরাদ্দ হবে কমপক্ষে জিডিপির ৫ শতাংশ। আমরা সেটাই প্রস্তাব করেছি। শুধু 'শিক্ষা ও গবেষণা' খাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২০ কোটি টাকা (যা জিডিপির ৫ শতাংশ)। (২) প্রচলিত বাজেটে কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে একসাথে এক খাতভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়। আমরা তা অযৌক্তিক মনে করি। 'কারিগরি শিক্ষা' ও 'মাদ্রাসা শিক্ষার' উদ্দেশ্য ভিন্ন, সে কারণেই আমরা তা ভিন্নভাবে দেখানো যৌক্তিক বলে মনে করি। আমরা সেটাই করেছি এবং দুটি ভিন্ন বিভাগে রূপান্তরের কথা বলেছি। আমাদের প্রস্তাবে কারিগরি শিক্ষায় মোট বরাদ্দ ৩২ হাজার ১২৪ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে (ধর্মভিত্তিক সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ৩ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৫)। (৩) শিক্ষাখাতে আমরা "নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছি। এ জন্য আগামী ৫ বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকাসহ আসন্ন বাজেটে ৬২ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। **শিক্ষাখাতের বরাদ্দকে ব্যয় (expenditure) হিসেবে নয়, বিবেচনা করতে হবে বিনিয়োগ (investment) হিসেবে**।

গবেষণাসংশ্লিষ্ট বাজেট "শিক্ষা ও প্রযুক্তি" খাতের অন্তর্গত বিধায় উল্লেখ জরুরি যে এ বছরই প্রথম আমরা "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development, RID & D) নামে একটি ভিন্ন (নতুন) মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব করছি। আর এই মন্ত্রণালয়ের জন্য অসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমার প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৮০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরের জন্য (২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ৪ লক্ষ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)।

স্বাস্থ্যখাত

স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা যে একেবারেই বেহাল তা আমরা ৪.১৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। স্বাস্থ্যখাত এখন বৈষম্য সৃষ্টি ও দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। আর 'কভিড-১৯' প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে আমাদের দেশে আসলেই তেমন কোনো শক্তিশালী স্বাস্থ্যখাত নেই। নেই জনস্বাস্থ্য (public health) বলে কোনো কিছুর তেমন অস্তিত্ব। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছরে) সরকারি বরাদ্দ ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ ৪.৮৩ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)।

আমরা মনে করি, **বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ সেসব খাত-উপখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাহিত করা সমীচীন হবে, যার ফলে জনগণের সুস্বাস্থ্য-মধ্যস্থতাকারী জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে**। আর সে লক্ষ্যে বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ যেসব খাত-উপখাতসহ মানুষের জন্য উদ্দিষ্ট হতে হবে তার মধ্যে থাকবে—প্রাথমিক-মধ্যবর্তী-উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (primary, secondary, tertiary healthcare); সবধরনের 'দারিদ্র্যের রোগ' (যক্ষ্মা, শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ার মা ও শিশুস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, হাম, খাবার পানিতে আর্সেনিক-উদ্ভূত আর্সেনোকোসিস রোগ); গ্রামের ও নগরের দরিদ্র-প্রান্তস্থ মানুষ; সবধরনের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা (preventive health care/ services), এবং ভবিষ্যৎ **জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেনোমিক মেডিসিনে বিনিয়োগ** (শেষোক্ত এ বিনিয়োগটি রাষ্ট্রকে পরিকল্পিতভাবে করতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হবে জেনোমিক মেডিসিন উৎপাদনে প্রণোদনা, গবেষণা, উন্নয়ন ও বিচ্ছুরণ অর্থাৎ RD & D বিনিয়োগ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি)। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়াদির পাশাপাশি যে বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছি, তা হলো—সরকার প্রতিশ্রুত 'গ্রাম হবে শহর'-এর আওতায় সম্ভাব্য সবধরনের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা প্রদানে যথাসাধ্য বিকেন্দ্রীভূত করার মতো কাঠামো গড়ে তোলা।

কভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমগ্র দেশবাসী জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং গভীর পর্যবেক্ষণ করছেন; কারণ প্রত্যেকে এ নিয়ে শঙ্কিত-আতঙ্কিত। **আমাদের পর্যবেক্ষণ বলে যে আমাদের দেশে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম" বলে কোনো কিছুই তেমন নেই**। এ নিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি যে স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান ডাইরেক্টরেটের পাশাপাশি আরো একটি ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার নাম হবে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ডাইরেক্টরেট" (Department/ Directorate of Public Health Safety/Security)। আমাদের প্রস্তাবনার এ বিভাগটি যা নিয়ে কাজ করবে তার নির্দেশনাও আমরা দিয়েছি। বিকল্প বাজেটে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত এই নবসৃষ্ট বিভাগে ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ, যার ১০ হাজার কোটি টাকা যাবে পরিচালন বাজেটে আর ৫০ হাজার কোটি টাকা যাবে উন্নয়ন বরাদ্দে। আসলে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ' প্রতিষ্ঠায় মোট লাগবে আনুমানিক ৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা পরবর্তী কয়েক বছরের বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে (দেখুন, সারণি ৫)।

আমরা মনে করি, **স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ হলো 'মানবসম্পদ' সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, এ বিনিয়োগ নিয়ে আপস হবে আত্মঘাতী। আমরা এও মনে করি, জনগণের স্বাস্থ্য মুক্তবাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া মহা-অন্যায় এবং তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যহীন**।

সারণি ৫: ব্যয়ের বাজেট

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১	**জনপ্রশাসন**	**৯৭,৪৪০**	**২৭**	**১,৩৬,৫৭০**		**১.৪০**	**১৫,২৭০**	**৬**	**৩১,২৭৫**	**২.৩০**	**২.০৫**	**১,১২,৭১০**	**১,৬৭,৮৪৫**	১.৪৯
১.১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৯	০.০১	৫০	০.০১	**১.৭২**	-	০.০০	-	০.০০	-	২৯	**৫০**	১.৭২
১.২	জাতীয় সংসদ	৩৩৪	০.০৯	৪০০	০.০৬	**১.২০**	১	০.০০	**৫**	০.০০	**৫.০০**	৩৩৫	**৪০৫**	১.২১
১.৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৬৮০	০.১৯	৭০০	০.১০	**১.০৩**	৩,২২৭	১.৩৬	**৩,৫০০**	০.২৬	**১.০৮**	৩,৯০৭	**৪,২০০**	১.০৭
১.৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৮৩	০.০৫	১৯০	০.০৩	**১.০৪**	৫৫	০.০২	**৭৫**	০.০১	**১.৩৬**	২৩৮	**২৬৫**	১.১১
১.৫	নির্বাচন কমিশন	১,০১০	০.২৮	১,২০০	০.১৭	**১.১৯**	৭১৮	০.৩০	**৯০০**	০.০৭	**১.২৫**	১,৭২৮	**২,১০০**	১.২২
১.৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২,৯৯৪	০.৮২	৩,২০০	০.৪৭	**১.০৭**	৭৮২	০.৩৩	**৮০০**	০.০৬	**১.০২**	৩,৭৭৬	**৪,০০০**	১.০৬
১.৭	সরকারি কর্মকমিশন	৭৯	০.০২	১২০	০.০২	**১.৫২**	৩৬	০.০২	**৮৫**	০.০১	**২.৩৬**	১১৫	**২০৫**	১.৭৮
১.৮	অর্থ বিভাগ [৩]	৮৭,০২৭	২৩.৭৪	**১,২৩,০০০**	১৭.৮৯	**১.৪১**	৪,৭৬৩	২.০১	**১৫,১৬৩**	১.১১	**৩.১৮**	৯১,৭৯০	**১,৩৮,১৬৩**	১.৫১
১.৯	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২,৭৩৫	০.৭৫	৩,১৩০	০.৪৬	**১.১৪**	৩৮৮	০.১৬	৬৭০	০.০৫	**১.৭৩**	৩,১২৩	৩,৮০০	১.২২
১.১০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২২	০.০৩	৪৫০	০.০৭	৩.৬৯	২,৪৩৭	১.০৩	৪,৫০০	০.৩৩	১.৮৫	২,৫৫৯	৪,৯৫০	১.৯৩
১.১১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩২৬	০.০৯	৪২৫	০.০৬	**১.৩০**	৬৬	০.০৩	৯২	০.০১	**১.৩৯**	৩৯২	৫১৭	১.৩২
১.১২	পরিকল্পনা বিভাগ [৪]	৯২	০.০৩	২৫০	০.০৪	**২.৭২**	১,০৪১	০.৪৪	২,৪৫০	০.১৮	**২.৩৫**	১,১৩৩	২,৭০০	২.৩৮
১.১৩	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও	৫১	০.০১	২২০	০.০৩	**৪.৩১**	২০৬	০.০৯	৪৩৫	০.০৩	**২.১১**	২৫৭	৬৫৫	২.৫৫

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	মূল্যায়ন বিভাগ													
১.১৪	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২৫২	০.০৭	৭৩৫	০.১১	**২.৯২**	**১,৪২১**	০.৬০	**২,১৬০**	০.১৬	**১.৫২**	১,৬৭৩	**২,৮৯৫**	১.৭৩
১.১৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	**১,৫২৬**	০.৪২	**২,৫০০**	০.৩৬	**১.৬৪**	**১২৯**	০.০৫	**৪৪০**	০.০৩	**৩.৪১**	১,৬৫৫	**২,৯৪০**	১.৭৮
	অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ	**-**	০.০০	**২৫০**	০.০৪	**-**	-	০	**৫০**	০.০০	**-**	-	**৩০০**	-
২	**স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন**	**৬,৩৬০**	**১.৭৩**	**১২,০৩১**	**২**	**১.৮৯**	**৩৫,৮৩৩**	**১৫.১১**	**৯১,৫৭৫**	**৬.৭২**	**২.৫৬**	**৪২,১৯৩**	**১,০৩,৬০৬**	২.৪৬
২.১	**কর ন্যায়পালের অফিস**	**-**	**০.০০**	**৫০**	**০.০১**	**-**	**-**	**০.০০**	**১০০**	**০.০১**	**-**	**-**	**১৫০**	**-**
২.২	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫,৩২২	১.৪৫	৯,৯৯১	১.৪৫	**১.৮৮**	৩৩,৮৯৮	১৪.৩০	৭৮,৪০০	৫.৭৫	**২.৩১**	৩৯,২২০	৮৮,৩৯১	২.২৫
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬৫২	০.১৮	**১,৪৪০**	০.২১	**২.২১**	**১,১৩৯**	০.৪৮	**১১,১০০**	০.৮১	**৯.৭৫**	১,৭৯১	**১২,৫৪০**	৭.০০
২.৪	পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৮৬	০.১১	৫৫০	০.০৮	**১.৪২**	৭৯৬	০.৩৪	**১,৯৭৫**	০.১৪	**২.৪৮**	১,১৮২	২,৫২৫	২.১৪
৩	**প্রতিরক্ষা**	**৩৫,৪৪৯**	**৯.৬৭**	**৩৫,৯৭২**	**৫.২**	**১.০১**	**১,৮৩২**	**০.৭৭**	**১,৯১২**	**০.১৪**	**১.০৪**	**৩৭,২৮১**	**৩৭,৮৮৪**	১.০২
৩.১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস	৩৩,৬১৬	**৯.১৭**	**৩৪,১০০**	৪.৯৬	**১.০১**	১,৮৩২	০.৭৭	**১,৯১২**	০.১৪	**১.০৪**	৩৫,৪৪৮	৩৬,০১২	১.০২
৩.২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-অন্যান্য সার্ভিস	**১,৭৮৯**	**০.৪৯**	**১,৮২০**	**০.৩**	**১.০২**	-		-		-	১,৭৮৯	**১,৮২০**	১.০২

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	**পরিচালন[১]**					**উন্নয়ন[২]**					**পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ**		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৩.৩	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৪৪	**০.০১**	**৫২**	**০.০**	**১.১৮**	-	০.০০	-	-	-	৪৪	**৫২**	১.১৮
৪	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা**	**২৫,৮৯৮**	**৭.০৬**	**৩৪,৯৩৫**	**৫.০৮**	**১.৩৫**	**৩,২২৬**	**১.৩৬**	**৮,৩৪১**	**০.৬১**	**২.৫৯**	**২৯,১২৪**	**৪৩,২৭৬**	১.৪৯
৪.১	সুপ্রিম কোর্ট	২২৫	০.০৬	৫২৫	০.০৮	**২.৩৩**	-	০.০০	৩০০	০.০২	-	২২৫	৮২৫	৩.৬৭
৪.২	আইন ও বিচার বিভাগ	১,৪৬৪	০.৪০	১,৮৫০	০.২৭	**১.২৬**	৩৪৯	০.১৫	৭৭৬	০.০৬	**২.২২**	১,৮১৩	২,৬২৬	১.৪৫
৪.৩	জননিরাপত্তা বিভাগ	২১,৪৮৫	৫.৮৬	২৭,৫০০	৪.০০	**১.২৮**	১,৫৯৭	০.৬৭	৩,৪৭০	০.২৫	**২.১৭**	২৩,০৮২	৩০,৯৭০	১.৩৪
৪.৪	লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ	৩৬	০.০১	১১০	০.০২	**৩.০৬**	১	০.০০	২০	০.০০	**২০.০০**	৩৭	১৩০	৩.৫১
৪.৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৩৮	০.০৪	৪৫০	০.০৭	**৩.২৬**	২১	০.০১	২৭৫	০.০২	**১৩.১০**	১৫৯	৭২৫	৪.৫৬
৪.৬	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২,৫৫০	০.৭০	৪,৫০০	০.৬৫	**১.৭৬**	১,২৫৮	০.৫৩	৩,৫০০	০.২৬	**২.৭৮**	৩,৮০৮	৮,০০০	২.১০
৫	**শিক্ষা ও প্রযুক্তি**	**৪৮,২২৯**	**১৩.১৬**	**১,০৪,৯৫০**	**১৫.২৬**	**২.১৮**	**৪৬,৬৪৮**	**১৯.৬৮**	**১,৩৬,২২৫**	**১০.০০**	**২.৯২**	**৯৪,৮৭৭**	**২,৪১,১৭৫**	২.৫৪
৫.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮,২৯২	৪.৯৯	৪০,০০০	৫.৮২	**২.১৯**	৮,০২২	৩.৩৮	**২৩,৫০০**	১.৭২	**২.৯৩**	২৬,৩১৪	৬৩,৫০০	২.৪১
৫.২	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২২,১৬৬	৬.০৫	৪৭,৫০০	৬.৯১	**২.১৪**	১৪,৩২০	৬.০৪	**২৪,৫০০**	১.৮০	**১.৭১**	৩৬,৪৮৬	৭২,০০০	১.৯৭
৫.৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৫৭০	০.১৬	২,২০০	০.৩২	**৩.৮৬**	২০,৬৩৪	৮.৭০	**৪৩,৫০০**	৩.১৯	**২.১১**	২১,২০৪	৪৫,৭০০	২.১৬
৫.৪	তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ	৩৫৮	০.১০	৭৫০	০.১১	**২.০৯**	১,৩৬২	০.৫৭	**১৮,২২৫**	১.৩৪	**১৩.৩৮**	১,৭২০	১৮,৯৭৫	১১.০৩

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৫.৫	**নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ:** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	১,৫০০	০.২২	-	-	০.০০	৪,৫০০	০.৩৩	-	-	৬,০০০	-
৫.৬	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৬,৮৪৩	১.৮৭	১৩,০০০	১.৮৯	১.৯০	২,৩১০	০.৯৭	২২,০০০	১.৬১	৯.৫২	৯,১৫৩	৩৫,০০০	৩.৮২
	কারিগরি শিক্ষা বিভাগ			১১,০০০	১.৬০				২১,০০০	১.৫৪			৩২,০০০	
	মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (ধর্মভিত্তিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	-	-	২,০০০	০.২৯	-			১,০০০	০.০৭৩	-		৩,০০০	-
৬	**স্বাস্থ্য**	১৭,১৭৩	৪.৬৮	৪৮,০০০	৭	২.৮০	১৫,৫৫৮	৭	১,১০,০০০	৮	৭.০৭	৩২,৭৩১	১,৫৮,০০০	৪.৮৩
৬.১	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১২,৯১৪	৩.৫২	৩০,৫০০	৪.৪৪	২.৩৬	১৩,০০০	৫.৪৮	৪৯,৫০০	৩.৬৩	৩.৮১	২৫,৯১৪	৮০,০০০	৩.০৯
৬.২	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ	৪,২৫৯	১.১৬	৭,৫০০	১.০৯	১.৭৬	২,৫৫৮	১.০৮	১০,৫০০	০.৭৭	৪.১০	৬,৮১৭	১৮,০০০	২.৬৪
৬.৩	**জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ:** জীবজন্তু-প্রাণিবাহিত রোগ,	-	০.০০	১০,০০০	১.৪৫	-	-		৫০,০০০	৩.৬৭	-	-	৬০,০০০	-

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	বায়োসিকিউরিটি, বায়োসেফটি; রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং; সমন্বিত ডেটাবেজ; র‍্যাপিড রেসপন্স; জনস্বাস্থ্য সিস্টেম প্রতিষ্ঠা; জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি; জনস্বাস্থ্য ইমারজেন্সি মোকাবিলার দক্ষতা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা (preventive care) (আগামী ৫ অর্থবছরে– ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা)													
৭	**সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ**	**২৭,২৩১**	৭.৪৩	**৮৫,১৫০**	**১২**	৩.১৩	**৭,০৮৮**	**৩**	**৩,৫২,৯০০**	**৫**	৪৯.৭৯	**৩৪,৩১৯**	৪,৩৮,০৫০	১২.৭৬
৭.১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮,৬০৬	২.৩৫	১৮,৫০০	২.৬৯	**২.১৫**	৫১৯	০.২২	৮,২৫০	০.৬১	**১৫.৯০**	৯,১২৫	২৬,৭৫০	২.৯৩

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.২	**প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে– ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ২৫ হাজার কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা)			১,০০০					৪,০০০				৫,০০০	
৭.৩	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৩৩৩	০.৯১	৭,২৫০	১.০৫	**২.১৮**	৮৫৭	০.৩৬	১২,৫০০	০.৯২	**১৪.৫৯**	৪,১৯০	১৯,৭৫০	৪.৭১
৭.৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪,০৩২	১.১০	৬,২০০	০.৯০	**১.৫৪**	৬৭৯	০.২৯	২১,১৫০	১.৫৫	**৩১.১৫**	৪,৭১১	২৭,৩৫০	৫.৮১
৭.৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫,৩১৯	১.৪৫	৯,৫০০	১.৩৮	**১.৭৯**	৪,৬৩১	১.৯৫	১৯,২৫০	১.৪১	**৪.১৬**	৯,৯৫০	২৮,৭৫০	২.৮৯
৭.৬	মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫,৯৪১	১.৬২	৭,৫০০	১.০৯	**১.২৬**	৪০২	০.১৭	১,৯৫০	০.১৪	**৪.৮৫**	৬,৩৪৩	৯,৪৫০	১.৪৯

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.৭	**দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ** (গ্রাম ও শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা: আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা)	-	০.০০	১৫,০০০	২.১৮	-	-	০.০০	৮৫,০০০	০.০০	**০.০০**	-	১,০০,০০০	-
৭.৮	**নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ: গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারী প্রধান খানা** (আগামী ৫ অর্থবছরে-২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা) (খ)	-	০.০০	৫,০০০	০.৭৩	-	-	০.০০	৩৫,০০০	০.০০	**০.০০**	-	৪০,০০০	-

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.৯	**আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিকাশ বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫,০০০ কোটি টাকা-অর্থাৎ বছরে ১ হাজার কোটি টাকা)	-		২০০	০.০৩	-	-	০.০০	৮০০	০.০০	**০.০০**	-	১,০০০	০.০০
৭.১০	**শিশুবিকাশ বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭—মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা)	-	০	১০,০০০	১.৪৫	-	-	০	**৫০,০০০**	০	-	-	৬০,০০০	০.০০
৭.১১	**বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ - মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা)	-	০	৩,০০০	০.৪৪	-	-	০	**৫৭,০০০**	০	-	-	৬০,০০০	০.০০

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.১২	**সার্বজনীন পেনশন বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ - মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা)	-	০	২,০০০	০.২৯	**০.০০**	-	০	**৫৮,০০০**	০	**০.০০**	-	৬০,০০০	০.০০
৮	**গৃহায়ণ**	**১,৮০৩**	**০.৫**	**৫,৬০০**	**১**	**৩.১১**	**৪,৫৪৩**	**২**	**৮২,৫০০**	**০**	**১৮.১৬**	**৬,৩৪৬**	**৮৮,১০০**	**১৩.৮৮**
৮.১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১,৮০৩	০.৪৯	২,৬০০	০.৩৮	**১.৪৪**	৪,৫৪৩	১.৯২	৫,৫০০	০.৪০	**১.২১**	৬,৩৪৬	৮,১০০	১.২৮
৮.২	**দরিদ্র-প্রান্তিক নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭—মোট ৪ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৮০ হাজার কোটি টাকা)			৩,০০০	০.৪৪				৭৭,০০০				৮০,০০০	
৯	**বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম**	**২,৩১৫**	**০.৬৩**	**৩,৮৭০**	**০.৫৬**	**১.৬৭**	**২,৬৪৩**	**১.১১**	**৮,০৫০**	**০.৫৯**	**৩.০৫**	**৪,৯৫৮**	**১১,৯২০**	২.৪০
৯.১	তথ্য মন্ত্রণালয়	৮১০	০.২২	১,০০০	০.১৫	**১.২৩**	**১৯৯**	০.০৮	৭৫০	০.০৬	**৩.৭৭**	১,০০৯	১,৭৫০	১.৭৩

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৯.২	সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৬৭	০.১০	৮৭০	০.১৩	**২.৩৭**	২২০	০.০৯	২,৯০০	০.২১	**১৩.১৮**	৫৮৭	৩,৭৭০	৬.৪২
৯.৩	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৯৬	০.০৮	২০০	০.০৩	**০.৬৮**	১,৯৪৪	০.৮২	৫০০	০.০৪	**০.২৬**	২,২৪০	৭০০	০.৩১
৯.৪	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৮৪২	০.২৩	১,৮০০	০.২৬	**২.১৪**	২৮০	০.১২	৩,৯০০	০.২৯	**১৩.৯৩**	১,১২২	৫,৭০০	৫.০৮
১০	**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি**	**১১৭**	**০.০৩**	**২৭০**	**০.০**	**২.৩১**	**২৭,৩৬৭**	**১১.৫৪**	**৮৪,০০০**	**৬.১৭**	**৩.০৭**	**২৭,৪৮৪**	**৮৪,২৭০**	৩.০৭
১০.১	জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	৬৮	০.০২	১২০	০.০২	**১.৭৬**	২,০১৮	০.৮৫	৩২,০০০	২.৩৫	**১৫.৮৬**	২,০৮৬	**৩২,১২০**	১৫.৪০
১০.২	বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৯	০.০১	১৫০	০.০২	**৩.০৬**	২৫,৩৪৯	১০.৬৯	৫২,০০০	৩.৮২	**২.০৫**	২৫,৩৯৮	**৫২,১৫০**	২.০৫
	বিদ্যুৎ উৎপাদন		০.০০	৩০	০.০০	-	-	০.০০	১০,০০০	০.৭৩	-	-	**১০,০৩০**	-
	বিদ্যুৎ সঞ্চালন		০.০০	৭০	০.০১	-	-	০.০০	২২,০০০	১.৬১	-	-	**২২,০৭০**	-
	বিদ্যুৎ বিতরণ		০.০০	৫০	০.০১	-	-	০.০০	২০,০০০	১.৪৭	-	-	**২০,০৫০**	-
১১	**কৃষি** [৫]	**১৮,৬৮৬**	৫.১০	**৩৯,৮০০**	৫.৭৯	**২.১৩**	**১৩,২২৬**	৫.৫৮	**১,৪৪,৫০০**	**১০.৬১**	**১০.৯৩**	**৩১,৯১২**	**১,৮৪,৩০০**	৫.৭৮
১১.১	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩,১৬৭	৩.৫৯	২৫,৫০০	৩.৭১	**১.৯৪**	৩,০৩০	১.২৮	৪২,০০০	৩.০৮	**১৩.৮৬**	১৬,১৯৭	৬৭,৫০০	৪.১৭
১১.২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৬৪৯	০.৪৫	৩,৫০০	০.৫১	**২.১২**	১,৭৮৮	০.৭৫	৭,৫০০	০.৫৫	**৪.১৯**	৩,৪৩৭	১১,০০০	৩.২০
১১.৩	পরিবেশ, বন মন্ত্রণালয়	৬৮১	০.১৯	১,২০০	০.১৭	**১.৭৬**	৫৪২	০.২৩	৩,৫০০	০.২৬	**৬.৪৬**	১,২২৩	৪,৭০০	৩.৮৪
১১.৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১,২৩৩	০.৩৪	২,১০০	০.৩১	**১.৭০**	৯৯৫	০.৪২	৩,২৫০	০.২৪	**৩.২৭**	২,২২৮	৫,৩৫০	২.৪০

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১১.৫	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	**১,৯৫৬**	০.৫৩	**৩,৫০০**	০.৫১	**১.৭৯**	৬,৮৭১	২.৯০	**১২,২৫০**	০.৯০	**১.৭৮**	৮,৮২৭	**১৫,৭৫০**	১.৭৮
১১.৬	**কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ:** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা) (ক)	-	০	২,০০০	০.২৯	**-**	-	০	**৩৮,০০০**	২.৭৯	**-**	-	৪০,০০০	-
১১.৭	**হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ:** (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা)			২,০০০	০.২৯				**৩৮,০০০**	২.৭৯			৪০,০০০	
১২	**শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস**	**১,৩৫২**	০	**৭,৭০০**	**১**	**৫.৭০**	**২,৬৭৪**	**১**	**৬২,৯০০**	**৫**	**২৩.৫২**	**৪,০২৬**	**৭০,৬০০**	১৭.৫৪
১২.১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮৮	০.০৮	**৫,৫৫০**	০.৮১	**১৯.২৭**	৩৯৫	০.১৭	**৫৫,৭০০**	৪.০৯	**১৪১.০১**	৬৮৩	**৬১,২৫০**	৮৯.৬৮

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ: (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা)			৫,০০০					**৫৫,০০০**				৬০,০০০	
১২.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**১৭৯**	০.০৫	**৪৫০**	০.০৭	**২.৫১**	**১৮৬**	০.০৮	**১,৩৫০**	০.১০	**৭.২৬**	৩৬৫	**১,৮০০**	৪.৯৩
১২.৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৫৮	০.১০	**৫৫০**	০.০৮	**১.৫৪**	**১,২২৬**	০.৫২	**২,৬০০**	০.১৯	**২.১২**	১,৫৮৪	**৩,১৫০**	১.৯৯
১২.৪	প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩২০	০.০৯	**৫০০**	০.০৭	**১.৫৬**	৩৮২	০.১৬	**৭৫০**	০.০৬	**১.৯৬**	৭০২	**১,২৫০**	১.৭৮
১২.৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২০৭	০.০৬	**৬৫০**	০.০৯	**৩.১৪**	৪৮৫	০.২০	**২,৫০০**	০.১৮	**৫.১৫**	৬৯২	**৩,১৫০**	৪.৫৫
১৩	**পরিবহন ও যোগাযোগ**	**১০,৮৫৮**	**২.৯৬**	**১৪,৮১০**	**২.১৫**	**১.৩৬**	**৬১,১৭০**	**২৫.৮০**	**১,০৮,২০০**	**৭.৯৪**	**১.৭৭**	**৭২,০২৮**	**১,২৩,০১০**	১.৭১
১৩.১	সড়ক পরিবহনও মহাসড়ক বিভাগ	৪,৯০০	১.৩৪	**৬,৫০০**	০.৯৫	**১.৩৩**	২৮,০৪২	১১.৮৩	**৩৬,৫০০**	২.৬৮	**১.৩০**	৩২,৯৪২	**৪৩,০০০**	১.৩১
১৩.২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩,৯৮৪	১.০৯	**৫,৫০০**	০.৮০	**১.৩৮**	১৩,৫৫৮	৫.৭২	**২২,০০০**	১.৬১	**১.৬২**	১৭,৫৪২	**২৭,৫০০**	১.৫৭
১৩.৩	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়	৭৮৩	০.২১	**১,১৮০**	০.১৭	**১.৫১**	৪,৩৫৪	১.৮৪	**২২,৫০০**	১.৬৫	**৫.১৭**	৫,১৩৭	**২৩,৬৮০**	৪.৬১
১৩.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪৯	০.০১	**৬৫**	০.০১	**১.৩৩**	৩,৯৮৩	১.৬৮	**৪,৫০০**	০.৩৩	**১.১৩**	৪,০৩২	**৪,৫৬৫**	১.১৩

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১৩.৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	**১,১৩৫**	০.৩১	**১,৫৫০**	০.২৩	**১.৩৭**	**১,৪২০**	০.৬০	**৩,২০০**	০.২৩	**২.২৫**	২,৫৫৫	**৪,৭৫০**	১.৮৬
১৩.৬	সেতু বিভাগ	৭	০.০০	১৫	০.০০	**২.১৪**	৯,৮১৩	৪.১৪	১৯,৫০০	১.৪৩	**১.৯৯**	৯,৮২০	১৯,৫১৫	১.৯৯
১৪	**সুদ**	**৬৮,৫৮৯**	**১৮.৭১**	**১,০৫,০০০**	**১৫.২৭**	**১.৫৩**	-		-		-	**৬৮,৫৮৯**	**১,০৫,০০০**	১.৫৩
১৪.১	অভ্যন্তরীণ	৬২,০০০	১৬.৯১	৮০,০০০	১১.৬৩	**১.২৯**	-				-	৬২,০০০	৮০,০০০	১.২৯
১৪.২	বৈদেশিক	৬,৫৮৯	১.৮০	২৫,০০০	৩.৬৪	**৩.৭৯**	-				-	৬,৫৮৯	২৫,০০০	৩.৭৯
১৫	**বিবিধ ব্যয়**	**৫,১০৩**	**১.৩৯**	**১৩,০০০**	**১.৮৯**	**২.৫৫**	-				-	**৫,১০৩**	**১৩,০০০**	২.৫৫
১৫.১	খাদ্য হিসাব (নিট)	৫৯৭	০.১৬	১২,০০০	১.৭৫	**২০.১০**	-		-		-	৫৯৭	১২,০০০	২০.১০
১৫.২	ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	৪,৫০৬	১.২৩	১,০০০	০.১৫	**০.২২**	-		-		-	৪,৫০৬	১,০০০	০.২২
১৬	**গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়** (R—1 & D: Research, Innovation, Diffusion and Development (RID&D) (আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ৪ লক্ষ কোটি টাক—অর্থাৎ বছরে ৮০ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	২০,০০০	২.৯১	-	-	০.০০	**৬০,০০০**	০.০০	-	-	**৮০,০০০**	-

সারণি ৫ চলমান.....

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২*		২০২২-২৩		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২১-২২ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২২-২৩ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যত গুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১৭	**গণপরিবহন মন্ত্রণালয়** (আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকা—অর্থাৎ বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা)	-	০.০০	২০,০০০	২.৯১	-	-	০.০০	**৮০,০০০**	০.০০	-	-	**১,০০,০০০**	-
	মোট	**৩,৬৬,৬০৩**	**১০০**	৬,৮৭,৬৫৮	**১০০**	**১.৮৮**	**২,৩৭,০৭৮**	**১০০**	**১৩,৬২,৩৭৮**	**১০০**	**৫.৭৫**	৬,০৩,৬৮১	২০,৫০,০৩৬	৩.৪০
নোট:														
১	পূর্বের 'অনুন্নয়ন ব্যয়'কে নতুন প্রবর্তিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে 'পরিচালন ব্যয়' হিসেবে দেখানো হয়েছে * (দেখুন, বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৬)।													
২	উন্নয়ন কার্যক্রম = এডিপিবহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর + এডিপিবহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প + স্কিম (পূর্বের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি) + বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি * (দেখুন, বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৬)।													
৩	পরিচালন ব্যয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ভর্তুকি ও প্রণোদনা অন্তভুক্ত রয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফান্ড এবং রপ্তানি সহায়তা বাবদ ১০,৩২৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে * (দেখুন, বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৭)।													
৪	২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রাক্কলিত উন্নয়ন ব্যয়ে বিশেষ প্রয়োজনে প্রদেয় উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ৯১৪ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে * (দেখুন, বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৭)।													
৫	কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয়ে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম খাতে প্রণোদনা বাবদ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ৮,৪২৫ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে * (দেখুন, বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প. ১২)। আমাদের প্রস্তাবে কৃষি খাতের উন্নয়ন বরাদ্দে প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত।													
(*)	খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজনে পেনশন ও ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত আছে।													

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাত

আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হলো "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণখাত। এই খাতে এখন সরকারি বরাদ্দ ৩৪ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ 'কভিড-১৯'-এর লকডাউন-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় এবং সামনের দিকে অনিশ্চয়তা—এসব কারণে আমরা এ বরাদ্দ ১২.৭৬ গুণ বাড়িয়ে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি; এর মধ্যে আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান বাজেট ৯ হাজার ১২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৬ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৪ হাজার ১৯০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৬ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এখনকার বাজেট বরাদ্দ ৪ হাজার ৭১১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৭ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ৯ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৮ হাজার ৭৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

এখানে সবিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে অন্তত আগামী ৫ বছরের জন্য "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতের আওতায় আমরা বেশকিছু নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রস্তাব করছি। এসবই হবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন (অবশ্য এ নিয়ে ভাবা যেতে পারে)। আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

(১) আজকের এবং ভবিষ্যতের প্রবীণ মানুষদের অবদান, জনসংখ্যায় প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'উন্নয়ন-ধাক্কায়' প্রবীণদের পিছলেপড়া আর জীবনের ভঙ্গুরতা-একাকীত্ব-নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধির কারণে আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন **'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ'** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। এ লক্ষ্যে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করছি।

(২) **দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ (গ্রাম-শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা):** প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ কোটি টাকাসহ (৮৫ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন ও ১৫ হাজার কোটি টাকা অনুন্নয়ন/ পরিচালন বাজেট) আগামী ৫ বছরে (২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকা;

(৩) **নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ** (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা) প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা;

(৪) **আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিকাশ বিভাগ:** প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা;

(৫) **শিশুবিকাশ বিভাগ:** প্রস্তাবিত বরাদ্দ—আসন্ন অর্থবছরে ৬০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ৩ লক্ষ কোটি টাকা;

(৬) **বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষসহ):** প্রস্তাবিত বরাদ্দ—আসন্ন অর্থবছরে ৬০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ৩ লক্ষ কোটি টাকা; এবং

(৭) **সার্বজনীন পেনশন বিভাগ:** আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৬০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে (২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৫)।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত

আমাদের প্রস্তাবনায় বিকল্প বাজেটে মোট ১৭টি বৃহৎবর্গীয় খাতের মধ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি' ১১তম বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্তিযোগ্য খাত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে সরকারি বরাদ্দ এখন ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫২ হাজার ১৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি, যার মধ্যে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে বর্তমান ২ হাজার ৮৬ কোটি টাকার বরাদ্দ ১৫.৪ গুণ বৃদ্ধি করে ৩২ হাজার ১২০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে ২৫ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকার বরাদ্দ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ৫২ হাজার ১৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। আর বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেটে আমাদের প্রস্তাবে আছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ হাজার ৩০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ২২ হাজার ৭০ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিতরণে ২০ হাজার ৫০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বাজেট বরাদ্দ—আমাদের নতুন প্রস্তাব, যা সরকারের বাজেটে ভিন্নভাবে দেখানো হয় না। বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় আমরা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছি। আমরা এসব বলেছি এ জন্য যে—আমরা প্রকৃতি-পরিবেশ ও উন্নয়নের যোগসূত্রে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের মারাত্মক ঋণাত্মক অভিঘাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

পরিবহন ও যোগাযোগখাত

পরিবহন ও যোগাযোগখাতে বর্তমান সরকারি বরাদ্দ (২০২১-২২ অর্থবছরে) ৭২ হাজার ২৮ কোটি টাকা। বিকল্প বাজেটে আমরা এ বরাদ্দ ১.৭১ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ১০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। উপখাত হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য বর্তমান সরকারি বরাদ্দ ৩২ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩ হাজার কোটি টাকা, সেতু বিভাগে ৯ হাজার ৮২০ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১৯ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৩২ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪২ হাজার কোটি টাকা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান বরাদ্দ ৫ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৪ হাজার ৩২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা, এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বর্তমান বরাদ্দ ২ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪ হাজার ৭৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে অনেক যৌক্তিক কারণেই আমরা অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এসব কারণের অন্যতম হলো—শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলা, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি,

সমতাভিমুখী সমাজ-অর্থনীতি গড়ে তোলার ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, এবং সর্বোপরি শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

উল্লেখ্য, সমগ্র পরিবহনব্যবস্থায় জনদুর্ভোগ এবং শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ বছর আমরা "গণপরিবহন মন্ত্রণালয়" (Ministry of Public Transport) নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছি। প্রস্তাবিত গণপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবসহ আগামী ৫ বছরে মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

ঋণের সুদ

বৈদেশিক ঋণের সুদাসল পরিশোধ বাবদ আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)। চলতি বাজেটে বৈদেশিক ঋণের সুদ খাতে সরকারের বরাদ্দ ৬ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা। আমরা চাই, একদিকে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করতে, আর অন্যদিকে পাশাপাশি চাই মূল ঋণ ও সুদ পরিশোধে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে। স্বৈরাচার শাসনামলে যেসব বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছিল, সেসবের দায়ভার নিয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে আলোচনার পক্ষে। এসবই আমাদের নীতিগত অবস্থান। আমরা ঋণগ্রস্ত জাতি হওয়ার দৈন্য দেখাতে চাই না। উল্লেখ্য যে এ বছরের বাজেটে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে "অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসহ ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব দিয়েছি।

যেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের (অর্থবছর ২০২২-২৩) আকার চলমান বাজেটের (অর্থবছর ২০২১-২২) তুলনায় ৩.৪ গুণ বড়, সেহেতু বাজেটের সব খাতেই আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ চলমান বাজেটের তুলনায় বেশি। তবে যেহেতু খাতভিত্তিক বাজেট বণ্টনের কাঠামো নির্ভর করছে আমাদের প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দনির্ধারণী মডেলের ওপর, সেহেতু বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির হার এক নয়। যেমন চলতি বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় বিকল্প বাজেটে *'কৃষি'*তে বরাদ্দ ৫.৭৮ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা) *'শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস'*-এ বরাদ্দ ১৭.৫৪ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৭০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা), যেখানে বাস্তবতা বিবেচনায় প্রস্তাবিত অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ ৬০ হাজার কোটি টাকা); *'গৃহায়ণ'*-এ ১৩.৮৮ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৮৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন বিভাগ "মানুষের জন্য আবাসন" খাতে ৮০ হাজার কোটি টাকা); *স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন'*-এ ২.৪৬ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮৫.৩ শতাংশ স্থানীয় সরকার বিভাগে); *'বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম'*তে ২.৪ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১০ হাজার ৯২০ কোটি টাকা); *'জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা'*য় ১.৪৯ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৪৩ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে জননিরাপত্তা বিভাগে ৭১.৬ শতাংশ); *'জনপ্রশাসন'*-এ ১.৪৯ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা যার ৮২.৩ শতাংশ অর্থ বিভাগে); এবং *প্রতিরক্ষায়* ১.০২ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৩৭ হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা, যার ৯৫ শতাংশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিসে)।

প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে চলমান বাজেটের তুলনায় মোট বাজেটের অংকে যেসব খাতে বৃদ্ধি হবে, সেগুলো হলো: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (চলমান বাজেটের ৫.৭ শতাংশ, কিন্তু বিকল্প বাজেটের ২১.৭ শতাংশ), কৃষি (চলমান বাজেটের ৫.৩ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ৯ শতাংশ), স্বাস্থ্য (চলমান বাজেটের ৪.৫ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ৭.৭ শতাংশ), গৃহায়ণ (চলমান বাজেটের ১.১ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ৪.৩ শতাংশ), এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (চলমান বাজেটের ০.৭ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ৩.৪ শতাংশ) (দেখুন, সারণি-৭)।

প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বড় ধরনের কাঠামোগত বিন্যাস হবে এ রকম যে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, এবং গৃহায়ণ— এই চার খাতে সম্মিলিত বরাদ্দ হবে মোট বাজেটের ৪৫.২ শতাংশ, যা চলমান বাজেটে মাত্র ২৭.৯ শতাংশ; ঠিক একইভাবে কৃষি ও শিল্পের সম্মিলিত বরাদ্দ হবে বিকল্প বাজেটে মোট বরাদ্দের ১২.৪ শতাংশ, যা চলমান বাজেটে ৬ শতাংশ (দেখুন, সারণি ৯)। এসবই যথামাত্রা নির্দেশ করে যে চলমান বাজেটের তুলনায় বিকল্প বাজেটের বরাদ্দকাঠামো অনেক বেশি মাত্রায় আর্থসামাজিক বৈষম্য হ্রাসকারী এবং প্রকৃত মানব উন্নয়নমুখী।

বাজেট শুধু কিছু অর্থেরই বরাদ্দ নয়। তা গুণগত পরিবর্তন সাধন-উদ্দিষ্টও। আর সে কারণেই আমরা বৈষম্য-অসমতা বঞ্চনা-দারিদ্র্য ও উন্নয়নসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যথামাত্রা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। যেমন উৎপাদন ও সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়াদি, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, কৃষি-কৃষক-কৃষিব্যবস্থা, শিক্ষাখাত ও শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যখাত, শিল্পখাত ও শিল্পায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ, প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বিকাশ, প্রকৃতি-পরিবেশ-উন্নয়ন, গবেষণা ও বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা, দুর্নীতি, কালোটাকা, অর্থ পাচার, এবং বাজেট বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি। একমাত্র এসব বিশ্লেষণকে মুখ্য মনে করে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট পাঠ করলেই সম্ভবত বড় পর্দায় বোঝা যাবে প্রকৃত উন্নয়নপ্রবণতা ও সম্ভাবনাচিত্র, বোঝা যাবে তা বৈষম্য হ্রাসকারী এবং প্রকৃতিসম্মানকারী কি না—অর্থাৎ বোঝা যাবে—বড় পর্দায় ছোট ছোট বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয় যোগসূত্র।

যদিও আগামী একবছরের বাজেটের বিষয় নয়, তথাপি আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেট ভাবনায় কিছু ঐতিহাসিক সত্য স্মরণ করা প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা আসলে ঋণগ্রস্ত দেশ নই: ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন-শোষণের আনুমানিক ২০০ বছরে ভারতবর্ষ থেকে ৪৭ ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ শোষণ করেছে—আত্মসাৎ করেছে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে (আজকের বাংলাদেশ) ৫০ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ শোষণ করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের শোষণ করেছে ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার। আমরা সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফোরামে এসব বিষয় উত্থাপনে আগ্রহী। একই সাথে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈশ্বিক আর্থিক বাজার প্রবাহের ওপর টবিন ট্যাক্স ও টেরা ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করতে।

সারণি ৬: বাজেট ব্যয়ের (বরাদ্দে)
খাতওয়ারি অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২১-২২) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩)

খাতওয়ারি বরাদ্দ: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট বরাদ্দ খাত (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বরাদ্দ খাত (কোটি টাকায়)
১ম	জনপ্রশাসন (১,১২,৭১০)	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৪,৩৮,০৫০)
২য়	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (৯৪,৮৭৭)	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (২,৪১,১৭৫)
৩য়	পরিবহন ও যোগাযোগ (৭২,০২৮)	কৃষি (১৮৪,৩০০)
৪র্থ	সুদ (৬৮,৫৮৯)	জনপ্রশাসন (১,৬৭,৮৪৫)
৫ম	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৪২,১৯৩)	স্বাস্থ্য (১,৫৮,০০০)
৬ষ্ঠ	প্রতিরক্ষা (৩৭,২৮১)	পরিবহন ও যোগাযোগ (১,২৩,০১০)
৭ম	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৩৪,৩১৯)	সুদ (১,০৫,০০০)
৮ম	স্বাস্থ্য (৩২,৭৩১)	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (১,০৩,৬০৬)
৯ম	কৃষি (৩১,৯১২)	গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (১,০০,০০০)
১০ম	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (২৯,১২৪)	গৃহায়ণ (৮৮,১০০)
১১তম	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (২৭,৪৮৪)	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (৮৪,২৭০)
১২তম	গৃহায়ণ (৬,৩৪৬)	গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (৮০,০০০)
১৩তম	শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (৪,০২৬)	শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (৭০,৬০০)
১৪তম	বিবিধ ব্যয় (৫,১০৩)	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (৪৩,২৭৬)
১৫তম	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (৪,৯৫৮)	প্রতিরক্ষা (৩৭,৮৮৪)
১৬তম	গণপরিবহন মন্ত্রণালয় **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিবিধ ব্যয় (১৩,০০০)
১৭তম	গবেষণা, উন্নয়ন ও বিচ্ছুরণ মন্ত্রণালয় **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (১১,৯২০)
মোট বাজেট (কোটি টাকায়)	৬,০৩,৬৮১	২০,৫০,০৩৬

সারণি ৭: বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট ও অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩

সম্পদ ব্যবহারের খাতসমূহ	সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট (মোট বাজেটের শতকরা হার)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ (মোট বাজেটের শতকরা হার)
১. জনপ্রশাসন	১৮.৭	৮.২
২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭.০	৫.১
৩. প্রতিরক্ষা	৬.১	১.৮
৪. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪.৮	২.১
৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৫.৭	১১.৮
৬. স্বাস্থ্য	৫.৪	৭.৭
৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৫.৭	২১.৪
৮. গৃহায়ণ	১.১	৪.৩
৯. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	০.৮	০.৬
১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪.৬	৪.১
১১. কৃষি	৫.৩	৯.০
১২. শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	০.৭	৩.৪
১৩. পরিবহন ও যোগাযোগ	১১.৯	৬.০
১৪. সুদ	১১.৪	৫.১
১৫. বিবিধ ব্যয়	০.৮	০.৬
১৬. গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়	**সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত**	৩.৯
১৭. গণপরিবহন মন্ত্রণালয়	**সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত**	৪.৯
মোট (শতাংশ)	১০০	১০০
মোট (কোটি টাকা)	৬,০৩,৬৮১	২০,৫০,০৩৬
জিডিপির শতাংশ	২০.০৪	৬৭.৯১
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৩০,১১,০৬৪ (২০২০-২১ সালের জিডিপি)	৩০,১৮,৪০০ (২০২১-২২ সালের জিডিপি)

৫.৭ বিকল্প বাজেটের আয় আসবে কোথা থেকে?

আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটে সরকারের আয় বাড়বে—চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) সরকার প্রস্তাবিত ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯০ কোটির তুলনায় ৪.৭৬ গুণ এবং দাঁড়াবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা (সারণি ৮)।

৫.৭.১ আয়ের নতুন উৎস

আমরা বাজেটে সরকারের আয়ের ২৭টি নতুন উৎস প্রস্তাব করছি। বাজেটে আয় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত ২৭টি নতুন উৎস হলো নিম্নরূপ: **(১) কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (২) অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (৩) সম্পদ কর, (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ), (৫) বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর (tax on luxury goods), (৬) সংসদ সদস্যসহ অন্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ, (৭) বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, (৮) সেবা থেকে প্রাপ্ত কর, (৯) বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর, (১০) রয়্যালটি ও সম্পদ থেকে আয়, (১১) প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি, (১২) রেলপথ, (১৩) ডাক বিভাগ, (১৪) সরকারের সম্পদ বিক্রয়, (১৫) সেচবাবদ প্রাপ্তি, (১৬) তার ও টেলিফোন বোর্ড, (১৭) টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন, (১৮) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, (১৯) ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন, (২০) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, (২১) বিআইডাব্লিউটিএ, (২২) পৌর হোল্ডিং কর, (২৩) ডিজি থেলথ: বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়গনস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফি (permission and renewal fees), (২৪) ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কোং লাইসেন্স এবং নবায়ন ফিস, (২৫) বিউটিপার্লার সেবালব্ধ কর, (২৬) আবাসিক হোটেল/ গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax), (২৭) বিদেশি পরামর্শ ফি** (সারণি ৮, ১০)।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর অভিঘাত, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলা এবং বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের আয় বাড়াতে হবে। আর সম্ভাব্য কীভাবে তা বাড়তে পারে, তা নিয়ে আমরা আমাদের ধারণাগত মডেল ইতিমধ্যে উপস্থাপন করেছি। সরকারের বাজেটের আয় খাত নিরূপণে সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর করার ক্ষেত্রে আমরা ওই মডেল ব্যবহার করেছি।

৫.৭.২ রাজস্ব প্রাপ্তি

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট রাজস্ব ধরা হয়েছিল ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা। আর আমরা আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে ওই আয় ৪.৭৬ গুণ বৃদ্ধি করে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত করসমূহ

বাজেটে আয়ের উপখাতওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত আয়করসমূহ' সরকারি প্রস্তাবনায় ছিল ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (যা ছিল মোট আয়ের ৮৪ শতাংশ)—আমাদের প্রস্তাবনায় এই আয় ৩.৬৩ গুণ বেড়ে দাঁড়াবে ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার ১০০ কোটি টাকায় (যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ৬৪ শতাংশ)। আয়ের উপখাত **'আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর'** থেকে চলতি অর্থবছরে (অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে) সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা (মোট আয়ের ২৬.৭ শতাংশ)—এই খাতে **আমরা ৫.১০ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি,** যার ফলে এ উপখাত থেকে আয় হবে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (যা প্রস্তাবিত মোট আয়ের ২৮.৬ শতাংশ)। 'মূল্য সংযোজন কর' খাতে আমরা বর্তমানে সরকার প্রস্তাবিত ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার (৩২.৬ শতাংশ) ১.১ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি—ফলে আমাদের প্রস্তাবনায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে 'মূল্য সংযোজন কর' থেকে আয় হবে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা (যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ৭.৫ শতাংশ)।

সারণি ৮: আয়ের বাজেট—
২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেট

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২১-২২: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২২-২৩: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	করসমূহ থেকে প্রাপ্তি					
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ					
১০০	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর	১,০৪,৯৫২	২৬.৭৪	৫,৩৫,৫০০	২৮.৬৪	৫.১০
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	১,২৭,৭৪৫	৩২.৫৫	১,৪০,৭৫০	৭.৫৩	১.১০
৪০০	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য; সংসদ সদস্যসহ অন্যান্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ)	৩৭,৯০৭	৯.৬৬	১,৬০,০০০	৮.৫৬	৪.২২
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৫৬	০.০১	২৫০	০.০১	৪.৪৬
৬০০	আবগারি শুল্ক	৩,৮২৫	০.৯৭	৫,৬০০	০.৩০	১.৪৬
৭০০	সম্পূরক শুল্ক	৫৪,৪৬৫	১৩.৮৮	৪৭,৫০০	২.৫৪	০.৮৭

সারণি ৮ চলমান.....

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২১-২২: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২২-২৩: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর	০	০.০০	৮,৫০০	০.৪৫	-
	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর	০	০.০০	৬,০০০	০.৩২	-
	সম্পদ কর (wealth tax)	০	০.০০	**২,১০,০০০**	১১.২৩	-
	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ)	০	০.০০	৭৫,০০০	৪.০১	-
	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর	০	০.০০	৭,৫০০	০.৪০	-
৯০০	অন্যান্য কর	১,০৫০	০.২৭	২,৫০০	০.১৩	২.৩৮
	মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	**৩,৩০,০০০**	৮৪.০৮	**১১,৯৯,১০০**	৬৪.১২	৩.৬৩
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ		০.০০		০.০০	-
১০০০	মাদক শুল্ক	১৩৮	০.০৪	৩০,০০০	১.৬০	২১৭.৩৯
১১০০	যানবাহন কর	৮০০	০.২০	৬০,০০০	৩.২১	৭৫.০০
১২০০	ভূমি রাজস্ব	১,৮৮২	০.৪৮	২৮,০০০	১.৫০	১৪.৮৮
১৩০০	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	**১২,৬১৭**	৩.২১	১৬,৭০০	০.৮৯	১.৩২
	সারচার্জ	৫৬৩	০.১৪	৯২৬	০.০৫	১.৬৪
	উপ মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ	**১৬,০০০**	**৪.০৮**	**১,৩৫,৬২৬**	৭.২৫	৮.৪৮
	মোট করসমূহ থেকে প্রাপ্তি	**৩,৪৬,০০০**	**৮৮.১৬**	**১৩,৩৪,৭২৬**	৭১.৩৭	৩.৮৬
	কর ব্যতীত প্রাপ্তি					-
১৫০০	লভ্যাংশ ও মুনাফা	২,০৬৪	০.৫৩	৩০,২০০	১.৬১	১৪.৬৩
১৬০০	সুদ	১৫,৫৮৮	৩.৯৭	১২,০০০	০.৬৪	০.৭৭
১৭০০	**রয়্যালটি এবং সম্পদ থেকে আয়**	-	০.০০	১,২০০	০.০৬	-
১৮০০	প্রশাসনিক ফি	৭,২০৮	১.৮৪	১১,২০০	০.৬০	১.৫৫
১৯০০	**জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ**	৪৬৩	০.১২	৮০,৫০০	৪.৩০	১৭৩.৮৭
২০০০	সেবাবাবদ প্রাপ্তি	৫,৪৫৩	১.৩৯	৫,৯০০	০.৩২	১.০৮

সারণি ৮ চলমান.....

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২১-২২: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২২-২৩: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
২১০০	ভাড়া ও ইজারা	৪৫৯	০.১২	১২,০০০	০.৬৪	২৬.১৪
২২০০	টোল	১,০০৪	০.২৬	৯,০০০	০.৪৮	৮.৯৬
২৩০০	অবাণিজ্যিক বিক্রয়	৩,৩২২	০.৮৫	৭,৫০০	০.৪০	২.২৬
২৪০০	সেচবাবদ প্রাপ্তি	-	০.০০	১০০	০.০১	-
২৫০০	প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি	০	০.০০	৯,৫০০	০.৫১	-
২৬০০	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৭,১১২	১.৮১	২৮,৫০০	১.৫২	৪.০১
৩১০০	রেলপথ	০	০.০০	১৫,০০০	০.৮০	-
৩২০০	ডাক বিভাগ	০	০.০০	১,৮০০	০.১০	-
৩৬০০	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ)	০	০.০০	৪,১০০	০.২২	-
	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান)[২]	৩,৪৯০	০.৮৯	-	০.০০	০.০০
	মূলধন রাজস্ব	৩২৭	০.০৮	১,৬০০	০.০৯	৪.৮৯
	তার ও টেলিফোন বোর্ড	০	০.০০	৪,০০০	০.২১	-
	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	৯,৫০০	০.৫১	-
	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	৫,৫০০	০.২৯	-
	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	১,৩০০	০.০৭	-
	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	০	০.০০	৩,৫০০	০.১৯	-
	বিআইডাব্লিউটিএ	০	০.০০	২,৭০০	০.১৪	-
	পৌর হোল্ডিং কর	০	০.০০	২,০০০	০.১১	-
	ডিজি হেলথ : বেসরকারি হাসপাতাল- ক্লিনিক- ডাইগনোস্টিক সেন্টার অনুমতি এন্ড নবায়ন ফিস্	০	০	৪,৫০০	০.২৪	-
	ডিজি ড্রাগস: ঔষুধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য	০	০	৩,২৫০	০.১৭	-
	বিউটিপার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax)	০	০	২,৬০০	০.১৪	-
	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax)	০	০	২,৮০০	০.১৫	-
	বিদেশি পরামর্শক ফি	০	০	৬,৫০০	০.৩৫	-

সারণি ৮ চলমান.....

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২১-২২: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২২-২৩: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি[৩]	০	০	১,৭৭,২২৮	৯.৪৮	-
	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি[৪]	০	০	৭৯,৮৩২	৪.২৭	-
	মোট কর ব্যতীত প্রাপ্তি	**৪৬,৪৯০**	**১১.৮৪**	**৫,৩৫,৩১০**	২৮.৬৩	১১.৫১
	সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি	**৩,৯২,৪৯০**	**১০০.০০**	**১৮,৭০,০৩৬**	১০০.০০	৪.৭৬
	সঞ্চয়পত্র বিক্রয় (**)	৩৭,০০১		৫০,০০০		**১.৩৫**
	ঋণ গ্রহণ (দেশীয় ব্যাংক থেকে)	৭৬,৪৫২		০		০.০০
	বৈদেশিক ঋণ নিট	৯৭,৭৩৮		০		
	সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব	-		৩০,০০০		-
	বন্ড: বিদেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিক, বিভিন্ন কোম্পানি ও অন্যান্য	-		১,০০,০০০		-
	মোট ঘাটতি অর্থায়ন	**২,১১,১৯১**		১,৮০,০০০		০.৮৫
	সর্বমোট	**৬,০৩,৬৮১**		২০,৫০,০৩৬	১০০.০০	৩.৪০

[১] সারচার্জ এ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইটি সারচার্জ অন্তর্ভুক্ত

[২] বৈদেশিক অনুদান যেহেতু পরিশোধযোগ্য নয়, তাই একে সরকারি রাজস্বের সাথে একই গ্রুপভুক্ত করা হয়েছে

*** উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২০), বাৎসরিক বাজেট ২০২১-২২: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, পৃ. ৫, ৩৯। ঢাকা: অর্থ বিভাগ। পূর্ণ অংকে হিসেব করা হয়েছে, দশমিকের পরের অংশ রাখা হয়নি। 'বিবরণ' কলামের বামে যেসব উৎসে 'প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড' উল্লেখ নেই সেগুলো সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের 'বিকল্প বাজেট'-এ প্রস্তাব।**

**** প্রচলিত ব্যবস্থা, নারী সঞ্চয়ী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বিবেচিত।**

[৩] আবুল বারকাত-এর হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ (উৎস: আবুল বারকাত; ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে; পৃ. ৪৯৪-৪৯৫; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিগত ৪৬ বছরে সৃষ্ট মোট পুঞ্জিভূত কালোটাকার মাত্র ২% অর্থাৎ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি টাকা উদ্ধারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৪] আবুল বারকাত-এর হিসেব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫,৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আবুল বারকাত-এর হিসেবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশে মোট পুঞ্জিভূত অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা (উৎস: আবুল বারকাত; ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে; পৃ. ৫০০; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। বিগত ৪৬ বছরের পুঞ্জিভূত মোট অর্থপাচারের মাত্র ১০% অর্থাৎ ৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকার সমপরিমাণ পাচারকৃত অর্থ ২০২২-২৩ অর্থবছরে উদ্ধারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত কর'-এর অন্তর্ভুক্ত খাত-উপখাত বিচারে আমরা প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নতুন কিছু উৎস থেকে আয়ের প্রস্তাব করেছি। যেমন **বিদেশি নাগরিকদের** ওপর ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কর; **সেবা থেকে প্রাপ্ত কর** ৬ হাজার কোটি টাকা; বিমান পরিবহণ ও ভ্রমণ কর ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা– এসবই নতুন উৎস থেকে কর আহরণ প্রস্তাবনা (সারণি ৮)।

আসন্ন অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যহ্রাস এবং কভিড-১৯সহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার অভিঘাত মোকাবিলার কারণে আমরা দু'টো বড় আকারের উৎস চিহ্নিত করেছি, যা "জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর" থেকে আয়ের উৎস হিসেবে নতুন। এ দুটি উৎস হলো **সম্পদ কর** (wealth tax), যা থেকে ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা (যা হবে সরকারের মোট আয়ের ১১.২%) এবং **অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর** (tax on excess profit), যা থেকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা (যা সরকারের আয়ের ৪%) আহরণের প্রস্তাব করেছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর' খাতে আমরা সরকারের বর্তমান নির্ধারিত ১৬ হাজার কোটি টাকা ৮.৪৮ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬২৬ কোটি টাকার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে **উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হচ্ছে মাদক শুল্ক** খাতে বর্তমানে **১৩৮ কোটি টাকা** থেকে **আমাদের প্রস্তাবে ৩০ হাজার কোটি টাকা** (২১৭ গুণ বৃদ্ধি), যানবাহন কর ৮০০ কোটি টাকা থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা, ভূমি রাজস্ব খাতে ১ হাজার ৮৮২ কোটি টাকা থেকে ২৮ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৮)। সরকারের 'মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' ও 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি এবং বৈষম্য হ্রাস ও 'কভিড-১৯'-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এসব প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত।

কর ব্যতীত প্রাপ্তি

চলমান অর্থবছরে **'কর ব্যতীত প্রাপ্তি'** উপখাতে সরকারের প্রস্তাব ৪৬ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা, আর আমরা তা ১১.৫ গুণ বৃদ্ধি করে প্রস্তাব করছি ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩১০ কোটি টাকা। আমাদের প্রস্তাবনা হলো: **লভ্যাংশ ও মুনাফা খাতে এখনকার** (২০২১-২২ অর্থবছরের) **২ হাজার ৬৪ কোটি টাকা থেকে ১৪.৬ গুণ বৃদ্ধি করে ৩০ হাজার ২০০ কোটি টাকা; জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ** উপখাতে **৪৬৩ কোটি টাকা** থেকে **১৭৩** গুণ বৃদ্ধি করে **৮০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা; কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তিতে ৭ হাজার ১১২ কোটি টাকা** থেকে **বৃদ্ধি করে ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা**। এ ছাড়াও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবনায় আছে পৌর হোল্ডিং কর ২ হাজার কোটি টাকা, বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ৪ হাজার কোটি ৫০০ টাকা, ঔষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির লাইসেন্স এবং নবায়ন (প্রতিবছরে) ফি বাবদ ৩ হাজার ২৫০ কোটি টাকা, আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউসের ক্যাপাসিটি কর থেকে ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা এবং বিদেশি পরামর্শক ফি বাবদ ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট কভিড-১৯-এর কল্পনাতীত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও আর্থ-সামাজিক মহামন্দা থেকে উত্তোরিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার বাজেট– যে কারণে সরকারের আয় অনেক বৃদ্ধি করতেই হবে। এ জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মোট **২৭টি নতুন উৎস নির্দেশ করেছি, যা অতীতে ছিল না** (সারণি ৮ দেখুন)।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের ২৭টি নতুন উৎসের মধ্যে মাত্র ৫টি উৎস যেমন- **(১) 'সম্পদ কর' (২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা), (২) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (৭৫ হাজার কোটি টাকা), (৩) অর্থ পাচার রোধ থেকে প্রাপ্তি (৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা), (৪) কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি টাকা) এবং (৫) বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর (আমদানি শুল্কের আওতায়) থেকে প্রাপ্তি (১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা)– থেকেই সরকার মোট ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারেন (সারণি ৬ থেকে হিসাবকৃত)। এই নতুন ৫ উৎস থেকে আহরণসম্ভাব্য মোট আয় হবে আমাদের প্রস্তাবিত মোট বাজেটের ৩১.৬ শতাংশের সমপরিমাণ।**

প্রস্তাবিত এই ৫ উৎসের সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬০ কোটি টাকা দিয়ে সরকার যা যা করতে পারবেন, তা হলো (১) ৯৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি বাস্তবায়ন" (যে কর্মসূচিতে আছে কভিড-১৯-এর লকডাউনের কারণে প্রায় ৭ কোটি মানুষ অভুক্ত-অর্ধভুক্তদের ৬ মাসের বিনামূল্যে খাদ্যসংস্থান)– সহ বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (বরাদ্দ ৬০ হাজার কোটি টাকা), (২) বাজেটে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যখাতের নতুন বিভাগ 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ'– ব্যয় হবে ৬০ হাজার কোটি টাকা, (৩) প্রস্তাবিত 'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ'– ৫ হাজার কোটি টাকা, (৪) দরিদ্র-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য প্রস্তাবিত গৃহায়ণ–৮০ হাজার কোটি টাকা, (৫) কভিড-১৯-এ নিঃস্ব অণু-ব্যবসায়ী প্রায় ৪৭ লক্ষ ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্যবিক্রেতা, চা-পান বিক্রেতাদের জন্য এককালীন ১০ হাজার কোটি টাকা অনুদানসহ অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকা; (৬) প্রস্তাবিত শিশুবিকাশ বিভাগ– ৬০ হাজার কোটি টাকা; (৭) প্রস্তাবিত দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ– ১ লক্ষ কোটি টাকা; (৮) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ ৬ হাজার কোটি টাকা; (৯) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ– ৪০ হাজার কোটি টাকা; (১০) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়– ৮০ হাজার কোটি টাকা; (১১) গণপরিবহণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং (১২) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এখানে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হলো সরকার এসব জরুরি কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা এবং আমাদের নির্দেশিত আয়ের ওইসব উৎসে হাত দেবেন কি–না?

আমরা বাজেট ঘাটতি কমানোর পক্ষে (কারণ ধারকর্জ করে ঘি খাওয়ার কোনো অর্থ নেই)। আমাদের প্রস্তাবিত মোট বাজেট সরকার প্রস্তাবিত চলমান অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৩.৪ গুণ বড়, কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি মোট বাজেটের ৮.৭৮ শতাংশ অথচ চলমান সরকারি বাজেটে তা ৩৪.৯৮ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে দুটি নতুন উৎসের কথা বলা হয়েছে, যা হলো 'বন্ড মার্কেট' এবং 'সরকারি-বেসরকারি যৌথ

অংশীদারিত্ব'। প্রস্তাবিত এ দুটি নতুন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা ৭২.২ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে সক্ষম (যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ৬.৯৫ শতাংশের সমপরিমাণ।

আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় হবে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যা চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সরকারপ্রদত্ত বাজেটের তুলনায় ৪.৭৬ গুণ বেশি। সরকারের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে এই বৃদ্ধি হবে প্রধানত ৩টি কারণে (সারণি ৮ দেখুন): (১) আয়ের বিভিন্ন উৎসে যৌক্তিক বৃদ্ধি; যেমন আয় ও মুনাফার ওপরে কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, লভ্যাংশ ও মুনাফা, জরিমানা-দণ্ড-বাজেয়াপ্তকরণ, টোল, ভাড়া ও ইজারা, সরকারের সম্পদ বিক্রয়। বিভিন্ন উৎসে এ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ থেকে ২১৭ গুণ পর্যন্ত (যেমন মাদক শুল্ক); (২) কোনো কোনো উৎসের ক্ষেত্রে করের হার পরিবর্তন না করে শুধু কর আদায়ের প্রক্রিয়া জোরদার করে যেমন আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর এবং রপ্তানি শুল্ক; (৩) প্রস্তাবিত নতুন উৎসসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি (যেমন ২৭টি নতুন উৎস, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সম্পদ কর, অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর এবং বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর)।

আসন্ন বাজেটে সরকারের আয়ের উৎস নিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রস্তাব হলো অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে ৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা এবং কালোটাকা উদ্ধার থেকে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি টাকা আহরণ করা। এ প্রস্তাব আমরা আগেও করেছি, প্রস্তাবিত আহরণের পরিমাণ ছিল কম। তবে 'কভিড-১৯' বিপর্যয়ের অভিঘাতসহ ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা মোকাবিলা এবং একই সাথে বৈষম্যহীন অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ বছর আমরা আগের তুলনায় বেশি অর্থ আদায়ের প্রস্তাব করছি। অর্থ পাচার রোধ ও কালোটাকা উদ্ধার নিয়ে সরকারপ্রধান দুশ্চিন্তিত এবং বর্তমান সরকার ২০১৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রসঙ্গটি উত্থাপনপূর্বক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পথনির্দেশ হিসেবেই অর্থ পাচার রোধ ও কালোটাকা উদ্ধারসংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা। এ কথা প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য যে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার বৈষম্য বাড়ায়।

এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমাদের প্রস্তাবনায় আমরা সরকারের মোট রাজস্ব প্রাপ্তির যে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকার হিসেব দিয়েছি 'আদর্শ' পরিমাণটা হতে পারে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কারণ, কর ও করবহির্ভূত অনেক উৎস আছে, যেসবে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সাধারণভাবে যা মনে করা হয় প্রকৃত সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি। যেমন আয় ও মুনাফার ওপর কর। আয়কর ফাঁকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আসলে নির্ধারিত আয়কর দেন না; দেশে বড়জোর ১০০-১৫০ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা অথবা তার বেশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে (কর্পোরেট নয়) কর দেন যেখানে এ সংখ্যাটি হবার কথা কমপক্ষে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ব্যক্তি; 'রেন্ট-সিকার'রা বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকি দিতে হেন পথ-পদ্ধতি নেই, যা অবলম্বন করেন না। আবার কালোটাকার মালিক যারা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই মোট আনুমানিক ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকার

কালোটাকা বানিয়েছেন (সারণি ৩), তারা তো তাদের কালোটাকার ওপর কোনো করই দেন না; কারণ কালোটাকার ওপর কীভাবে কর দেবেন। কালোটাকা যদি বৈধ আয়ই না হয়ে থাকে, তাহলে আয়ের ওপর কর অর্থাৎ আয়কর কীভাবে দেবেন, কোথায় দেবেন? আবার কালোটাকা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলে তো সহজেই সরকারের রাজস্ব আয়ের "কর ব্যতীত প্রাপ্তি" খাত থেকে রাজস্ব আহরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। একই কথা তো প্রযোজ্য অর্থ পাচারকারীদের ক্ষেত্রেও (২০১৮-১৯ সালে যার পরিমাণ ৭৫ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা)। আবার ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা ২০ জন, যাদের হাতে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৬০ কোটি টাকার ঋণ স্থিতি আছে তার কী হবে? শ্রেণিকৃত ও মওকুফকৃত ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ? আবার জমি-সম্পত্তি অথবা ফ্ল্যাট কিনে যে দামে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং তা কিনতে আসলে যে মূল্য পরিশোধ করা হয় সে ফারাক-উদ্ভূত রাজস্ব কোথায়? এ থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই কালোটাকার ফাঁদে পড়েন। এসবই 'ওপেন সিক্রেট'। এসবই হলো শর্ষের মধ্যে ভূত। এসব ভূত নিয়ে ভাবনা জরুরি। কারণ, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। আর বড় পর্দায় এসবই আয় বৈষম্য-সম্পদ বৈষম্য-শ্রেণি বৈষম্য দূর করার অন্যতম প্রাকৃতিক পথ।

সারণি ৯: বাজেট আয়ের
রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসসমূহের অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২১-২২) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩)

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২১-২২) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)
১ম	মূল্য সংযোজন কর (১,২৭,৭৪৫)	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর (৫,৩৫,৫০০)
২য়	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর (১,০৪,৯৫২)	সম্পদ কর (২,১০,০০০)
৩য়	সম্পূরক শুল্ক (৫৪,৪৬৫)	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (১,৭৭,২২৮)
৪র্থ	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত) (৩৭,৯০৭)	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য; সংসদ সদস্যসহ অন্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ) (১,৬০,০০০)
৫ম	সুদ (১৫,৫৮৮)	মূল্য সংযোজন কর (১,৪০,৭৫০)
৬ষ্ঠ	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) (১২,৬১৭)	জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (৮০,৫০০)
৭ম	প্রশাসনিক ফি (৭,২০৮)	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (৭৯,৮৩২)
৮ম	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি (৭,১১২)	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (৭৫,০০০) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ)
৯ম	সেবা বাবদ প্রাপ্তি (৫,৪৫৩)	যানবাহন কর (৬০,০০০)
১০ম	আবগারি শুল্ক (৩,৮২৫)	সম্পূরক শুল্ক (৪৭,৫০০)

সারণি ৯ চলমান.....

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২১-২২) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)
১১তম	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান) (৩,৪৯০)	লভ্যাংশ ও মুনাফা (৩০,২০০)
১২তম	অবাণিজ্যিক বিক্রয় (৩,৩২২)	মাদক শুল্ক (৩০,০০০)
১৩তম	লভ্যাংশ ও মুনাফা (২,০৬৪)	করব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি (২৮,৫০০)
১৪তম	ভূমি রাজস্ব (১,৮৮২)	ভূমি রাজস্ব (২৮,০০০)
১৫তম	অন্যান্য কর (১,০৫০)	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) (১৬,৭০০)
১৬তম	টোল (১,০০৪)	রেলপথ (১৫,০০০)
১৭তম	যানবাহন কর (৮০০)	ভাড়া ও ইজারা (১২,০০০)
১৮তম	সারচার্জ (৫৬৩)	সুদ (১২,০০০)
১৯তম	জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (৪৬৩)	প্রশাসনিক ফি (১১,২০০)
২০তম	ভাড়া ও ইজারা (৪৫৯)	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন (৯,৫০০)
২১তম	মূলধন রাজস্ব (৩২৭)	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি (৯,৫০০)
২২তম	মাদক শুল্ক (১৩৮)	টোল (৯,০০০)
২৩তম	রপ্তানি শুল্ক (৫৬)	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর (৮,৫০০)
২৪তম	তার ও টেলিফোন বোর্ড **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	অবাণিজ্যিক বিক্রয় (৭,৫০০)
২৫তম	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর (৭,৫০০)
২৬তম	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিদেশি পরামর্শক ফি (৬,৫০০)
২৭তম	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর (৬,০০০)
২৮তম	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেবাবাবদ প্রাপ্তি (৫,৯০০)
২৯তম	বিআইডাব্লিউটিএ **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	আবগারি শুল্ক (৫,৬০০)
৩০তম	পৌর হোল্ডিং কর **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (৫,৫০০)
৩১তম	ডিজি হেলথ: বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফিস্ **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডিজি হেলথ : বেসরকারি হাসপাতাল- ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফিস্ (৪,৫০০)
৩২তম	ডিজি ড্রাগস: ঔষুধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ) (৪,১০০)

সারণি ৯ চলমান.....

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২১-২২) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)
৩৩তম	বিউটিপার্লার সেবালব্ধ কর (service charge tax) **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	তার ও টেলিফোন বোর্ড (৪,০০০)
৩৪তম	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax) **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (৩,৫০০)
৩৫তম	বিদেশি পরামর্শক ফি **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য (৩,২৫০)
৩৬তম	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax) (২,৮০০)
৩৭তম	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিআইডাব্লিউটিএ (২,৭০০)
৩৮তম	রেলপথ **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিউটি পার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax) (২,৬০০)
৩৯তম	ডাক বিভাগ **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	অন্যান্য কর (২,৫০০)
৪০তম	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ) **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	পৌর হোল্ডিং কর (২০০০)
৪১তম	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডাক বিভাগ (১,৮০০)
৪২তম	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	মূলধন রাজস্ব (১,৬০০)
৪৩তম	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন (১,৩০০)
৪৪তম	সম্পদ কর (wealth tax) **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	রয়্যালটি এবং সম্পদ থেকে আয় (১,২০০)
৪৫তম	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ) **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সারচার্জ (৯২৬)
৪৬তম	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	রপ্তানি শুল্ক (২৫০)
৪৭তম	সেচবাবদ প্রাপ্তি **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেচ বাবদ প্রাপ্তি (১০০)
৪৮তম	রয়্যালটি এবং সম্পদ থেকে আয় **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান) **(অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে অনুপস্থিত)**
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)	**৩,৯২,৪৯০**	**১৮,৭০,০৩৬**

অধ্যায় ৬
শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণতান্ত্রিক বাজেট—উপসংহার

আমাদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে আমরা মোট ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, যা সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৩.৪ গুণ বেশি (চলতি অর্থবছরে সরকারের বাজেট ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা)। আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের আকারই শুধু তুলনামূলক বড় নয়, সেইসাথে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন যেক্ষেত্রে ঘটছে তা হলো মোট বাজেটে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত। চলতি অর্থবছরে সরকারের বাজেটে যেখানে উন্নয়ন : পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত ৩৯ : ৬১, সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ বিকল্প বাজেটে উন্নয়ন : পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত হবে ৬৬ : ৩৪ (সারণি ১০)। অর্থাৎ সহজ কথায়, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কাঠামো প্রচলিত বাজেটের তুলনায় অনেক বেশি উন্নয়নমুখী। কারণ, সরকারের চলতি (২০২১-২২) অর্থবছরের বাজেটে যেখানে মোট ১০০ টাকার বরাদ্দে উন্নয়ন ব্যয় মাত্র ৩৯ টাকা, সেখানে আমাদের প্রস্তাবনানুযায়ী সেটা হবে ৬৬ টাকা। আবার যেহেতু গত বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ৫.৭৫ গুণ বেশি, সেহেতু উন্নয়নে মোট (নিরঙ্কুশ) বরাদ্দও আনুপাতিক হারে ততগুণই বাড়বে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হবে এককথায় নিঃর্শত উন্নয়ন-অভিমুখী। আর একই সাথে বৈষম্য হ্রাসকারী এবং বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে 'সুস্থ প্রবৃদ্ধি' নিশ্চিতকারী।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটকে শুধু উন্নয়নমুখী বলাই যথেষ্ট নয়। খাতওয়ারি বরাদ্দ কাঠামো যা তাতে বলতেই হবে যে—আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ কাঠামো বৈষম্য-দারিদ্র্য নিরসনমুখী, প্রকৃতি-পরিচর্যামুখী, উৎপাদনমুখী, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিমুখী, শিল্পায়নমুখী, কৃষির বিকাশমুখী, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী, মানবসম্পদ ও মানবপুঁজি সৃষ্টি ও তার বিকাশ ত্বরান্বয়নমুখী এবং বিজ্ঞান-উদ্ভাবন-প্রযুক্তি বিকাশমুখী। এসব উপসংহারে উপনীত হবার কারণ অনেক, যার মধ্যে অন্যতম হলো : (১) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সরকার প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে যেখানে মোট বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ৩.৪ গুণ, সেখানে একই সময়ে উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ৫.৭৫ গুণ; আর পরিচালন বাজেট ১.৮৮ গুণ, (২) ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দ-অগ্রাধিকার অধিকতর প্রগতিমুখী।

উল্লেখ্য, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয়-বরাদ্দে 'প্রতিরক্ষা', 'জনপ্রশাসন', ও 'অভ্যন্তরীণ সুদ'—এসব খাতের তুলনামূলক বরাদ্দ-গতি অন্যান্য খাতের চেয়ে কম। এসবও বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট আমাদের

বিকল্প বাজেট বরাদ্দ নিরূপণের ভাবনাভিত্তি-উদ্ভূত (অর্থাৎ বৈষম্যহীন শোভন সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে আমাদের 'বিকল্প বাজেট মডেল'-উদ্ভূত)।

একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট, বিধায় ২০২২-২৩-এর বিকল্প বাজেটে আমরা বেশকিছু নতুন সুনির্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ খাত-উপখাত (যা সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে থাকে না) বরাদ্দসহ প্রস্তাব করেছি যার মধ্যে অন্যতম— কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ প্রতিষ্ঠা; শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন; অনু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); প্রবীণ হিতৈষী (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আবাসন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); আদারওয়াইজ অ্যাবল বা প্রতিবন্ধী মানুষ; আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); হাওর-বাঁওর-বিল-চর অঞ্চলের উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ; কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ; নারীর ক্ষমতায়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); জেনোমিক মেডিসিন; নবজাতক শিশুর থাইরয়েড স্ক্রিনিং; 'স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর নিম্ন ও মধ্য স্তরে ব্যয়বহুল অসংক্রামক (নন-কমিউনিকেবল) রোগের চিকিৎসা (যেমন ক্যানসার, হার্ট, কিডনি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি); জাতীয় অনুবাদ প্রতিষ্ঠান; বাংলা উন্নয়ন বোর্ড; পাঠাগার; গবেষণা উদ্ভাবন বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (প্রতিষ্ঠা); গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (প্রতিষ্ঠা)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি যেহেতু ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য হ্রাস উদ্দিষ্ট একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট, সেহেতু আমাদের বাজেটে শুধু ব্যয়-বরাদ্দ খাতসমূহেই নয় এসব প্রতিফলিত হয়েছে সরকারের রাজস্ব আয় প্রাপ্তির উৎসসমূহেও। আর এ কারণেই রাজস্ব আয় সংগ্রহের যেসব উৎসে আমরা জোর দিয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম হলো—আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর (থেকে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা), সম্পদ কর (২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা), অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (৭৫ হাজার কোটি টাকা), বিলাসী দ্রব্য/পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক (১ লক্ষ কোটি টাকা), মাদক শুল্ক (৩০ হাজার কোটি টাকা), কালো টাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২৮ কোটি টাকা), এবং অর্থপাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (৭৯ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা; আর রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা। আমাদের প্রাক্-অভিজ্ঞতা বলে যে এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি অনেক বড় ঘাটতি। আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি যে এ প্রশ্নটা যারা করবেন, তাদের জন্য "১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি" আসলে মূল প্রশ্ন নয়। আসলে তাদের প্রশ্নটা অন্যত্র—যে প্রশ্ন তারা সম্ভবত উত্থাপন করবেন না। করতে পারবেন না। প্রশ্নটি হলো আয়ের বাজেটে আমরা যে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকার তুলনামূলক 'বড়' রাজস্ব আহরণ করার প্রস্তাব দিয়েছি, যা আহরণে ধনী-সম্পদশালীদের ওপর কর ও করবহির্ভূত চাপ বাড়ানোর কথা বলেছি এবং কালোটাকা ও অর্থ পাচার

উদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছি—এসবই তাদের আসল প্রশ্ন। ১৭ কোটি মানুষের দেশে ধনিক শ্রেণির আনুমানিক ১০-১৫ লক্ষ মানুষ এ প্রশ্ন করবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর তাদের মধ্যে যারা রেন্টসিকিং-লুটেরা-পরজীবী পুঁজির বড় মালিক তারা তো তাদের মালিকানাধীন পত্রপত্রিকা-টেলিভিশন-সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের জনগণতান্ত্রিক প্রকৃতির বাজেটের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন—এটাও স্বাভাবিক। আবার এদের মধ্যে যারা নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতাদর্শ ফেরি করেন, তারা এ প্রশ্নের পাশাপাশি তিরস্কার করে বলবেন—এত কিছু করা রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজ নয়, বলবেন—শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক নিরাপত্তা এসব তো বাজারের কাজ—বাজারের ওপর এসব ছেড়ে দিলে সরকারের 'অযথা' ব্যয়ও করা লাগবে না, বাজেটও বাড়ানো লাগবে না। আপাতত এই বিষয়ে অনর্থক কোনো তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে—যদি কোনো যুক্তিসংগত কারণে ঘাটতি বাজেটে অসুবিধা থাকে (জাপানে বাজেট ঘাটতি ২৮৬ শতাংশ) সেক্ষেত্রে বাজেটে ১ পয়সাও ঘাটতি না রেখে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় অর্থাৎ ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৬ কোটি টাকা দিয়েও মোট বাজেট প্রস্তুত করে শোভন সমাজ বিনির্মাণে অগ্রসর হতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য উন্নয়ন ইতিহাস থেকে একটা কথা বলে রাখা জরুরি যে আজকের উন্নত/ ধনী দেশের প্রায় সবাই যখন উন্নতি করছিল—১৯৩০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়কালে—তখন তাদের সবারই সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ছিল বেশ বেশি, তখন তাদের প্রবৃদ্ধির হারও ছিল বেশি, তখন গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D বা Research and Development) খাতে সরকারি বরাদ্দ ছিল অত্যুচ্চ, এবং তাদের সবারই বাজেট ঘাটতিও ছিল বেশি, আর উচ্চমাত্রার সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ব্যক্তি খাতের বিকাশে বাধাও ছিল না।

সারণি ১০: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০২১-২২ বাজেটের তুলনা

বিবরণ	সরকারের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট	২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
মোট-বাজেট (কোটি টাকায়)	৬,০৩,৬৮১	২০,৫০,০৩৬
পরিচালন ব্যয় (কোটি টাকায়)	৩,৬৬,৬০৩	৬,৮৭,৬৫৮
উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)	২,৩৭,০৭৮	১৩,৬২,৩৭৮
উন্নয়ন- পরিচালন ব্যয় বাজেট অনুপাত	৩৯:৬১	৬৬:৩৪
মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) (কোটি টাকায়)	৩,৯২,৪৯০	১৮,৭০,০৩৬
মোট রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত কর (কোটি টাকায়)	৩,৩০,০০০	১১,৯৯,১০০
মোট রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর (কর ব্যতীত প্রাপ্তিসহ) (কোটি টাকায়)	৬২,৪৯০	৬,৭০,৯৩৬
রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর অনুপাত (শতাংশ)	৪৬:৫৪	৭৭:২৩

সারণি ১০ চলমান.....

বিবরণ	সরকারের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট	২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
রাজস্ব আয়ের প্রধান খাতসমূহ (বরাদ্দকৃত মোট অর্থের নিরিখে)	মূল্য সংযোজন কর; আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর, সম্পূরক কর, আমদানি শুল্ক (প্রচলিত) (যেসব খাতে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা বা বেশি)	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর; সম্পদ কর; কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি; আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য; সংসদ সদ্যসসহ অন্যান্যদের ওপর গাড়ীর শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ); মূল্য সংযোজন কর; জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ; অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি; অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর; যানবাহন কর; সম্পূরক শুল্ক; লভ্যাংশ ও মুনাফা; মাদক শুল্ক ।
বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাতসমূহ (মোট বরাদ্দের পরিমাণের নিরিখে)	(১) জনপ্রশাসন, (২) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ, (৪) সুদ, (৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৬) প্রতিরক্ষা, (৭) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (৮) স্বাস্থ্য, (৯) কৃষি, (১০) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, (১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (১২) গৃহায়ণ, (১৩) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, (১৪) বিবিধ ব্যয়, (১৫) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	(১) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (২) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, (৩) কৃষি, (৪) জনপ্রশাসন, (৫) স্বাস্থ্য, (৬) পরিবহন ও যোগাযোগ, (৭) সুদ, (৮) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৯) গণপরিবহন মন্ত্রণালয়, (১০) গৃহায়ণ, (১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (১২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, (১৩) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, (১৪) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, (১৫) প্রতিরক্ষা, (১৬) বিবিধ ব্যয়, (১৭) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
মোট ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকায়) (মোট বাজেটের শতাংশ)	২,১১,১৯১ (৩৪.৯৮)	১,৮০,০০০ (৮.৭৮)
রাজস্ব আয়ে নতুন খাত/উৎসের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	২৭টি
বাজেটে নতুন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (দপ্তর, অধিদপ্তর) সংশ্লিষ্ট খাত/ উপখাত সংযোজন	**সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত**	**মন্ত্রণালয় ২টি :** (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। **বিভাগ অধিদপ্তর/দপ্তর ১৬টি: (ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন–**(১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ; (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা; (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও

সারণি ১০ চলমান.....

বিবরণ	সরকারের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট	২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
		নারী প্রধান খানা); (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিভাগ;
		(৫) শিশুবিকাশ বিভাগ; (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য; (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ; (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **(গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন—**(১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ; (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ; (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ; (১৫) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (১৬) অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ।
বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা	আছে	নেই
অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা	সীমিত	উল্লেখযোগ্য (সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)
আর্থসামাজিক বৈষম্য-অসমতা নিরসন দর্শন	প্রান্তিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য
কভিড-১৯-এর অভিঘাত মোকাবিলায় বাজেট	উল্লেখযোগ্য নয়	অতি-অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে
আর্থ-সামাজিক মন্দা থেকে উত্তরণে বাজেট	বাহ্যিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য

আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট—বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন করলেই যে ভাইরাস বিপর্যয়সহ বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক মন্দা ও ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা থেকে শোভন বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যাবে—এমনটা মনে করার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই। কারণ, আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থার' ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো হলো প্রকৃতির বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-অধীনস্থতাভিত্তিক তিনটি বৃহৎ-বর্গীয় ভিত্তি-উপাদানের (broad foundational elements or components) দ্বান্দ্বিক সমাহার—সামাজিক ভিত্তি-উপাদান, অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান

এবং রাজনৈতিক ভিত্তি-উপাদান। যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীন রেন্ট সিকার-পরজীবী-লুটেরানিয়ন্ত্রিত, যেখানে জনগণের গণতন্ত্র অনুপস্থিত, যেখানে প্রভুহীন শাসনব্যবস্থা অনুপস্থিত (অর্থাৎ শোভন সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক ভিত্তি-উপাদান অনুপস্থিত), যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসহ উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা নিয়ামক-নির্ধারক, যেখানে এসবে জনগণের মালিকানা অনুপস্থিত (অর্থাৎ শোভন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান অনুপস্থিত), যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় স্বস্বার্থ-ব্যক্তিস্বার্থ-স্বার্থপরতা প্রধান, যেখানে উচ্চসংহতি বোধসম্পন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ, আলোকিত মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুপস্থিত—তা শোভন সমাজব্যবস্থা, শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহায়ক নয়। এত কিছুর পরেও তাহলে বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা কেন? কেন জনগণতান্ত্রিক বাজেট?

বিপজ্জনক অর্থনৈতিক মন্দা, কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় আর এখন ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অনিবার্য মারাত্মক অভিঘাত—এসব থেকে মুক্ত হয়ে প্রস্তাবিত আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌল বিধানের ভিত্তিতে প্রণীত মৌলিক রূপান্তরমুখী এই দলিল বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দৃঢ় অঙ্গীকার। অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুসহ এ দলিল আপাতত গৃহীত হবে কি হবে না, বাস্তবায়িত হবে কি হবে না—এসব প্রসঙ্গ ভবিষ্যতের। আমাদের লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক টালমাটাল-এর বিপর্যয়কালে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরপূর্তি পরবর্তীকালে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করার প্রয়াস নেওয়া। আমাদের অভীষ্ট ছিল সুসংবদ্ধ যুক্তি-তথ্য দিয়ে এ কথা বলা যে—বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আলোকিত মানুষের সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব, বিনির্মাণ সম্ভব 'শোভন সমাজব্যবস্থা', 'শোভন জীবনব্যবস্থা'—এবং সেটাই প্রাকৃতিক বিধি। আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩ সেই প্রয়াসেরই একটি বস্তুনিষ্ঠ-সত্যনিষ্ঠ দর্পণ।

আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট এ জন্য প্রয়োজন যে কাঠামোগত বিচারে একমাত্র এ প্রকৃতির বাজেটই পারে বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটাতে। অন্য কোনো ধরনের বাজেট দিয়ে এই কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ-রূপান্তর (transition and transformation) সম্ভব নয়। আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট বাস্তবায়ন করলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই একদিকে বিপজ্জনক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব, অন্যদিকে একইসাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দারিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান থেকে মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব (দেখুন, ছক ১)। এটাই জনগণতান্ত্রিক বাজেটের মূল উদ্দিষ্ট-অভীষ্ট ও অন্তর্নিহিত শক্তি।

ছক ১: জনগণতান্ত্রিক বাজেট বাস্তবায়নে আগামী ১০ বছরের মধ্যে চলমান বিপজ্জনক বৈষম্য দূর করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন সম্ভব—একটি ধারণাত্মক কাঠামো

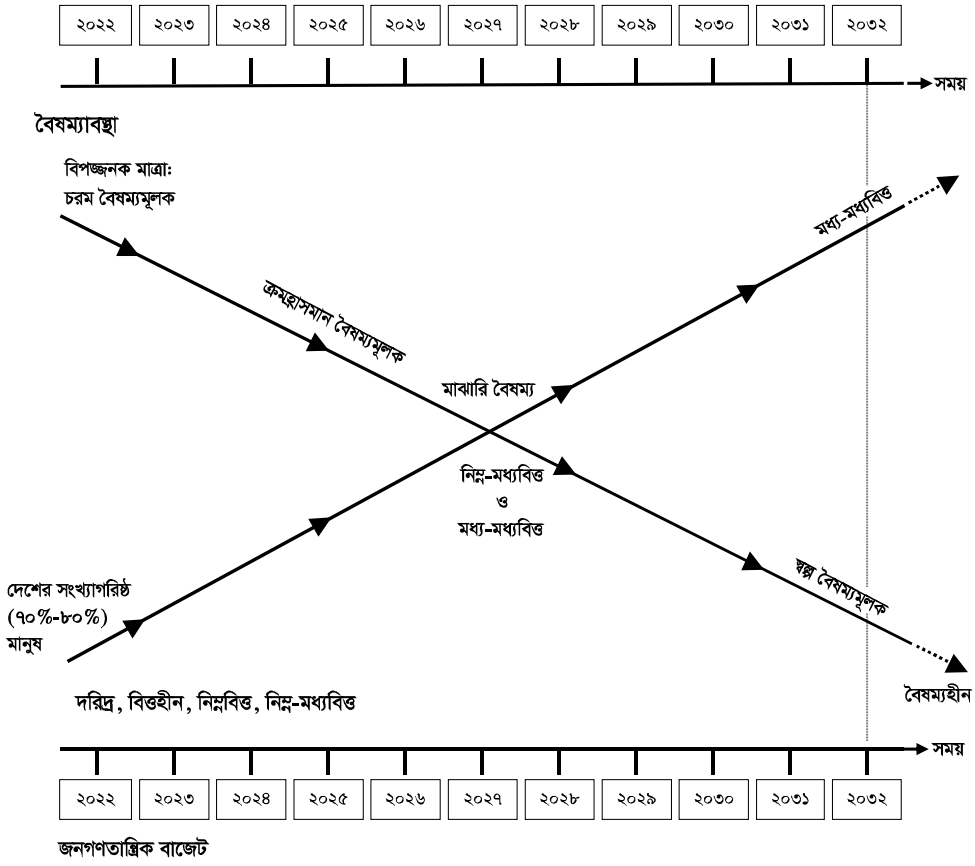

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি:
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে মতবিনিময় সভায়
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(barkatabul71@gmail.com)
ও
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(aynulku@gmail.com)
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০/ ১০ ফাল্গুন ১৪২৮

ভূমিকা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত পরপর মোট ৭টি অর্থবছরে জাতির সামনে **বিকল্প বাজেট** (Altenative Budget) উপস্থাপনের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। আমাদের উত্থাপিত বিকল্প বাজেটের ভিত্তি হলো—মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা; আর লক্ষ্য হলো—শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাতগ্রস্ত এ বছরেও আমরা ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে 'জাতীয় বিকল্প বাজেট' উত্থাপন করব। তবে আজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের নীতিগত বিষয়সমূহ" উত্থাপন করব, যার মধ্যে বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে আমন্ত্রণের মুখ্য বিষয় "জাতীয় রাজস্ব বাজেট"। কভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাতগ্রস্ততার নিরিখে আমরা বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতি প্রস্তাব করতে চাই (যাকে বলা যায় proposal on fundamental principles of the upcoming budget)।

কভিড-১৯-এ চরম ক্ষতিগ্রস্ত সমাজ-অর্থনীতিতে এখন সঠিক প্রশ্নটি হতে পারে এমন—মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 'শোভন সমাজ' (Decent Society) নির্মাণে দেশের বার্ষিক বাজেট কাঠামো কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত? আমরা মনে করি—বার্ষিক বাজেট হতে হবে এমন, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেট কাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি-না? আমাদের বাজেটকে কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে), যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে। একই সাথে সামনের বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হতে হবে সর্বজনীন (universal অর্থে), যার সর্বজনীন অভীষ্ট হবে—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সাথে যে দুই মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন, তা থেকে আমরাও মুক্ত নই। প্রথম মহাবিপর্যয় হলো—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যা মুক্তবাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসাচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। আর দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারি। এ ধরনের অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হলো, একই সাথে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা এবং কভিড-১৯ এর মহাবিপর্যয়** থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং সেটির ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ

উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; (৩) হতে কি পারে না যে ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? এসব নিয়ে আমাদের মূল কথা চার-মাত্রিক (তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)।

আমাদের প্রথম কথা/প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়। এটা আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long-term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis) অবশ্যম্ভাবী। আর এ সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনও একই সাথে ঘটেনি—তা ঘটেছে এবার। তা হলো একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, আর অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ কোথায় তা এখনও অজ্ঞাত; অনিশ্চয়তাহেতু যার শেষ অভিঘাতও কারো জানা নেই)। অর্থাৎ বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রুগি এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এই রুগিকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে ২০২২ সালের এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি-কিছু যায়-আসে, তা নয়। তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য স্বীকার করা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতেও খুব যায়-আসে না। কারণ, কভিড-১৯ এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে আয় বৈষম্য-ধনসম্পদ বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরের বাজেট আমরা বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব নাকি মুক্তবাজার আর কর্পোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে; মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু নিরসন হবে না বৈষম্য-অসমতা এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য; হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

আমাদের দ্বিতীয় কথা/দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সাথে এই প্রবণতায় করোনাকালীন অভিঘাত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ (হতে পারে ১ শতাংশেরও ভগ্নাংশ)। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে, করোনার লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরম দরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদণ্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা করোনার সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্রগোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিলেন না—যাদের নাম 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনও হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরো একটা বিষয় এর আগে কখনও ঘটেনি—আর তা হলো দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে বাধ্য হয়ে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural forced migration)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকে গ্রামেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) আর অন্যদিকে লকডাউনের কারণেই Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা ও সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের বোজোস কী করে মাত্র ১ দিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার নবসংযোজন করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছে। এসবের ফলে আয় বৈষম্য (income inequality), সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality), শিক্ষা বৈষম্যসহ (education inequality)—বৈষম্যের সব ধরনই বেড়েছে। আমাদের হিসাবে আমাদের দেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগ**-এর মান লকডাউনের আগে ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের পরে মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (৩১ মে ২০২০ নাগাদ) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬৩৫-এ; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কতগুণ বেশি)—একই সময়ে ২.৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৫৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশ-এ রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—আয়-সম্পদ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের চেষ্টা করা**।

আমাদের তৃতীয় কথা/তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আরো বাড়ছে-বাড়বে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত—যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প;

কৃষি খাত-শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ। বাস্তবতা হলো, কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে। অনিশ্চয়তাহেতু (uncertainty) সম্ভবত সামনে আরো হবে—যদি সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদের হাতে টাকা-পয়সা নেই; অনেকেই যা-কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। এসবের সাথে এখন যোগ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত। এসব মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে **ব্যাপক ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসবের একটা অর্থ হলো, বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল—সংকোচনমূলক নয়।**

আমাদের চতুর্থ কথা/চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন জিনিসপত্তরের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। এ কথা মিথ্যা নয়। তবে যে কথা তারা বলেন না, তা হলো—**মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দাকালে মূল্যস্ফীতি ঘটেনি, ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/ মূল্যসংকোচন; আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/ মূল্যসংকোচন'-এর সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গুঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তিনীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে চারটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার লক্ষ্যে **বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দুটো বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:**

<u>প্রথম যা ভাবা প্রয়োজন</u>: আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো (১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর (wealth tax) **আরোপ করা, (২) সুপার-ডুপার ধনীদের ওপর কর হার বাড়ানো, (৩) শেয়ারবাজার ও বন্ডবাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে গুটিকয়েক ব্যক্তিই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক), (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা** (tax on excess profit), **(৫) কালোটাকা উদ্ধার করা (৬) পাচারকৃত অর্থ** (money laundering) **উদ্ধার করা।** এসবই আজকের আলোচ্য বিষয়—রাজস্ব বাজেটের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

<u>দ্বিতীয় যা ভাবা প্রয়োজন</u>: সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থান-এর

যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনও তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই (এখনকারটা হতে পারে 'Green New Deal'; প্রকৃতির প্রতি সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক 'নিউ ডিল')।

বিকল্প বাজেট ২০২২-২৩: ভাবনা-ভিত্তি

সমগ্র বিশ্ব এখন কভিড-১৯-এর মহামারিতে মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও কভিড-১৯ মহামন্দা রোগে বিধ্বস্ত। এদিকে আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং ২০২১ সালে '১৯৭১'-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলাম। আর ঠিক সে সময়েই কভিড-১৯-এর মহামারিতে লকডাউনের কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র—সবকিছুই বিপর্যস্ত। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণভিত্তিক একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। করোনা ভাইরাসের বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে, করোনা-বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা জানি এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়; অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া নয় "প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব। সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—করোনা-১৯ এর মহামারি-বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর জোর দেবার এবং অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা হলো নিম্নরূপ:

(১) ***সাংবিধানিক ভিত্তি:*** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

> "৭ (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*
>
> (২) *জণগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) ***রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:*** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে, কভিড-১৯ এর মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সাথে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমূলক। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে নব্য-উদারবাদীরা মানুষের জীবন ও জীবিকার মৌল ক্ষেত্রসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়ার কথা এখন আরো জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন যে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন পুঁজিবাদ যথেষ্ট মাত্রায় নেই দেখেই যত সমস্যা; বলছেন "সরকারই হলো সমস্যার মূলে"; বলছেন সমাজ (society) বলে কিছু নেই; বলছেন সরকারের এখন উচিত হবে যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের দিয়ে দেওয়া—তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধনী দেশের যারা এসব প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তারা কিন্তু সম্ভাব্য সবধরনের সংরক্ষণবাদ নীতি (protectionist policy) অবলম্বন করেই ধনী হয়েছেন; তবে ধনী হওয়ার পরে "উপরে ওঠার মইটি লাথি মেরে সরিয়ে" (kicked away the ladder) মুক্তবাজারে আমাদের খেলতে বলছেন। এসবই হলো দ্বিচারিতা (hypocrisy)।

(৩) ***দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত:*** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি, যেসব খাত দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক (long term social positive impact); যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি সম্মানসহায়ক; যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহায়ক।

(৪) ***কভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:*** কভিড-১৯ এর সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) ***আয় ও ব্যয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:*** সংগত কারণেই বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'।

(৬) ***বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:*** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ দ্বিবিধ—আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও কর্পোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপোসমূলক অবস্থান)।

(৭) ***রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিত্তবান-ধনীদের ওপর যুক্তিসংগত চাপ প্রয়োগ:*** করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যেমন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্তদের আমরা কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ সমীচীন মনে করি না। আমরা মনে করি, চাপ প্রয়োগ দরকার ধনিকশ্রেণি-সম্পদশালীদের ওপর। ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা সম্পদ, আয় এবং মুনাফার অর্থমূল্য কম প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক কর প্রদান করেন না—তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন, তা শক্তভাবে নিশ্চিত করা জরুরি। একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি।

(৮) ***পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:*** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে; ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস করে না—উল্টো তা বৈষম্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৯) ***কোনো আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক:*** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনও ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে—অথচ

প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক, যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়।

(১০) ***উন্নয়নদর্শন ও কভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলার কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:*** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই বাজেট বরাদ্দে আমাদের অগ্রাধিকারক্রম হওয়া উচিত হবে নিম্নরূপ: শিক্ষা ও প্রযুক্তি ('শিক্ষা'কে আমরা প্রযুক্তি থেকে ভিন্ন করে শিক্ষা খাতে "শিক্ষা ও গবেষণা" নাম দিয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার পক্ষে), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, জনপ্রশাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য (কৃষির সমান গুরুত্ব), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ (জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সমান গুরুত্ব), সুদ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করছি), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিবিধ ব্যয় (খাদ্য হিসাবসহ)।

(১১) ***দুটি নতুন বিভাগ সংযোজন:*** জাতীয় স্বার্থে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা দুটি নতুন বিভাগ প্রস্তাব করেছিলাম। প্রথমটি, স্বাস্থ্য খাতের অধীনে **'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা (সিস্টেম) বিভাগ'** (কভিড-১৯-এর শিক্ষা থেকে); আর দ্বিতীয়টি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ'** (জনসংখ্যায় প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দুর্দশা বৃদ্ধির কারণে)।

(১২) ***মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়ন:*** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসংগত অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

(১৩) ***আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:*** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি।

(১৪) ***প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:*** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় যেন বৈষম্য হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে

কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবনমান এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ড়) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, সামাজিক সুরক্ষার ভিত সুপ্রশস্ত ও যুক্তিসংগত করার লক্ষ্যে আমরা গত বছরের বিকল্প বাজেটে **"সার্বজনীন পেনশন"** ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে "সার্বজনীন পেনশন" চালু করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন—এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

কভিড-১৯-এর মহামারির মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট হওয়া উচিত সম্প্রসারণশীল, কোনোভাবেই সংকোচনমূলক নয়। আমাদের প্রস্তাব বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে সরকার আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কভিড-১৯ এর বিপর্যয়কর অভিঘাত মোকাবিলা করে আমরা আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে। সবশেষে আমরা আরও একবার জোর দিয়ে বলতে চাই—আমাদের প্রস্তাবের অভীষ্ট হলো—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণ, যার সাথে আন্তর্জাতিক পুঁজি ও দাতাগোষ্ঠীর তথাকথিত "New Normal" অথবা "New Reality" অথবা "Global Reset"-এর সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

---

* *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই দলিল প্রণয়নে যেসব সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম: বিভিন্ন সময়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত); বারকাত, আবুল (২০২০), "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)।*

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের নানা শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যম জুম-এ বাজেট প্রস্তুতি আলোচনা ও মতবিনিময়

খুলনা বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

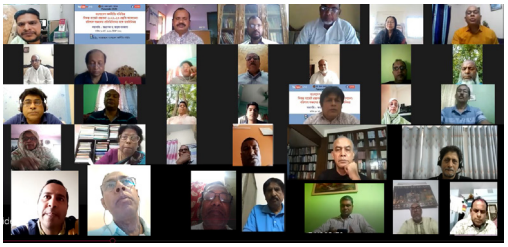

বরিশাল বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

সিলেট বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

একনজরে বিভাগ ও জেলাভিত্তিক বাজেট প্রস্তুতি মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারী জেলা ও শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিবিষয়ক পরিসংখ্যান

তারিখ ও সময়	বিভাগ	জেলা সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী জেলার নাম	অংশগ্রহণকারী জেলার সংখ্যা	জুমে সংযুক্ত	আলোচক সংখ্যা
৪ মার্চ, ২০২২ শুক্রবার বিকেল ৩:৩০ মিনিট	খুলনা	১০	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, নড়াইল, কুষ্টিয়া	৬	১২০	৫১
৮ মার্চ, ২০২২ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭:০০ মিনিট	ঢাকা ও ময়মনসিংহ	১৩	ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা	৭ + ৪ = ১১	১৪৫	৪৩
১১ মার্চ, ২০২২ শুক্রবার বিকেল ৩:৩০ মিনিট	রংপুর ও রাজশাহী	০৪	রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ	৮ + ৭ = ১৫	১৪৩	৭৭
১৮ মার্চ, ২০২২ শুক্রবার বিকেল ৩:৩০ মিনিট	বরিশাল	০৬	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা	৬	১০৮	৪৮
২৫ মার্চ,২০২২ শুক্রবার বিকেল ৩:৩০ মিনিট	সিলেট	০৮	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	৪	১০৭	৫৮
২ এপ্রিল,২০২২ শনিবার বিকেল ৩:৩০ মিনিট	চট্টগ্রাম	০৬	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর,	১০	১৩০	৭৪
মোট	**৮**	**৬৪**	**৫২**	**৫২**	**৭৫৩**	**৩৫১**

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(১) ৮টি বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত; *প্রাক্তন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি*।

(২) মতবিনিময় সভাগুলোয় সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন ড. মোঃ আইনুল ইসলাম; *অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি*।

(৩) নৈকট্য, সাদৃশ্য ও ভূরাজনৈতিক কারণে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: খুলনা বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়"
৪ মার্চ, ২০২২ রোজ শুক্রবার, সময়: ৩:৩০ মিনিট

সমস্যা, সম্ভাবনা ও বাজেটে অগ্রাধিকারযোগ্য খাত ও ক্ষেত্র

একনজরে খুলনা বিভাগ

খুলনা বিভাগ বাংলাদেশের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, বিভাগটির আয়তন ২২ হাজার ২৮৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৫,৫৬৩,০০০। খুলনা বিভাগের সদর দপ্তর খুলনা শহর। ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। খুলনা জেলা রূপসা নদী ও ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম নদীবন্দরগুলোর মধ্যে খুলনা অন্যতম। বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় খুলনা শহরকে শিল্পনগরী বলা হয়। খুলনা শহর থেকে ৪৮ কিমি.দূরে মোংলায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। পৃথিবী বিখ্যাত শ্বাসমূলীয় ও পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবন এই বিভাগে অবস্থিত, যার বিস্তৃতি খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায়। খুলনাকে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার বলা হয়। রাজধানী ঢাকা থেকে খুলনা শহরের দূরত্ব সড়কপথে ৩৩৩ কিমি.। রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে স্থলপথ, আকাশপথ, জলপথ ও রেলপথ ব্যবহার করা যায়। ১৯১২ সাল থেকে এই অঞ্চলে নদীপথে পৃথিবী বিখ্যাত প্যাডেলচালিত স্টিমার চলাচল করে। যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, খুলনা জেলা নিয়ে এই বিভাগটি গঠিত। শোভন ও সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গঠনে খুলনা বিভাগের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে জাতীয় বাজেটে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন।

খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-যশোর-নড়াইল-কুষ্টিয়া

১. যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার সংযোগস্থল ভবদহ অঞ্চলের ছোট-বড় ৫২টি বিল ও ১২০টি গ্রাম তথা কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলায় বিস্তৃত দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএমসহ নদ-নদী, খাল খনন ও সংস্কারের মাধ্যমে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাজেট বরাদ্দ জরুরি।

২. সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশালের উপকূল অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং লবণ পানির ক্ষতিকর প্রভাব রুখতে গত শতাব্দীর ৬০-এর দশক ও তারও আগে বেড়িবাঁধ/পোল্ডার তৈরি করা হয়। ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, আম্পান ও ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত ওইসব বেড়িবাঁধ মেরামত এবং লবণপানি ও বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলের জনবসতি, কৃষি, মৎস্য প্রকৃতি, পরিবেশ রক্ষায় টেকসই প্রকল্প প্রণয়নে বাজেটে বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ দরকার।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত পাট শিল্পের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে খুলনা-যশোর অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনার খালিশপুরের মৃত পাটশিল্প নগরী পুনরুদ্ধার, রক্ষা এবং পুনরায় আধুনিক রূপে চালু করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ জরুরি।

৪. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে রেলযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ক) বেনাপোল-যশোর-খুলনা-মোংলা, খ) বেনাপোল-যশোর-সাতক্ষীরা-শ্যামনগর-মুন্সিগঞ্জ, গ) ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ-নড়াইল-যশোর বিদ্যমান প্রকল্পের কাজ দ্রুত এবং আধুনিকায়ন করতে এবং খুলনা-যশোর-দর্শনা ডাবল লাইন সড়ক নির্মাণসহ খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা-ঈশ্বরদী সম্পূর্ণ ডাবল লাইন মহাসড়ক নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ জরুরি।

৫. পদ্মা সেতু-মোংলা বন্দর-পায়রা বন্দর-ভোমরা ও বেনাপোল স্থলবন্দর পরিবেষ্টিত এলাকার অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিকে বহুমাত্রিক ও গতিশীলকরণে সমন্বিত জাতীয় মহাসড়ক সংযোগ সড়ক ক্ষেত্রবিশেষে চার-ছয় লেনে উন্নীতকরণ ও আধুনিকায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ দরকার।

৬. পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক শিল্পায়নের দ্বার উন্মোচিত করবে। এ বাস্তবতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করে শিল্পায়ন বিকাশে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ করা গুরুত্বপূর্ণ।

৭. বিশ্ব ঐতিহ্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন ও মোংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে পরিবেশ রক্ষাকারী পর্যটন প্রসারে বরাদ্দ জরুরি।

৮. উপকূলজুড়ে মিঠাপানির প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধার নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ করা দরকার।

৯. লবণসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন ও মৎস্যসম্পদ সম্প্রসারণে কৃষি ও মৎস্য গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

১০. ভোমরা স্থলবন্দরের আধুনিকায়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ করা জরুরি।

১১. মোংলা বন্দরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নদ-নদীসমূহের ড্রেজিংয়ের কাজে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

১২. সদ্যপ্রতিষ্ঠিত খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা এবং প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণসহ খুলনা ও সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের পরিসর বৃদ্ধি করা দরকার।

১৩. যশোরের ঝিকরগাছার গদখালীতে ব্যাপকভাবে ফুলচাষ হচ্ছে, যা দেশে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এই শিল্পের প্রসারে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বরাদ্দ করা জরুরি।

১৪. যশোরের অভয়নগরের নওয়াপাড়ায় আধুনিক নদীবন্দর স্থাপন এবং ভৈরবসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদ-নদীর নাব্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রমে বাজেটে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তা : কুষ্টিয়ার খাজানগরের রাইস মিল

কুষ্টিয়া শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা সড়কের খাজানগরে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় চাল শিল্প। ১৯৭৮ সালে হাসকিং মিল স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম এখানে চালকল ও চাতাল ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমানে খাজানগরসহ আশপাশের এলাকায় ৪২টি অটো রাইস মিল এবং ৪০০ হাসকিং (ম্যানুয়াল) মিল আছে। দেশের চালের চাহিদার ৩০ শতাংশ জোগান যায় খাজানগর থেকে। প্রতিদিন গড়ে ২০০ ট্রাক চাল সারা দেশে যায়, যার বাজারমূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা। এ ছাড়া খুদ, কুঁড়া, পালিসহ ধানের অন্যান্য অংশ মিলিয়ে খাজানগর মোকামে দৈনিক ২০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়। বর্তমানে সব মিলিয়ে ১৫ হাজার লোক এখানে কর্মরত।

তবে অটো রাইস মিলের সাথে খাজানগরের হাসকিং মিলগুলো অসম প্রতিযোগিতার টিকতে না পেরে রুগ্‌ণ শিল্পে পরিণত হচ্ছে। এসব হাসকিং মিল রক্ষা করা না গেলে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বেন। তাইড়

১. চাল উৎপাদনপর্যায়ে নগদ সহায়তা এবং শ্রমিকদের ভিজিএফ কার্ডের আওতায় আনতে হবে।

২. পর্যাপ্ত ধারণক্ষতাসহ চালের গুদাম তৈরির বরাদ্দ বাজেটে রাখতে হবে।

৩. হাসকিং মিলমালিকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে সরাসরি চাল ক্রয় ও বাফার স্টক গড়ে তুলতে হবে।

৪. হাসকিং মিলের উন্নয়ন ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

পানিতে ক্ষতিকর আর্সেনিক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২০১৬ সালের তথ্যমতে দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক ঝুঁকিতে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তাইড়

১. আর্সেনিকের কবল থেকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি রোধকল্পে বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় সরকারিভাবে পর্যাপ্তসংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন ও পানিবিশুদ্ধকরণ ফিল্টার স্থাপনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

২. কুষ্টিয়ার কুষ্টিয়া পৌরসভা অঞ্চলে গড়াই নদের পানি বিশুদ্ধ করে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন

কুষ্টিয়ায় তামাক চাষ: খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে লাখো মানুষ

বর্তমানে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, জাপান টোব্যাকো কোম্পানি লি., আবুল খায়ের কোম্পানি লি. এবং আদ্দ-দীন টোব্যাকো কোম্পানি লি. তামাক উৎপাদন উৎসাহিত করতে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ, সার, কীটনাশক, বীজ সরবরাহ করে থাকে। ফলে খাদ্যশস্য ধান, গম, পাট, আখ, ভুট্টা ও সবজির আবাদ ক্রমশ হ্রাস পেয়ে তামাক চাষ বাড়ছে। তাইড়

১. তামাক চাষ বন্ধে কৃষকদের বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।

২. তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে ক্যানসার ও প্রতিবন্ধী সমস্যার নিরসন এবং তাদের পুনর্বাসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. ধান, গম, পাট, আখ, ভুট্টা ও সবজির আবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বাজেটে কৃষকদের নগদ সহায়তা, বীজ-সার-কীটনাশক ও কৃষি উপকরণ ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

৪. কৃষি ফসলের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রণয়ন: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, খুলনা; সুকুমার ঘোষ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, মশিয়াহাটি কলেজ অভয়নগর, যশোর; ড. বিশ্বাস শাহীন আহম্মেদ, স্কুল পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; অধ্যাপক শাহানারা বেগম, বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল; অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; শাহেদ আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

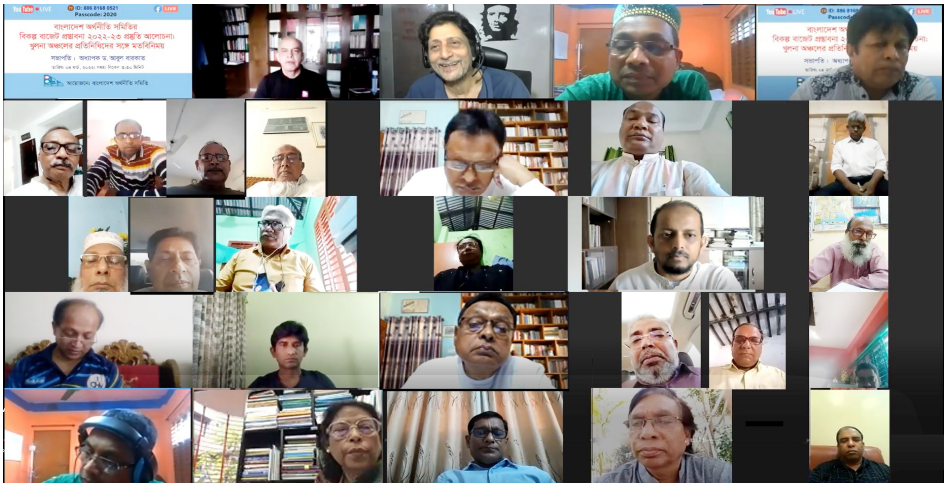

খুলনা বিভাগের ওয়েবিনার মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় **সভাপতি:** অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত **সঞ্চালক:** অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	সুকুমার ঘোষ	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, মশিয়াহাটী কলেজ অভয়নগর, যশোর
২.	ড. বিশ্বাস শাহীন আহম্মেদ	স্কুল পরিদর্শক; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৩.	শেখ মাসুদুল্লাহ	সরকারি চাকরিজীবী; ডেপুটি চিফ অব প্লানিং, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ মোংলা, বাগেরহাট
৪.	শাহানারা বেগম	অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫.	ইকবাল কবীর জাহিদ	সমাজ উন্নয়নকর্মী; প্রধান উপদেষ্টা, ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি
৬.	ডা. শেখ বাহারুল আলম	চিকিৎসক; সহ-সভাপতি, বিএমএ খুলনা বিভাগ
৭.	রবীন্দ্র দেবনাথ	সমাজকর্মী; সদস্যসচিব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন পরিষদ
৮.	সাব্বির হোসেন	অধ্যাপক; চেয়ারম্যান; খলিশখালী ইউনিয়ন, তালা, সাতক্ষীরা
৯.	ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
১০.	হাফিজুর রহমান	সাংবাদিক, নড়াইল কণ্ঠ
১১.	কুদরত-ই-খুদা	আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী; আহ্বায়ক, পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদ
১২.	খলিলুর রহমান	শ্রমিকনেতা; সভাপতি, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল এমপ্লইজ ইউনিয়ন
১৩.	গৌরাঙ্গ প্রসাদ রায়	কৃষকনেতা; সভাপতি, জাতীয় কৃষক সমিতি খুলনা

১৪.	আবু বক্কর সিদ্দিক	আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী; আহ্বায়ক, পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি কেশবপুর, যশোর
১৫.	রনজিৎ কুমার বাওয়ালী	কৃষক; ডুমুরতলা, অভয়নগর, যশোর
১৬.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
১৭.	মাহফুজুর রহমান মুকুল	পরিবেশকর্মী; বিভাগী সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি, খুলনা বিভাগ
১৮.	বাবুর আলী গোলদার	উন্নয়নকর্মী; পরিচালক, পাজিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা, পাজিয়া, কেশবপুর, যশোর
১৯.	শাহেদ আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
২০	সাবিনা ইয়াসমিন	সিনিয়র শিক্ষিকা, দামোদর এম এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফুলতলা, খুলনা
২১.	রাসেল বিশ্বাস	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, ফুলতলা, খুলনা
২২.	রিজিয়া পারভীন	ভাইস চেয়ারম্যান, বাগেরহাট সদর উজেলা বাগেরহাট
২৩.	কৃষ্ণপদ মুন্ডা	পরিচালক, সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়,(সাম্‌স) মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২৪.	অসিত কুমার মুন্ডা	প্রতিনিধি, আদীবাসী, মুন্ডা সম্প্রদায়, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২৫.	মো. এনামুল ইসলাম দুর্জয়	বালিয়াদহা, খালিশখালী, তালা, সাতক্ষীরা
২৬.	কাজী জাভিব খালিদ পাশা	সমাজ উন্নয়ন কর্মী; নির্বাহী পরিচালক, ইনিশিয়েটিভ অব রাইট ভিউ (আইআরভি) খুলনা
২৭.	মেরিনা যুথি	সমাজ উন্নয়ন কর্মী; ইডি (আইআরভি) খুলনা
২৮.	সৈয়দ আশরাফ আলী	ব্যাংকার; বঙ্গপ্রদীপ, কুয়েট রোড, ফুলবাড়ী, খুলনা
২৯.	মাসুদা বেগম বিউটি	গবেষণা সহযোগী, পাজিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা, কেশবপুর যশোর
৩০.	মাসুদ আলম	সাংবাদিক, জেলা প্রতিনিধি, প্রথম আলো, যশোর।
৩১.	পাভেল চৌধুরী	অধ্যক্ষ সরকারি মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ ঝিকরগাছা, যশোর
৩২.	প্রতাপ কুমার বিশ্বাস	ব্যাংকার; এজিএম, বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক, খুলনা
৩৩.	এনামুল হক বাবুল	সাবেক মেয়র; সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অভয়নগর উপজেলা, যশোর
৩৪.	শাহজালাল হোসেন	ব্যবসায়ী; সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সার ব্যবসায়ী সমিতি, অভয়নগর যশোর
৩৫.	গাজী নওশের আলী	কৃষকনেতা, ফুলতলা খুলনা
৩৬.	হান্নানা বেগম	অধ্যাপক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৩৭.	ড. মোঃ সাইদুর রহমান	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৮.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৯.	পার্থ সারথী ঘোষ	এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪০.	মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী	ব্যবসায়ী; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিসেন্ট অ্যাসোসিয়েট এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪১.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ; কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪২.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৩.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৪.	ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৫.	ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৬.	ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৭.	নেছার আহমেদ	ব্যাংকার; ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্যাংক এশিয়া, বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৮.	মেহেরুননেছা	নারী উদ্যোক্তা, নরসিংদী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৯.	মোহাম্মদ আকবর কবীর	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫০.	মোঃ আখতারুজ্জামান খান	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ বরিশাল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫১.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

একনজরে খুলনা বিভাগের ওয়েবিনার মতবিনিময়ে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ

- দক্ষিণাঞ্চলের নদী প্রবাহের কেন্দ্র ভৈরব নদের সঙ্গে মাথাভাঙ্গা নদীর সংযোগের বিষয়টি বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক জলাধার নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- খাদ্যশস্য ও সবজি পরিবহনের জন্য এ অঞ্চলে একটি এয়ারকার্গো বিমানন্দর নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কুটির শিল্পকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে করোনাপরবর্তী বেকারত্ব নিরসনে বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- উপজেলাভিত্তিক সাইলো নির্মাণ করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- খুলনা বিভাগের রেলওয়ে কনটেইনার পোর্ট নির্মাণ করতে বাজেটে জরুরি বরাদ্দ প্রয়োজন।
- জাতীয় বাজেটের ৫০ শতাংশ কৃষিতে বরাদ্দ দিতে হবে।
- যথাযথভাবে বাস্তবায়নে 'বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং সেল' গঠন করতে হবে।
- মাওয়া সেতু পাশ্ববর্তী এলাকায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততার জন্য দায়ী চিংড়ি চাষ বন্ধ করে কৃষিচাষ বিকাশে বাজেটে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- দুগ্ধ উৎপাদন শিল্প বিকাশে বাজেটে প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন।
- পদ্মা সেতুর উপকরণ ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ করা উচিত।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষকের জন্য শস্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলনে বাজেটে বরাদ্দ রাখা উচিত।
- পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করে খুলনায় শিল্প বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর শাদ্রী ভাষা রক্ষায় জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকতে হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি রক্ষায় কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নে বাজেটে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা জরুরি।
- দক্ষিণাঞ্চলে সেচ্ছুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১১০০ হেক্টর জমিতে কোনো ধরনের ধান চাষ করা যায় না। এ অবস্থা নিরসনে বাজেটে বিশেষ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন।
- খুলনা বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও মুক্তমঞ্চ নির্মাণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- কুষ্টিয়ার চালকল মিলের জন্য বাজেটে ভর্তুকি বরাদ্দ দিতে হবে।
- করোনাপরবর্তী সময়ের মতো কুষ্টিয়ার চালকল শিল্পের জন্য বিশেষ প্রণোদনা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ জরুরি।
- কুষ্টিয়ার চাল শিল্পের জন্য গ্যাসের সংযোগ প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী-শাহাজাদপুর অঞ্চলে তাঁতী ও তাঁত শিল্প রক্ষায় বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।

- যশোরে ফুল চাষ প্রসার ও কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে বিশেষায়িত কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- যশোর মেডিক্যাল কলেজে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নড়াইলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নড়াইলে সারের জন্য একটি বাফার গুদাম নির্মাণ করতে হবে।
- নড়াইল জেলাকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্প বিকাশে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- বাগেরহাটের খান জাহান আলী বিমানবন্দর দ্রুত কার্যকর করতে বাজেট বরাদ্দ থাকা উচিত।
- খুলনায় সদ্য চালু হওয়া খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু করতে বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ প্রয়োজন।
- খুলনায় প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ করতে হবে।
- খুলনার শিরোমণি অঞ্চলের অর্থনৈতিক জোন ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- খুলনার শ্যামনগরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- ভবদহ অঞ্চলের বেড়িবাঁধ দখল করে মাছ চাষ বন্ধে বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

৮ মার্চ, ২০২২ রোজ মঙ্গলবার; সময়: সন্ধ্যা ৭:০০টা

একনজরে ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগ বাংলাদেশের অষ্টম প্রশাসনিক বিভাগ। ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলা নিয়ে এই বিভাগ গঠিত। ১৮২৯ সালে ঢাকা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল রাজধানী ঢাকা বিভাগেরই অংশ ছিল। ২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারি সরকার ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনের ঘোষণা দেয়। শুরুতে ঢাকা বিভাগের উত্তর অংশ থেকে প্রতিবেশী ৮টি জেলা নিয়ে এবং পরে ৬টি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এ সময় টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জবাসী ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে অনীহা প্রকাশ করে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকার দাবি জানায়। এ বিভাগের আয়তন ১০ হাজার ৪৮৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১,১৩,৭০,০০০ জন (২০১১)। উপজেলার সংখ্যা ৩৫টি, পৌরসভা ২৭, ইউনিয়ন ৩৫১ এবং গ্রামের সংখ্যা ৭২৪৬টি।

ময়মনসিংহ বিভাগের প্রধান প্রধান সমস্যা

৪টি জেলা নিয়ে ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ময়মনসিংহ বিভাগ যাত্রা শুরু করেছে। নতুন এ বিভাগটির উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তা যথেষ্ঠ নয়। ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো। সম্ভাবনাময় ময়মনসিংহ বিভাগের নানাবিধ সমস্যাবলীর আলোকে নিম্নে উপস্থাপিত বিভিন্ন খাত ও ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা জরুরি।

জেলা	প্রধান সমস্যাবলী	ভুক্তভোগী	মন্তব্য
ময়মনসিংহ	১। ব্রহ্মপুত্র নদের নাব্য ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে ২। শহরের রাস্তাঘাটে যানজট লেগেই থাকে ৩। ধান ও মাছ বাজারজাতকরণ সুবিধা নেই ৪। রেলওয়ে জংশন থাকলেও মান খুবই নিম্ন ৫। ট্রেন যোগাযোগ সুবিধার চরম অভাব রয়েছে ৬। সামান্য বৃষ্টি হলেই শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ৭। পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ও ভঙ্গুর	সাধারণ মানুষ	জাতীয় বাজেট বরাদ্দ দরকার
জামালপুর	১। নদীভাঙ্গন রোধে কার্যকর উদ্যোগে তীব্র অভাব রয়েছে ২। শিল্প প্রকল্প হলেও ধীর গতির কারণে কর্মসংস্থান সংকট ৩। বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন ৪। ভালো ফলন হলেও গুদামজাতকরণের তীব্র সমস্যা রয়েছে ৫। জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্প রক্ষায় সরকারি	বেশির ভাগ মানুষ	জাতীয় বাজেট বরাদ্দ দরকার

	উদ্যোগের অভাব ৬। ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে মানুষের ভোগান্তি সীমাহীন ৭। যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা		
শেরপুর	১। কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই ২। আখ, পান আবাদে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ৩। শেরপুরে অতীতে আখ ও পান যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত হলেও এখন তা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে ৩। একসময় পাটের উৎপাদনের আধিক্য থাকলেও এখন পাট উৎপাদনের জন্য সরকারি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই ৪। প্রয়োজনীয় হলেও রেল যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই ৫। কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের কোনো পরিকল্পিত সুবিধা নেই	কৃষক, উপজাতি ও দরিদ্র মানুষ	জাতীয় বাজেট বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা দরকার
নেত্রকোণা	১। উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া ২। উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ অধ্যুষিত এলাকার পরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন না করা ৩। হাওর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের ৪। কংস নদ রক্ষার ব্যবস্থা না করা ৫। কৃষি উৎপাদন বাজারজাতকরনের ভালো ব্যবস্থা নেই ৬। সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুবিধা খুবই অপ্রতুল ৭। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্প এখানে খুবই কম ৮। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত	উপজাতি ও দরিদ্র মানুষ	জাতীয় বাজেট বরাদ্দ দরকার

প্রণয়ন: অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; পার্থ সারথী ঘোষ, এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর; অধ্যাপক ড. এম আব্দুস সাত্তার, উদ্যোক্তা, নরসিংদী; কামাল হোসেন, চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড; কমরেড অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত, সিপিবি চেয়ারম্যান; শংকর সাহা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; সজল কোরায়শী, প্রধান সমন্বয়ক, নাগরিক মঞ্চ, ময়মনসিংহ শেরপুর; মলয় মোহন বল, সিনিয়র সহ-সভাপতি, শেরপুর প্রেসক্লাব, জামালপুর; অধ্যাপক এ জেড এম রেজাউল করিম খান, বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ; মোঃ ফজলে এলাহি মাকাম, সভাপতি, জামালপুর প্রেসক্লাব নেত্রকোণা; জিয়াউল কবির, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নেত্রকোণা সরকারি কলেজ; কামাল হোসেন, জেলা প্রতিনিধি, যমুনা টিভি এবং দৈনিক যুগান্তর, কিশোরগঞ্জ; ড. মোঃ মহিউদ্দিন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কিশোরগঞ্জ; মোহাম্মদ আকবর কবীর, সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় সভাপতি: অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সঞ্চালক: অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	ড. গাজী হাসান কামাল	অধ্যাপক; চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ
২.	মোঃ আমানউল্লাহ	অধ্যাপক; অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ
৩.	ড. মোঃ আবুল হাসেম	অধ্যাপক; পশুবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
৪.	ড. মোঃ হামিদুল ইসলাম	অধ্যাপক; কৃষিশক্তি ও যন্ত্র বিভাগ, বাংলাদেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
৫.	কমরেড এমদাদুল হক মিল্লাত	আইনজীবী; সভাপতি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ময়মনসিংহ
৬.	শংকর সাহা	ব্যবসায়ী; জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৭.	সজল কোরায়েশী	সমাজ উন্নয়ন কর্মী; প্রধান সমন্বয়ক, নাগরিক মঞ্চ ময়মনসিংহ
৮.	গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া	মেয়র; শেরপুর পৌরসভা, শেরপুর
৯.	আসাদুজ্জামান রওশন	ব্যবসায়ী; সভাপতি, শেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
১০.	মোঃ ইমরানউদ্দিন	সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, শেরপুর সরকারি কলেজ
১১.	মোঃ শরিফুর রহমান	সাংবাদিক; সভাপতি, শেরপুর প্রেসক্লাব
১২.	ড. মোঃ সাইদুর রহমান	অধ্যাপক; কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
১৩.	পার্থ সারথী ঘোষ	ব্যাংকার; এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

১৪.	জিয়াউল কবির	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নেত্রকোণো সরকারি কলেজ
১৫.	কামাল হোসেন	সাংবাদিক; জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তর, স্টাফ রিপোর্টার, যমুনা টিভি
১৬.	এ জেড এম রেজাউল করিম	অধ্যাপক; প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ
১৭.	মোঃ ফজলে এলাহী মাকাম	সাংবাদিক; সভাপতি, জামালপুর জেলা প্রেসক্লাব
১৮.	মোঃ আনোয়ার সাদাত	অধ্যাপক; সভাপতি, বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন
১৯.	ড. এম আব্দুস সাত্তার	অধ্যাপক; উদ্যোক্তা, নরসিংদী
২০.	গিরীন্দ্র কুমার রায়	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ
২১.	মঞ্জুরুল হক গাজী	সাংবাদিক, কাপাশিয়া, গাজীপুর
২২.	এনায়েতুর রহমান	প্রকৌশলী; হাওর গবেষক, সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড
২৩.	মুরাদ হোসাইন	সাংবাদিক; দৈনিক আমাদের সময় ও সভাপতি, গোপালগঞ্জ জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন
২৪.	মোঃ ওয়ালিউল্ল্যাহ	মুদ্রণ ব্যবসায়ী; প্রকাশক; টাঙ্গাইল
২৫.	কামরুন্নাহার কাঁকন	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি নাজিমুদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর
২৬.	মেহেরুন নেছা	নারী উদ্যোক্তা; নরসিংদী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
২৭.	হান্নানা বেগম	অধ্যাপক; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
২৮.	ড. মোঃ আইনুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
২৯.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩০.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩১.	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ	ফেলো চার্টার্ড অ্যাকউন্টেন্ট; পরিচালক ও বোর্ড চেয়ারম্যান, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লি. ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩২.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৩.	মোহাম্মদ আকবর কবীর	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৪.	ড. মোঃ সাইদুর রহমান	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৩৫.	মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী	ব্যবসায়ী; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিসেন্ট অ্যাসোসিয়েট এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৬.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৭.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ; কলেজিয়েট গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৮.	ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৯.	শাহানারা বেগম	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ নড়াইল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪০.	ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪১.	ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৩.	নেছার আহমেদ	ব্যাংকার; ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্যাংক এশিয়া এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ
• ময়মনসিংহ বিভাগে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখা জরুরি। • ময়মনসিংহ বিভাগের সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সরাসরি রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। • ময়মনসিংহ বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। • ময়মনসিংহ বিভাগের জনসংখ্যা বৃদ্ধিও কারণে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ জরুরি। • ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে উত্তরাঞ্চলের ব্রডগেজ রেলযোগাযোগ স্থাপনে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। • ময়মনসিংহ বিভাগে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাজেটে প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন। • ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দুটি সেতু নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন। • ময়মনসিংহ বিভাগের হাওড়াঞ্চলে ভাসমান পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। • হাওড়া অঞ্চলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। • ময়মনসিংহ বিভাগে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্প মেকানাজাইশনের জন্য বাজেটে বিদ্যমান বরাদ্দ দ্বিগুণ করা জরুরি। • নিম্ন আয়ের মানুষ ও শ্রমিকদের কম দামে পণ্য ক্রয়ের জন্য কার্ড ব্যবস্থা প্রচলন করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। • ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিটি ইউনিয়নে ডেইরি শিল্পের মেকানাইজেশনের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। • ময়মনসিংহ বিভাগের হাজারো চায়ের দোকানে প্লাস্টিকের ওয়ানটাইম গ্লাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করে মাটির তৈরি গ্লাস প্রচলনের জন্য মৃৎ শিল্পের বিকাশে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। • কৃষিনির্ভর ময়মনসিংহ বিভাগের কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য মেইল ট্রেন পুনরায় চালুর জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা প্রয়োজন। • আড়িয়াল খাঁ নদের খননকাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া দরকার। • জামালপুরে স্থগিত হয়ে যাওয়া টানেল নির্মাণের কাজ শুরু করতে বাজেটে দিকনির্দেশনা ও বরাদ্দ রাখতে হবে। • জামালপুরে নদীভাঙ্গন রোধে জাতীয় বাজেটে কার্যকর বরাদ্দ রাখতে হবে। • জামালপুরে ৫০০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া জরুরি। • জামালপুরের তীব্র নদীভাঙ্গন কবলিত পাঁচটি উপজেলার জন্য বাজেটে প্রকল্প প্রয়োজন। • জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের জিল বাংলা চিনিকলকেন্দ্রিক আখচাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিকরণে

বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন।

- জামালপুরের ইসলামপুরে বিলুপ্তপ্রায় কাঁসা শিল্প রক্ষায় বাজেটে স্বল্প সুদ ও প্রণোদনাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ জরুরি।
- শেরপুর জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- ময়মনসিং জেলায় ডাবল গেজ রেললাইন স্থাপনে জরুরি ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- ময়মনসিংহ জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- ময়মনসিংহ জেলাশহরে তীব্র যানজটের সমস্যা নিরসনে ফ্লাইওভার নির্মাণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- ময়মনসিংহ থেকে সিলেটে রেল যোগাযোগ স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- ময়মনসিহে বিভাগে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- ময়মনসিংহ জেলায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ময়মনসিংহ জেলায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- প্রাকৃতিকভাবে সবধরনের অনুকূল উপযোগিতা থাকায় রাজধানী ঢাকার একাংশ স্থানান্তরিত করে ময়মনসিংহ জেলায় স্থানান্তরিত করার জন্য বাজেটে প্রকল্প প্রণয়ন জরুরি।
- ময়মনসিংহ জেলার কৃষকদের কৃষিপণ্যেও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে প্রান্তিক এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ করতে হবে।
- নেত্রকোণা জেলার বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সড়ক অবকঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া জরুরি।
- নেত্রকোণায় শিল্প বিকাশের মূল অন্তরায় শক্তিসম্পদ ও উদ্যোক্তার অভাব নিরসনে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- নেত্রকোণার হাওড়াঞ্চলে কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- বিজয়পুর-কলমাকান্দায় স্থলবন্দর পুনরায় চালু করতে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- নেত্রকোণার দুর্গাপুর উপজেলা থেকে বিরিশিরি পর্যন্ত সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার।
- দারিদ্র্যপীড়িত কিশোরগঞ্জে ইপিজেড নির্মাণের ঘোষণা বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- হাওড় অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জে মৎস্যসম্পদ রক্ষায় বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকায় দুই বছর লিজ প্রদান বন্ধ রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কিশোরগঞ্জে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লোকবল ঘাটতি নিরসনে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

- কিশোরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা বাস্তবায়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- কিশোরগঞ্জের কৃষিপণ্য সহজ পরিবহনে পাকুন্দিয়া-কাপাশিয়া-গাজীপুর সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কিশোরগঞ্জে প্রস্তাবিত কৃষি গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- চারটি জেলার সংযোগস্থল গাজীপুরের কাপাশিয়ায় একটি পর্যটনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প প্রয়োজন।
- গাজীপুরে তাজউদ্দীন আহমেদের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- গাজীপুর ভারী শিল্পের শিল্পাঞ্চল হওয়ায় পরিবেশ-প্রতিবেশের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- গাজীপুরের বনাঞ্চলে রক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।
- গাজীপুরে শহরে রেলক্রসিং এলাকায় ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- নরসিংদীর বেলবো, শিবপুর, মনোহরদী ও রায়পুরা উপজেলার লটকন, কাঁঠাল ও বাঁশ চাষের জড়িত মানুষের কভিড ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নরসিংদীর পোলট্রি ও পশুসম্পদ শিল্প রক্ষায় জেলাশহরে একটি পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দরকার।
- নরসিংদী জেলায় পোলট্রি ও পশুসম্পদ বাজারজাত কাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- নরসিংদী জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে।
- নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বর এলাকায় পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে বাজেটে প্রকল্প নেওয়া জরুরি।
- নরসিংদী জেলার স্টেডিয়ামের উন্নয়নকাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দ দরকার।
- মাদারীপুর জেলার পাট চাষিদের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- মাদারীপুরের চরমুগরিয়ার বিলুপ্তপ্রায় বানর প্রজাতিদের রক্ষায় একটিস জেলায় ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- পদ্মা সেতু নির্মাণের সুফল পেতে মাদারীপুর জেলায় শিল্পকলকারখানা প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়

১১ মার্চ ২০২২, সময়: বিকাল ৩.৩০ মিনিট

১. একনজরে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ

১.১ রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী জেলা নিয়ে গঠিত। ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারিতে বাংলাদেশের সপ্তম বিভাগ হিসেবে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রংপুর বিভাগের পূর্ব দিকে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য এবং বাংলাদেশের ময়নসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলা, পশ্চিম ও উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগ অবস্থিত। আয়তন ১৬৩৭৪.০৯১ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৫৭৮৭৭৫৮ জন, শিক্ষার হার ৫১.৫৬ শতাংশ, উপজেলার সংখ্যা ৫৮টি, থানা ৬০, পৌরসভা ৩১, ইউনিয়ন ৫৩৫, গ্রাম ৯০৬৬ এবং নদ-নদীর সংখ্যা ৭৬টি। নদীপথের দৈর্ঘ্য ১৩৩৯ কিলোমিটার, মোট জমির পরিমাণ, ১৮৩২৩৫৮ হেক্টর, আবাদী জমির পরিমাণ ১২৯৫৯১৪ হেক্টর, সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ১০১৬৪৮১ হেক্টর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ২৮২৮২১ হেক্টর, খাদ্যগুদামের সংখ্যা ১৩২টি, খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা ১৬৯৪০০ মেট্রিক টন, গভীর নলকূপের সংখ্যা ৫৫০৮টি এবং ডাকঘর ৯২১টি।

১.২ রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী বিভাগ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহী জেলা নিয়ে গঠিত। ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত বিভাজনের পর রাজশাহী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভাগে পরিণত হয়, যার সদরদপ্তর করা হয় রাজশাহী শহরে এবং সে সময় রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলো ছিল কুষ্টিয়া, খুলনা, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী। ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিভাগের খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর এবং ঢাকা বিভাগের বরিশাল জেলা কর্তন করে খুলনা বিভাগ গঠন করা হয়। ফলে রাজশাহী বিভাগের জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টিতে এবং জেলগুলো ছিল দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ওই ৫টি জেলা রাজশাহী বিভাগ স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৪ সালে এই বিভাগের প্রতিটি জেলার মহকুমাকে জেলাতে পরিণত হয়। ফলে তখন এই বিভাগের মোট জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টিতে। ২০১০ সালে রংপুর অঞ্চলের ৮টি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ গঠন করা হয় এবং রাজশাহী অঞ্চলের ৮টি জেলা নিয়ে বর্তমান রাজশাহী বিভাগ পুনঃগঠিত হয়। এই বিভাগের আয়তন ২৪০৭.০১ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ৩০২৩২১৬ জন (মার্চ,

২০২০ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা), পুরুষ ১৫২৬৩০২ (৫০.৪৯ শতাংশ), মহিলা ১৪৯৬৯১৪ (৪৯.৫১ শতাংশ), সিটি কর্পোরেশন ১টি, উপজেলা ৯, থানা ১৩ (মেট্রোপলিটন এলাকায় ৪), ইউনিয়নের সংখ্যা ৭২, পৌরসভা ১৪, মৌজা ১৭১৮ এবং গ্রামের সংখ্যা ১৯১৪। মোট জমির পরিমাণ ২৪২৫৪০ হেক্টর, আবাদী জমির পরিমাণ ১৮১৩৫১ হেক্টর, সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫৮১৭২ হেক্টর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ৩১৮ হেক্টর, জলাশয় ১৬১৪২ হেক্টর, অবকাঠামো ৪৪৭২৯ হেক্টর। রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বড় শহর অবস্থিত।

ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম দুই বিভাগ রংপুর ও রাজশাহী শোভন ও সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে সে জন্যে নিম্নোক্ত খাত ও ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

২. রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের উন্নয়ন সমস্যা

২.১ উন্নয়ন বৈষম্য ও দারিদ্র্য

উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের। তবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সমানভাবে এ উন্নয়ন হয়নি। বাস্তবতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে সুফল তা রংপুর বিভাগের জনগণ খুব বেশি পায়নি অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সমবণ্টন হয়নি। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের Promoting Prosparity and Fostering Inclusiveness শীর্ষক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) Regional Distribution of Poverty উপ-অনুচ্ছেদ-এ সুস্পষ্ট বলা হয়েছে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সব অঞ্চলে সমভাবে হয়নি। World Bank Poverty Assesment 2019, Volume 2, Estimates based on HIES 2016 অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার যেখানে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুসারে ২৪.৩ শতাংশ, সেখানে সব বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি ৩২.৯ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর জেলাভিত্তিক দারিদ্র্য পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমাভুক্ত ১০টি জেলার মধ্যে ৫টি উত্তরাঞ্চলের। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ ৭০.৮ শতাংশ, যেখানে নারায়ণগঞ্জ জেলায় দারিদ্র্যের হার ২.৬ শতাংশ, মুন্সিগঞ্জে ৩.১ শতাংশ। কোভিড-১৯ নতুন করে দারিদ্র্যের হার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

২.২ শিল্পে অনুন্নত

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ। রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চল পশ্চাৎপদ ও দারিদ্র্যপীড়িত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী। রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। যুগ যুগ ধরে শিল্পখাত রয়ে গেছে অনুন্নত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান অবিভক্ত বাংলার শিল্পের সামান্যই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। বাংলার ১০৮টি পাটকল, ১৮টি লৌহ ও

ইস্পাত কারখানা এবং ১৬টি কাগজকলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে একটিও পড়েনি। বাংলার ৩৮৯টি সুতাকলের মধ্যে মাত্র ৯০টি, ১৬৬টি চিনিকলের মধ্যে মাত্র ১০টি এবং ১৯টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে মাত্র ৩টি পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে পড়ে। ১৯৩৩ সালে দিনাজপুরে প্রতিষ্ঠিত সেতাবগঞ্জ সুগার মিল রংপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। পরে পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। পাকিস্তান আমলে শিল্পখাতে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল, তা ভারী শিল্পখাতে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা এবং দুটি বড় সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলার সঙ্গে যোগাযোগ সহজগম্য না থাকায় সংগত কারণে রংপুর অঞ্চলে খুব বেশি বৃহৎ শিল্পের প্রসার ঘটেনি। এ অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প হিসেবে ১৯৫৪ সালে মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধায় রংপুর সুগার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে ২৮৮৭.০২ একর জমির ওপর বার্ষিক ১৫২৪০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ঠাকুরগাঁও সুগার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৫ সালে রংপুরের শ্যামপুরে ৭৮ একর জমির ওপর ১০১৬১ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ক্ষমতার শ্যামপুর সুগার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৯ সালে পঞ্চগড়ে ১৯৮.৪৬ একর জমির ওপর বার্ষিক ১০১৬০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ক্ষমতার পঞ্চগড় সুগার মিল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৮০টি উৎপাদন ইউনিটে ২০৬০৫৮ জন লোক নিয়োজিত ছিল। কিন্তু রংপুর অঞ্চলে খুব বেশি শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে শিল্প খাত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭২ সালে ৭২টি পাটকল, ৪৪টি বস্ত্রকল, ১৫টি চিনিকল, ২টি সার কারখানা, ১টি ইস্পাত কারখানা, ১টি ডিজেল ইঞ্জিন ইউনিট এবং ১টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ আমলেও এখানে বৃহৎ বা মাঝারি শিল্পের তেমন প্রসার ঘটেনি। বৃহৎ শিল্প হিসেবে ১৯৭৫ সালে দিনাজপুরে দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল, ১৯৭৭ সালে নীলফামারীতে দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল, ১৯৮৪ সালে কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিল এবং ২০০৪ সালে কুড়িগ্রামে কুড়িগ্রাম স্পিনিং মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দেশের সব অঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন সমভাবে হয়নি। সময়ের সাথে সাথে এ বৈষম্য আরো বাড়ছে বলেই প্রতীয়মাণ। লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় আজও বড় কোনো শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি।

Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2005-2006 অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে শিল্পকারখানার সংখ্যা ছিল ১৬০৯৭টি অথচ রংপুর বিভাগে ছিল মাত্র ২৩৯৩টি। ঢাকা বিভাগে ম্যানুফেকচারিং শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ছিল ২২৮৬৪৪১ জনের (৬১.৭৫ শতাংশ) অথচ রংপুর অঞ্চলে ছিল ৬৮৯৬৭ জনের (৩.৬২ শতাংশ)। মোট উৎপাদনে ঢাকা বিভাগের অবদান ছিল ৬১.১১ শতাংশ, সেখানে রংপুর অঞ্চলের অবদান ৩.৬২ শতাংশ। আবার মোট মূল্য সংযোজনের শতকরা হার ঢাকা বিভাগে ছিল ৫৫.৩২, আর রংপুর বিভাগে মাত্র ৬.৫০। Level of Industrialization হিসাবের মাধ্যমে শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। Level of Industrialization মূলত কোনো অঞ্চলে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের শতকরা হারকে বোঝায়।

১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে ঢাকা বিভাগে Level of Industrialization ছিল যথাক্রমে ১৩.৭৫ শতাংশ। ও ১৭.৪১ শতাংশ। সেখানে রংপুর বিভাগের Level of Industrialization ছিল ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে যথাক্রমে ২.১২ শতাংশ ও ১.২৭ শতাংশ। Level of Industrialization-এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ২ শতাংশ পর্যন্ত) ২. মধ্যম শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ছিল ২.০১ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ) এবং ৩. উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ৫.০১ শতাংশ এবং এর উপরে)। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল হলেও রংপুর নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আঞ্চলিক শিল্প concentration বের করার জন্য Location Quotient (LQ) ব্যবহার করা হয়। Location Quotient (LQ) মূলত কোনো অঞ্চলে কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের কর্মসংস্থানের শতকরা হার ও কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের কর্মসংস্থানের শতকরা হারের অনুপাত বোঝায়। Location Quotient-এর মান ০.০০ হতে ০.৫০ হলে Low Concentration, ০.৫১ হতে ১.০০ হলে Medium Concentration, ০.০১ হতে ১.৫০ হলে High Concentration, ০.৫১ থেকে বেশি হলে Very High Concentration ধরা হয়। Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2005-2006 অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে Location Quotient (LQ) ২.৪০, যা very high concentration প্রকাশ করে। আবার রংপুর বিভাগের Location Quotient (LQ) ০.২৭, যা low concentration প্রকাশ করে ।

Economic Census 2013 অনুযায়ী দেখা যায় রংপুর বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ৭৬৩৫৭ টি, যা জাতীয় মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ৮৬৮২৪৪ এর ৮.৭৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ছিল ২৫৭২৪৯টি (২৯.৬২ শতাংশ), চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ১৯২২৯৯টি (২২.১৫ শতাংশ)। রংপুর বিভাগের এই ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ১৯৭১ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৮৮৩, ১৯৭১-৮৯ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ৫৬৭৪, ১৯৯০-৯৯ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ১৪২১৮, ২০০০-০৯ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ৪০৮২৫ এবং ২০১০-১৩ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ১৪৭৫৭টি। রংপুর বিভাগের ৭৬৩৫৭ ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্টের মধ্যে কুটির এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ৫৪১৮৭টি, মাইক্রো এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ২০০৫৯, ক্ষুদ্র এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ১৯৪৮, মাঝারি এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ১২৫টি এবং বৃহৎ এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো মাত্র ৩৮টি। আবার কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেখা যায়, রংপুর বিভাগে মোট কর্মসংস্থান ৩৮৩৩৬৪-এর মধ্যে কুটির এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৮০৯৯০ জনের, মাইক্রো এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান হয়েছে ৭৪১০৯ জনের, ক্ষুদ্র এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান হয়েছে ৭৪৫৬১ জনের, মাঝারি এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৭৯৫১ জনের এবং বৃহৎ এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৫৭৫৩ জনের। রংপুর বিভাগের এস্টাবলিস্টমেন্টে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা বিভাগ থেকে

অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিল্পায়নের সাথে জড়িত কর্মসংস্থান, মোট উৎপাদন, মাথাপিছু মূল্য সংযোজন, মোট মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বিবেচেনা করে দেখা যায় দেশের সব অঞ্চলে সমানভাবে শিল্পায়ন হয়নি। এ ছাড়া দেখা যায়, অকৃষি কাজ, নগরায়ণের পর্যায়, গ্রাম-শহর অভিবাসন, পানি সরবরাহ সুবিধা ও বিদ্যুৎ সুবিধা, যা শিল্পায়নের সাথে ধনাত্মককভাবে সম্পর্কিত এবং বাংলাদেশে তা সব অঞ্চলে সমান নয়।

বাংলাদেশের শিল্পনীতি ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দেখা যায় এগুলোতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দেওয়া হয়নি। ১৯৯৯ সালের শিল্পনীতিতে অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছে। ২০১৬ সালের শিল্পনীতিতে রংপুর বিভাগের ৮টি জেলাকেই শিল্পে অনুন্নত জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শিল্পনীতিতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ এলাকা, সম্ভবনাময় এলাকা এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে। কিন্তু এসবের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। রংপুর অঞ্চলে শিল্প প্রবৃদ্ধির বাধা হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতা। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতি। কিন্তু রংপুর বিভাগে অদ্যাবধি গ্যাস সরবরাহ না হওয়ায় পণ্য উৎপাদন খরচ বেশি। ফলে এ অঞ্চলের উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেন না। বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতিতে অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য কোনো ইনসেনটিভ বা সুবিধার ব্যবস্থা নেই। কোনো শিল্পনীতিতেই এ অঞ্চলের জন্য কোনো আলাদা সুবিধা রাখা হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চল সরকারের কাছ থেকে কম মনোযোগ পেয়ে আসছে। পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি হলেও, তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষ দরিদ্র, বিধায় তাদের শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় পুঁজির তীব্র অভাব। ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প না থাকায় এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন কষ্টকর। এ অঞ্চলের সাধারণ প্রবণতা ব্যবসা কিংবা পণ্য মজুদের চেয়ে শিল্প স্থাপন অনেক বেশি ঝুকিপূর্ণ। ফলে এ অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিরা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে এ অঞ্চল পণ্য পরিবহনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তা জ্ঞানের অভাব, সরকারি প্রণোদনার অভাব এ অঞ্চলের শিল্পায়ন না হওয়ার একটি বড় কারণ। ব্যাংকগুলো ঋণসহায়তা করলেও এ অঞ্চলের তরুণদের উদ্যেক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, আগ্রহ না থাকায় স্টার্ট আপ সম্ভব হচ্ছে না। এ অঞ্চলে নীলফামারীতে উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা রয়েছে, যেখানে মোট ১৮০টি প্লটের মধ্যে মাত্র ২৪টি প্লট ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদন করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত এই রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল থেকে ১৩৩২ দশমিক ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, বিনিয়োগ করা হয়েছে ২০৪ দশমিক ০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ২৬৬২০ জনের। জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের সরবরাহ না থাকায় এখানকার সব প্লট ব্যবহার সম্ভব হয়নি। নীলফামারীর দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। রংপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাবুরহাট, ইসমলামপুর, কালীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, শাহজাদপুর ও করোটিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি মালামাল সরবরাহ

করে থাকেন। কিন্তু সরবরাহকৃত মালামাল পথিমধ্যে আটকে ভ্যাটের চালান দাবি করা হয়। কিন্তু কাপড় সরবরাহের সময় মোকামগুলো ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের চালান প্রদান করে না। এর ফলে প্রতিনিয়তই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের হাতে রংপুরের ব্যবসায়ীদের হয়রানির শিকার হতে হয়।

২.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নে ধীরগতি

স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। রংপুর বিভাগে ৯টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে। অন্যগুলো প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন উৎপাদন শুরু করেছে, তখন এ অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনুমোদন পর্যায়েই রয়ে গেছে। এই বিশেষ অর্থনেতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের তরুণদের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে এ অঞ্চলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, তেমনি কমে যেত দারিদ্র্যের হার।

২.৪ পশ্চাৎপৎ শিক্ষা খাত

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ পিছিয়ে। পুরুষ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও এখনও নারী শিক্ষার হারে পিছিয়ে আছে (৪৯.৩৬ শতাংশ)। প্রাথমিক শিক্ষায় নিট এনরোলমেন্ট বেশি হলেও ড্রপ আউটও বেশি। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এনরোলমেন্ট কম। টারশিয়ারি পর্যায়ে এনরোলমেন্ট আরও কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকপর্যায়ে মানসম্পন্ন স্কুল কম থাকায় গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার খুব অভাব রয়েছে। আর্থিক কারণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশসহ নানাবিধ কারণে উচ্চশিক্ষায় এ অঞ্চলের জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই বাজেটে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। বগুড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই। নীলফামারী জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ প্রয়োজন।

২.৫ সমস্যাগ্রস্ত স্বাস্থ্যখাত

স্বাস্থ্যকর জীবনকাল নিশ্চিতকরণে রংপুর বিভাপের প্রত্যন্ত অঞ্চল অনেক পিছিয়ে। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রাথমিক চাহিদা মেটালেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রয়োজনে মূলত মানুষকে ছুটতে হয় রংপুর শহরের মেডিকেল কলেজ কিংবা প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডাক্তারদের চেম্বারগুলোতে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে অপ্রতুল সেবা, স্বল্প অর্থবরাদ্দ, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবই এর মূল কারণ।

সরকারি নিয়ন্ত্রণে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভাব, প্রশাসনিক অদক্ষতা, পেশাভিত্তিক অসততাসহ প্রভৃতি অসংগতির অবসান না হলে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে লাভ হবে না—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বেসরকারি চিকিৎসা সেবায় ডাক্তারের ফি, ল্যাব পরীক্ষার খরচ, রোগীশয্যার হার, আইসিইউ-সিসিউই খরচসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ রাজধানী ও রাজধানীর বাইরেসহ দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে কত হবে, তা সরকারকে নির্ধারণ করে দিতে হবে।

রংপুরে চিকিৎসা সেবার সুবিধা ব্যাপক গণমানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে না অত্যধিক ব্যয়, সে জন্য চিকিৎসা সেবার ব্যয় কমিয়ে সবার নাগালের মধ্যে নিতে হলে ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রীসহ সংযুক্ত সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট কমাতে হবে। উন্নত লাবরেটরি, উন্নত বেসরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদে আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন, যা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি, এটি বাস্তবায়ন হলে রংপুরে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে এ দেশে দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষেত্রে ও জরুরি চিকিৎসা খাতের উন্নয়নেরর জন্য যাবতীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

হাইওয়ের পাশে প্রতি উপজেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ট্রমা সেন্টার ও বার্ন ইউনিট গঠন করা দরকার।

প্রতি উপজেলায় উন্নত ল্যাব সুবিধা বাড়াতে হবে।

রংপুর বিভাগের প্রান্তিক জেলাগুলোতে হার্ট, কিডনি ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেই।

রংপুরে দরিদ্র এলাকা বিধায় ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবায় সরকারি সহায়তা, স্বাস্থ্যবীমা, চিকিৎসায় ভ্যাট-ট্যাক্স রেয়াত ও চিকিৎসা সেবার মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.৬ অপ্রতুল কর্মসংস্থান খাত

'রংপুর বিভাগে সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল এবং উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগে কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে (বয়স ১৫ বা তার বেশি) ৮৮.৪৬ শতাংশ পুরুষ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু নারীদের মধ্যে মাত্র ৩৬.৩৩ শতাংশ শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত (বিবিএস ২০১১)। রংপুর বিভাগের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হারও কম। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদেশে মোট কর্মসংস্থান হওয়া ১০৪৫৬৪১৮ জনের মধ্যে রংপুর বিভাগ থেকে মাত্র ১০৭৫৭৪ জন অর্থাৎ ১.০৩ শতাংশ। আবার BMET-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১৬ সালে যেখানে মোট রেমিটেন্সের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের অর্জন ৪১.৭৮ শতাংশ,

ঢাকা বিভাগের অর্জন ৩০.৯৮ শতাংশ, সেখানে রংপুর বিভাগের অর্জন মাত্র ০.৮৫ শতাংশ। এ জন্য রংপুর বিভাগ থেকে বিদেশে কর্মী অভিবাসনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। রেমিটেন্সের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। রংপুর বিভাগ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখতে হবে। এ জন্য বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ঋণ সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দক্ষতা ও চাহিদা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বিশেষ প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চলের বিদেশে অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা স্কিম পরিচালনা করতে হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চল থেকে বেশিসংখ্যক মানুষ বিদেশে পাঠাতে বিশেষ নজর দিতে হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বেসরকারি সহায়তা নিয়ে 'ফরেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে বিদেশে অভিবাসনে ইচ্ছুক সম্ভাব্য ব্যক্তিদের লজিস্টিক সহায়তা এবং কারিগরি পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এ অঞ্চলের শ্রমিকেরা মূলত দেশের অন্য অঞ্চলে গিয়ে মৌসুমভিত্তিক কাজ যেমন ধানকাটা , ইটভাটায় কাজ করা, রিকশা চালানো, নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া বিড়ি শ্রমিক ও পাথরভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে প্রচুর নারী ও শিশু কাজ করে, যা কোনো মানদণ্ডেই শোভন কাজের মধ্যে পড়ে না। এ অঞ্চলের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়িয়ে প্রবাসী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

২.৭ অনুন্নত অবকাঠামো

রংপুর বিভাগে অদ্যাবধি রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ ছিল ২২৫ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ ছিল ৫৫১ কেটি টাকা। অথচ রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য কোনো বরাদ্দই নেই। আবার ঢাকা ওয়াসার বরাদ্দ ছিল ২২১১ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম ওয়াসার বরাদ্দ ছিল ৮৭৮ কোটি টাকা। অথচ রংপুর ওয়াসা আজও গঠিতই হয়নি। অর্থাৎ রংপুর বিভাগ এষনও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আর্থিক বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী থেকে ঢাকায় কোনো ডে কোচ সার্ভিস নেই, কোনো আন্তঃনগর ট্রেন নেই, মোগলহাট স্থলবন্দর বন্ধ। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী রেলস্টেশন থেকে ভারতের কোচবিহার রাজ্যের মেখলিগঞ্জ চ্যাংরাবান্ধা রেলষ্টেশনের সংগে ৭৫০ মিটার রেলপথ পুনঃসংযোগ করা হলে ভারত, ভুটান ও নেপালের সাথে ব্যবসা- বাণিজ্যেও সম্প্রসারণ হবে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এ রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়, যা পুনঃসংযোগ হলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।

নীলফামারী জেলার আন্তঃ উপজেলা ও ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহন কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। রাস্তায় জ্যাম থাকায় ১২/১৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

কুড়িগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চল প্রকৃত অর্থেই রাজনৈতিক বৈষম্যের তীব্র শিকার। বিশেষ করে দেশ স্বাধীনের পর থেকে যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে, বলা যায় এ অঞ্চলে প্রতিটি সরকারের বেলায় বিরোধী দলীয় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে। যে কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে এ অঞ্চল বঞ্চিত হয়েছে। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী সন্দিও কুটির জুম্মারপাড় এলাকাটি এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যেখান থেকে সহজেই ভারতের পশ্চিমবাংলার কোচবিহার জেলার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। হতে পারে সীমান্তহাটসহ একটি চেকপোস্ট। এতে সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে এ এলাকাটি।

ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট বিমানবন্দর বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে্। এটি যাত্রী পরিবহন ও মালামাল পরিবহনের জন্য কার্গো বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সৈয়দপুর বিমানবন্দর হতেও কার্গো সার্ভিস চালু প্রয়োজন। এর ফলে ভারত, ভুটান ও নেপালে দ্রুত মালামাল সরবরাহ করা যাবে। এতে বাণিজ্যিক আয় বেড়ে যাবে।

সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। এর উন্নয়ন প্রয়োজন।

২.৮ বন্যা ও নদীভাঙ্গন

নদীভাঙ্গন ও বন্যা এ অঞ্চলের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর নদীভাঙ্গন ও বন্যায় হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবাদি জমি পতিত থাকে, ফসলহানী হয়, বীজতলা নষ্ট হয়, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে ১৬টি নদ-নদী প্রবাহিত। এ নদ-নদীগুলোতে পলি জমে তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে তাদেও আর পানি ধারণের ক্ষমতা থাকে না। ফলে প্রতিবছর বন্যায় নদীপাড়ের মানুষজনের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষ করে প্রতিবছর ধরলা নদীর তীব্র ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আবাদি জমি ও ভিটাবাড়ি হারিয়ে অনেক মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীনে পরিণত হয়। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন ধরলা নদীর গ্রাসের মুখে। নদীটি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করছে বিস্তীর্ণ চর। এই নদীভাঙ্গনই এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় একটি চ্যালেঞ্জ এটি। তাই ফুলবাড়ীসহ কুড়িগ্রাম জেলাবাসীকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করতে হলে নদ-নদীগুলো খনন করা জরুরি। খননের ফলে নদ-নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে। পাশাপাশি উপকূলবর্তী হাজার হাজার হেক্টর পরিত্যক্ত জমি ফসল আবাদের আনা সম্ভব হতো। এতে করে কুড়িগ্রাম জেলা কৃষিসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সিরাজগঞ্জে সাম্প্রতিক সময়ে জেলাশহর রক্ষা বাঁধসহ দেশের অন্যতম বৃহত্তম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভাঙ্গরের শিকার হয়েছে। এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নদী

ভাঙ্গনের তীব্রতা বেড়েছে। বর্ষা মৌসুমে জেলার বিভিন্ন এলাকা বন্যা আক্রান্ত হওয়া এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে যমুনা নদীর তলদেশ খনন বা ড্রেজিং না করা এর অন্যতম কারণ।

৩. নারীদের সমস্যা ও সুপারিশ

লৈঙ্গিক সমতা এবং নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন করার ক্ষেত্রেও রংপুর বিভাপের পশ্চাৎপদতা সর্বজনবিদিত।। দারিদ্র্য, লৈঙ্গিক সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নারী দারিদ্র্যের মধ্যেও রয়েছে বহুমাত্রিকতা। রংপুর বিভাগের দরিদ্রের মধ্যে নারীরা আরো বেশি দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার। বিশেষ করে চরাঞ্চলের হতদরিদ্র নারী জীবনের বঞ্চনা আর দীর্ঘশ্বাসের কথা শোকগাথাকেও হার মানাবে। তিস্তা-ধরলা-যমুনা তীরে যে জনপদ, তা মূলত চরপ্রধান; এখানে ৬৮ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন, স্বভাবতই কর্ম ও খাদ্যের সংকট তীব্র। এখন হয়তো আক্ষরিক অর্থে মঙ্গা নেই কিংবা কমে গেছে, কিন্তু চরাঞ্চলের জনগণের স্থায়ী কর্মসংস্থানের এখনও সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ জন্য নারীর ক্ষমতায়ন ও মেয়েদের শিক্ষার ওপর সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। রংপুর বিভাগে নারী শ্রমিকদের কম মজুরি, বাল্যবিয়ে ও নারী উদ্যোক্তা ক্ষেত্রে নানা সমস্যা বিদ্যমান।

৪. রংপুর বিভাগে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা ও সুপারিশ

৪. ১ ভাষা ও সংস্কৃতি

ক) আঞ্চলিক ভাষা চর্চাকেন্দ্র, খ) আঞ্চলিক লোকচর্চাকেন্দ্র, গ) লোকসংগীত শিল্পীদের নিয়মিত ভাতা প্রদান, ঘ) প্রতিটি উপজেলায় মিলনায়তন, ঙ) সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪.২ পর্যটন সমস্যা ও সুপারিশ

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে নানা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যা পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়ক। তিন বিঘা করিডোর, তিস্তা ব্যারাজ, কান্তজিউ মন্দির, রামসাগর দিঘি, বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ, তাজহাট জমিদারবাড়ী, কারমাইকেল কলেজ, নাটোরের রাজবাড়ীসহ অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

৫. শিল্পখাতে সমস্যা ও সুপারিশ

৫.১ চা শিল্প

পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর চায়ের বাগান হওয়ায় চা শিল্প বিস্তার করছে। এ শিল্পকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। দিন দিন পঞ্চগড়ে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ পঞ্চগড় পূরণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে চায়ের নিলাম একমাত্র বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ ও সময় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তাই পঞ্চগড় জেলায় চায়ের নিলামকেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

৫.২ তাঁত শিল্প ও তাঁতীদের দুর্দিন

সিরাজগঞ্জে দীর্ঘদিন ধরে কাঁচামালের দফায় দফায় এবং ক্রমাগত হারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। একই সাথে সুষ্ঠু বিপণনের অভাবে তাঁতবস্ত্রের চাহিদা কমছে। উপরন্তু দাম না বাড়ার কারণে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয়। কিন্তু নানা সমস্যায় প্রায় ৫০ শতাংশ তাঁতী তাদের তাঁত ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

সরকারকে প্রচুর সম্ভাবনাময় এই শিল্পের জন্য বেশ কিছু কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি, যার মধ্যে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান এবং বিনা সুদে তাঁতীদের ঋণের ব্যবস্থা করা অন্যতম।

৫.৩ চালকলের সমস্যা

নওগাঁ জেলা চালকলের দিক দিয়ে দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এসব চালকলে নানা সমস্যায় জর্জরিত। উৎপাদন খরচ বেশি। ধান উৎপাদনকারী কৃষকেরাও ধানের ন্যায্যমূল্য পান না।

৫.৪ পরিবেশগত সমস্যা

পাবনায় জলবায়ুসংক্রান্ত পরিবর্তন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঝুঁকি ও ইটের ভাটার সংখ্যা বৃদ্ধি এ অঞ্চলে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৫.৫ হাড়িভাঙ্গা আমসম্পর্কিত সুপারিশ

রংপুরে বর্তমানে প্রচুর হাড়িভাঙ্গা আম উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত পঁচনশীল হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য একেটি আম গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন। আম সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাই আমচাষীরা ন্যায্যমূল্য পান না। আমের বড় বাজার পদাগঞ্জে কোনো ব্যাংকের স্থায়ী শাখা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় বলে বাজারজাতকরণের সমস্যা তীব্র। আম থেকে পাল্প তৈরির জন্য কোনো শিল্প এখানে গড়ে ওঠেনি। আমগাছের সঠিক পরিচর্যার জন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

৬. রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সম্ভাবনা

- রংপুর অঞ্চল শিল্পের জন্য এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্থান। কারণ, এখানে রয়েছে সস্তা শ্রম, শিল্পের কাঁচামাল, সড়ক, রেল ও বিমানপথের সুবিধা, ইপিজেড এবং শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতা।
- এ অঞ্চলে নানা ধরনের কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আম (হাড়িভাঙ্গা, সূর্যপুরি), কাঁঠাল, লিচু, আনারস থেকে জুস, জ্যাম, জেলি, মারম্যালেইড, ফল টিনজাতকরণ, কলা থেকে ড্রায়েড ব্যানানা ও ব্যানানা চিপ, আলু থেকে পটোটো চিপস,

স্ন্যাকস, ফ্রোজেন ফ্রেনস, ফ্রায়েড পটেটোস, ডিহাইড্রেটেড পটেটো ফ্লেইকস ও পটোটো পাউডার, টমাটো থেকে টমাটো পালপ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া সবজিজাতীয় কৃষিপণ্যের মধ্যে শিম, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, ঢেঁড়স, মটরশুটি প্রভৃতি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে।

দেশের বার্ষিক ফল উৎপাদনে রংপুর অঞ্চলের অবদান (২০১২-২০১৩), বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ বাংলাদেশ, ২০১৪

ফল	উৎপাদনে প্রথম স্থান	উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান
কলা	রংপুর (৯৯৮৬০ মে. টন)	কুষ্টিয়া (৯৯৭৫১ মে. টন)
আম	রাজশাহী (৪৪৬৩৯২ মে. টন)	দিনাজপুর (৭৬৬২৩ মে. টন)
কাঁঠাল	ঢাকা (১০৭১৯৯ মে. টন)	দিনাজপুর (১০৪২৭৮ মে. টন)
লিচু	দিনাজপুর (১৩৫৮৮ মে. টন)	রাজশাহী (৮০৮২ মে. টন)

- এ অঞ্চলে আরো সম্ভাবনাময় শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেগুলো হলো ডেইরি, গো-খাদ্য, পোলট্রি ফার্ম, ট্যানারি, দুগ্ধ প্রসেসিং, ভুট্টা প্রসেসিং, আদা প্রসেসিং।
- পণ্যের উপজাত উপাদান ও নিম্নমানের পাট ব্যবহার করে কৃত্রিম উড কারখানা, ছোট আকারের জুট মিল, মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, শিল্পের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা প্রভৃতি। পণ্যে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক আইন-২০১০ বাস্তবায়ন করা।
- প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে উত্তরা ইপিজেড-এ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।
- রংপুরে হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আইসিটি ও সফটওয়্যার শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া টেলিকমিউনিকেশন, মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ, ইলেকট্রনিকস শিল্পের সম্ভাবনাও রয়েছে।
- রংপুর অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুরে উৎপাদিত ট্রাউজার, প্যান্ট, জ্যাকেটসহ অন্যান্য গার্মেন্ট পণ্যের নেপাল ও ভুটানে বেশ চাহিদা রয়েছে।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ওপর ভিত্তি করে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। ফুলবাড়ী কয়লা খনি, খালাসপীর কয়লাখনি, সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর, কিশোরগঞ্জ উপজেলার চাঁদখান, বাহাগিলি ও মাগুড়া ইউনিয়ন এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ মজুদ কয়লা যথাযথ প্রক্রিয়ায় উত্তোলন করা হলে জ্বালানি সমস্যা সমাধান এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।
- নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যে সিলিকা বালু ও নুড়ি পাথর রয়েছে, তা থেকে বালু ও নুড়ি পাথরকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে নেপাল ও ভুটানের দূরত্ব খুবই কম। ফলে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক কার্গো সার্ভিস চালু করে নেপাল ও ভুটানে চাহিদা আছে এমন পণ্য তৈরি কারখানা রংপুর অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে এবং পণ্য রপ্তানিতে সময় কম লাগবে।

শিল্প বিকাশে সম্ভাবনা

জেলার নাম	শিল্পের সম্ভাবনাময় খাতসমূহ
রংপুর	হস্তশিল্প (শতরঞ্চি, টুপি তৈরি), বেনারশী শাড়ি, সাবান, হিমাগার শিল্প, রাবার চাষ, প্লাস্টিক সামগ্রী, চট ও সুতলি তৈরি, দুগ্ধখামার, স্বাস্থ্যসেবা পণ্য, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য, রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প, আম থেকে পাল্প তৈরি, মিল, চাতাল, অটো রাইস মিল, সুপারি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পোস্ট সার, গুটি ইউরিয়া তৈরি, মৎস্য খামার, ইটভাটা, কলা প্রক্রিয়াকরণ, আলু ও সবজি সংরক্ষণাগার, নার্সারি, বনায়ন, তামাক শিল্প প্রভৃতি।
কুড়িগ্রাম	পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, কাঠ শিল্প. বাঁশ শিল্প, দুগ্ধখামার, মৎস্য খামার, লটকন ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, নৌযান শিল্প প্রভৃতি।
লালমনিরহাট	সেচ যন্ত্রপাতি তৈরি, মৌমাছি চাষ ও মধু উৎপাদন, হিমাগার, ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যাচারি স্থপন, পাথর সংগ্রহ ও পাথর থেকে আরসিসি খুঁটি তৈরি প্রভৃতি।
গাইবান্ধা	দুগ্ধখামার, পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, মৎস্য খামার, নৌযান, মিষ্টি কুমড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রভৃতি।
নীলফামারী	আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিরামিক শিল্প, পোশাক শিল্প, পর্যটন শিল্প, গুটি ইউরিয়া তৈরি, যান্ত্রিক শিল্প, আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি।
দিনাজপুর	লিচু ও আম প্রক্রিয়াকরণ, সুগন্ধি চাল প্রক্রিয়াকরণ, চালের ব্রান থেকে ভোজ্য তেল তৈরি, অটো রাইস মিল, চারকোল তৈরি, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি।
ঠাকুরগাওঁ	দুগ্ধখামার, চামড়াজাত পণ্য ফল, শাকসব্জি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি।
পঞ্চগড়	চা প্রক্রিয়াকরণ, স্টবেরি চাষ, পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন, পাথর উত্তোলন, পাথর থেকে বৈদ্যুতিক পিলার ও অবকাঠামোগত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি।

৭. রংপুর বিভাগের উন্নয়নের সুপারিশমালা

কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন রংপুর বিভাগের জন্য বেশি উপযোগী। বর্তমানে কৃষিপণ্য মূল্যসংযোজন ছাড়া বিক্রয় করা হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর আম, আনারস, পেপে, পেয়ারা, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আলু, টমাটো, শিম প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। এসব পণ্য জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, চিপস এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। ফুলবাড়ীয়া ও দিনাজপুরের কয়লা খনির কয়লা উত্তোলন করে বড় আকারে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হলে এ অঞ্চলে জ্বালানির সমস্যা কিছুটা সমাধান হতো। বড়পুকুরিয়ায় প্রাপ্ত কঠিন শিলা খনির শিলা ব্যবহার করে সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে

পারে। উৎপাদিত পাট ও সুতা ব্যবহার করে পাট ও সুতা শিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। গার্মেন্টস শিল্প হচ্ছে শ্রমঘন শিল্প, রংপুর বিভাগের সস্তা শ্রম এক্ষেত্রে সহায়ক। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করা হলে এখানকার দরিদ্র জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। এ অঞ্চলে হস্তশিল্প, সাবান, বস্ত্র ও কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য করার নানা সুবিধা রয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে ও কম খরচে এ অঞ্চল থেকে এসব দেশে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। এ ছাড়া এ অঞ্চলে ৪টি স্থলবন্দর ১. বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়, ২. বুড়িমারি স্থলবন্দর, লালমনিরহাট, ৩. হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর ও ৪. বিরল স্থলবন্দর, দিনাজপুর ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। সৈয়দপুরে কার্গো বিমান সার্ভিস চালু করে ভারত, নেপাল ও চীনে এ অঞ্জল থেকে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে স্থায়ী ভোগপণ্যের যন্ত্রপাতি ও রপ্তানিযোগ্য হালকা মেশিনারি যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যেতে পারে। সিরামিক শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। চামড়া শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হলে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কারখানা যেমন বিদ্যুৎ ও সারের কারখানা স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইতিমধ্যে 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এ অঞ্চলের মানুষ নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

এ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন জামদানি শিল্প, নকশীকাথাঁ, শতরঞ্চি, শিতলপাটি, কার্পেট, চটের ব্যাগ প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে বিনিয়োগ সহায়তা দিতে আলাদা শিল্পনীতি, করনীতি, ভ্যাটনীতি, শুল্কনীতি ও ঋণনীতি ঘোষণা করতে হবে। রংপুর অঞ্চলের শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ ও আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের জন্য আলাদা শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে আর পুরুষেরা ঢাকা, চট্টগ্রাম সিলেটসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় রিকশাচালক ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। এখানে গার্মেন্টস শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে গার্মেন্টস সেক্টরকে রংপুর বিভাগে স্থানান্তর করার ব্যাপারে আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

রংপুর বিভাগের প্রবাসীর সংখ্যা, রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশ কম। মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণের শতকরা হার যখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৩৪ দশমিক ৯৭, ৪২ দশমিক ৩৭ ও ৬ দশমিক ৯৫, সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার মাত্র শূন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও তথ্য না জানার কারণে দিন দিন এ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে আসন্ন বাজেটে কার্যকর পদক্ষেপ গস্থহণ করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের অগণিত কর্মহীন মানুষের

বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা জরুরি।

এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। উদ্যেক্তা হতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। স্বল্প খরচে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে। কোনো অঞ্চল আঞ্চলিক বৈষম্যের স্বীকার হলে, তা নিরসনে নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চাৎপদ এলাকায় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সহায়ক শিল্পনীতি করা প্রয়োজন। যেসব এলাকায় বেশি শিল্পায়ন হয়েছে, সেখান থেকে কম শিল্পায়ন এলাকায় শিল্প পুনঃবণ্টন ও স্থানান্তর করা যেতে পারে। যেমন ঢাকা শহর থেকে তৈরি পোশাক শিল্প অন্য জায়গায় স্থাপন করা যেতে পারে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নগরায়ণের হার, পানি সরবরাহ ও গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পায়নকে প্রভাবিত করে—এ জন্য কম শিল্পায়িত এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে, যাতে করে নতুন শিল্প উদ্যোক্তা আকৃষ্ট হয়। এ অঞ্চলে বেসরকারি খাত বিনিয়োগে উৎসাহিত না হলে প্রথম দিকে সরকারি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পায়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য স্বল্প খরচে যন্ত্রপাতি আমদানি সুবিধা, স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের ব্যবসায়ীদের ইনসেনটিভ প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা যেমন ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রেয়াত গ্রহণের আওতা বৃদ্ধি করে পরিবহন সেবার ৫ শতাংশ রেয়াতযোগ্য করা যেতে পারে। দেশে ব্যবহার যোগ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কাঁচমাল হিসেবে ব্যবহার হবে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে এ অঞ্চলের কৃষকেরা লাভবান হবেন।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেরও উন্নয়ন হতো। রংপুর বিভাগে শিল্পায়নে সহায়তা করতে 'রংপুর বিভাগ রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল', 'বাজার তথ্য সহায়তা সেন্টার', 'ইনস্টিটিউট অব এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগে দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আইটি পার্ক, আইসিটি সহায়তা, হাইটেক পার্ক, ইনকিউবেশন সেন্টার হলে শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ অঞ্চলের শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির ওপর কাস্টমস শুল্ক কম ধরা, শিল্পের প্রাথমিক উৎপাদনপর্যায়ে প্রয়োজন ভ্যাট হার কমানো। শিল্পের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এ জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে পণ্যের উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, মান উন্নয়ন, মার্কেটিং পলিসি নির্ধারণ, বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা প্রয়োজন। এ জন্য দারিদ্র্যপীড়িত ও অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমৃদ্ধ অঞ্চলের চেয়ে উন্নয়ন বাজেটে দুই-তিন গুণ বেশি বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনে প্রয়োজন দ্রুত প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উন্নয়ন বৈষম্য হ্রাস, আয় বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার কৌশল এবং নীতি হলো: "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য নিয়মিত এডিপির অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট শতাংশিক হারে গ্রহণযোগ্য এডিপির বরাদ্দ দেওয়া"। কিন্তু ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রংপুর বিভাগের উন্নয়নে কোনো 'বিশেষ বরাদ্দ বা বিনিয়োগ' রাখা হয়নি। রংপুর বিভাগের উন্নয়নের জন্য এ অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টিই রংপুর বিভাগবাসীদের প্রাণের দাবি। অর্মত্য সেন-এর 'দ্য ইনইকুয়ালিটি রিএক্সমিনড' বইয়ে লিখেছে, "যদি প্রাথমিকভাবে সমাজে অসমতা বিরাজ কওে, তাহলে তা সুযোগের অসমতার মাধ্যমেই সক্ষমতার সমতা আনতে হবে।" অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে অধিক বরাদ্দ দিতে হবে। রংপুর বিভাগের জনগণ সেই দিনের প্রত্যাশায়, যেদিন তারা বাজেটে অধিক বরাদ্দ পাবে। এ অঞ্চল হবে দারিদ্র্য মুক্ত, শিক্ষা ও গবেষণায় অগ্রগামী, শিল্পায়নে সমৃদ্ধ, থাকবে না বেকারত্ব, উন্নত জীবন যাপন করবে সবাই— বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রংপুর বিভাগবাসী সেই দিনের প্রত্যাশা করছে।

বাংলাদেশে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), এসডিজি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুযায়ী যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় রয়েছে তা অর্জন করতে হলে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয় (No one will be left behind)' স্লোগানটির বাস্তবায়ন জরুরি। দেশে যখন 4th Industrial Revolution (4IR) নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে তখন রংপুর বিভাগের জনগণ অনেক পেছনে। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কুড়িগ্রাম জেলা

কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে ১৬টি নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ নদ-নদীগুলোতে পলি জমে ভরাট হয়ে যায় এবং বর্ষা মৌসুমে নদীগুলোর পানির ধারণ ক্ষমতা থাকে না। ফলে প্রতিবছর বন্যায় নদীপাড়ের মানুষগুলোর অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষ করে প্রতিবছর ধরলা নদীর তীব্র ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আবাদি জমি ও ভিটেবাড়ি হারিয়ে অনেকেই গৃহহীন ও ভূমিহীনে পরিণত হন। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলা ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন ধরলার ভাঙ্গনের মুখে থাকে। নদীটি সৃষ্টি করেছে বিস্তীর্ণ চর। কুড়িগ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটাই। তাই ফুলবাড়ীসহ কুড়িগ্রাম জেলাবাসীকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করতে হলে নদ-নদীগুলো খনন করা জরুরি। নদ-নদীগুলো যথাযথভাবে খনন করা হলে গভীরতা ফিরে পাবে এবং মানুষজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

অন্যদিকে নদ-নদীর দুই উপকূল ভরাট করা হলে হাজার হাজার হেক্টর চরাঞ্চলের পরিত্যক্ত জমি আবাদি জমিতে পরিণত হবে। এতে কুড়িগ্রাম জেলা কৃষিসহ সার্বিক উন্নয়নে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে কুড়িগ্রামবাসী পিছিয়ে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীনের পর থেকে যেসব সরকার এসেছে কুড়িগ্রামবাসী বিরোধী দলের এমপি পেয়েছে। যে কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে কুড়িগ্রাম বঞ্চিত হয়েছে। শুধু ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে সরকারদলীয় এমপি থাকায় কুড়িগ্রামে শেখ হাসিনা ধরলা সেতু ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই নাজুক। এই জেলা শুধু ধরলা নদীর কারণে যেমনটি ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় পিছিয়ে পুরো এলাকা। ফলে অনেকেই নিজ উদ্যোগে বা ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পকারখানা তৈরি করতে চাইলেও প্রত্যাশিত ফল পাচ্ছেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে কাজের সৃষ্টি হবে, এ এলাকার মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী নন্দিরকুটির জুম্মারপাড় এলাকা। এলাকাটি এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যেখান থেকে সহজেই ভারতের পশ্চিম বাংলার কোচবিহার জেলার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। হতে পরে সীমান্ত হাটসহ একটি চেকপোস্ট। সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থানের।

প্রণয়ন: অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান, কীর্তনখোলা, ৪৯, বিহাস, মাসকাটা দিঘী, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি; ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; মোঃ হাবিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; হাফিজ ইকবাল, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা; আব্দুল আজিজ মজনু, সিনিয়র সাংবাদিক, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় সভাপতি: অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সঞ্চালক: অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	আব্দুল আজিজ মজনু	সিনিয়র সাংবাদিক, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম
২.	মোঃ আমিনুল ইসলাম রিজু	প্রিন্সিপাল, ফুলবাড়ী ডিগ্রি কলেজ
৩.	মোঃ সাজ্জাদ তালুকদার	সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা
৪.	মোঃ রেজাউল হক	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঠাকুরগাঁও
৫.	মোঃ আবুল কাসেম মকুল	সাপাহার, নওগাঁ
৬.,	মাহমুদুর রহমান	শিক্ষক, বগুড়া
৭.	মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু	সভাপতি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, রংপুর
৮.	ড. ফরিদ খাঁন	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৯.,	ড. তুহিন ওয়াদুদ	অধ্যাপক; ডিন, কলা অনুষদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১০.	ডা. মফিজুল ইসলাম মান্টু	সমাজকর্মী; বীর মুক্তিযোদ্ধা
১১.	ড. কবির আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর
১২.	এস এম আব্রাহাম লিংকন	আইনজীবী, একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবী
১৩.	মোঃ হারুন-আল-রশীদ	সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১৪.	মোঃ মুজতাহিদ আলী	কৃষি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী
১৫.	হায়দার আলী বাবু	সাংবাদিক: জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও এনটিভি, লালমনিরহাট
১৬.	মোস্তফা নুরুল ইসলাম রেজা,	কৃষিবিদ, অপারেশন লিড, সংগো প্রজেক্ট অব করডেইড
১৭.	ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

১৮.	ড. মোঃ আইনুল ইসলাম	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
১৯.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ; কলেজিয়েট গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
২০.	হাসনুর রশিদ বাবু	অধ্যাপক; সভাপতি পর্যটন উন্নয়ন পরিষদ, পঞ্চগড়
২১.	কানিজ রহমান	উন্নয়নকর্মী; সভাপতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, দিনাজপুর জেলা শাখা
২২.	সুইটি আন্‌জুম	শিল্প উদ্যোক্তা; সভাপতি, জাগ্রত ব্যবসায়ী জনতা, রংপুর জেলা
২৩.	জাহাঙ্গীর আলম	আইনজীবী; নীলফামারী
২৪.	বিকাশ চন্দ্র ঘোষ	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২৫.	মোঃ আনিসুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ
২৬.	ডা. সমর্পিতা ঘোষ তানিয়া	চিকিৎসক; সমাজ সংগঠক, রংপুর
২৭	হাবিবুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
২৮.	ড. শ্বাশত ভট্টচার্য্য	শিক্ষাবিদ; সম্পাদক, উত্তরবাংলা.কম এবং সংস্কৃতিকর্মী
২৯.	মোহাম্মদ দবিরুল	কৃষক, রংপুর
৩০.	ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩১.	কাজী নেওয়াজ মোস্তফা	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৩২.	ড. মোঃ নুর আলম সিদ্দিক	সহযোগী অধ্যাপক, ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৩৩.	মোঃ মাহমুদুল হক মানিক	আজকের পত্রিকা, বিরামপুর প্রতিনিধি, বিরামপুর, দিনাজপুর
৩৪.	মোঃ আমিনুর রহমান	আমচাষি ও আম বাগানের মালিক
৩৫.	খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৩৬.	মোঃ শাফিউল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৩৭.	মোঃ বেলাল উদ্দিন	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৩৮.	মোছাঃ কামরুন্নাহার	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
৩৯.	মোঃ রুকনুজ্জামান	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, পীরগঞ্জ সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও
৪০.	সাদিয়া সুলতানা	ছাত্রী, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

৪১.	মোঃ জাহিদ হোসেন	ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৪২.	মোঃ রেজাউল করিম	অধ্যাপক; রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
৪৩.	ফজলে রাব্বী	অধ্যাপক; রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
৪৪.	মোঃ মধু	সাংবাদিক, পাবনা
৪৫.	মোঃ আকতার হোসেন	সাংবাদিক, পাবনা
৪৬.	মোঃ আলম	সাংবাদিক, পাবনা
৪৭.	দিলীপ গোর	সাংবাদিক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
৪৮.	মোঃ আখতারুজ্জামান	অধ্যাপক, সিরাজগঞ্জ কলেজ
৪৯.	মোঃ ফরহাদ হোসেন	অধ্যাপক, নাটোর কলেজ
৫০.	রজনী বর্মণ	সাঁওতাল, রাজবংশী উপজাতি
৫১.	রাবেয়া বাসরি	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৫২.	কাজী নেওয়াজ মোস্তফা	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৫৩.	ড. মোঃ নুর আলম সিদ্দিক	সহযোগী অধ্যাপক, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
৫৪.	মোঃ মাহমুদুল হক মানিক	সাংবাদিক, প্রতিনিধি, বিরামপুর, দিনাজপুর, আজকের পত্রিকা
৫৫.	মোঃ আমিনুর রহমান	আমচাষি ও আমবাগানের মালিক
৫৬.	ফরহাদ হোসেন	অধ্যাপক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৭.	রজনী বর্মণ	সাঁওতাল, রাজবংশী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, রাজশাহী
৫৮.	ইসরাত জাহান স্বর্ণা	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী; গোপালপুর, লালপুর, নাটোর
৫৯.	মোঃ সাগর আলী	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, মোহনপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
৬০.	মোসাম্মৎ মমতাজ খাতুন	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
৬১.	রাবেয়া বসরী	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬২.	হান্নানা বেগম	অধ্যাপক; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৩.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার	নির্বাহী পরিচালক (এলপিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৪.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৫.,	সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন	চিফ ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার, বাংলাভিশন এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৬.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৭.	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ	ফেলো চার্টার্ড অ্যাকউন্টেন্ট; পরিচালক ও বোর্ড চেয়ারম্যান, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লি. ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৮.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা

		বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৯.	মোহাম্মদ আকবর কবীর	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭০.	ড. মোঃ সাইদুর রহমান	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭১.	মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী	ব্যবসায়ী; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিসেন্ট অ্যাসোসিয়েট এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭২.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৪.	নেছার আহমেদ	ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্যাংক এশিয়া এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৫	ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৬	খোরশেদুল আলম কাদেরী	পরিচালক, ওয়াগ্গাছড়া টি লিমিটেড, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৭	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ
• রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে সৌরতাপভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। • জলবায়ু পরিবর্তন ও অবহেলার কারণে পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতি নিরসনে বাজেটে প্রকল্প প্রণয়ন করা জরুরি। • কৃষিজমিতে আবাসন ও শিল্প গড়ে তোলা বন্ধে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি। • মোটা চালের বিলুপ্তি রোধে কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ জরুরি। • শস্যপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃষিতে বাড়তি হারে ভর্তুকি প্রদানে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন। • ইউনিয়নপর্যায়ে পতিত জমিতে কৃষি সম্প্রসারণে সহজলভ্য প্রশিক্ষণ-প্রযুক্তির জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন। • খাল-বিল খনন ও সংস্কার করে মিঠাপানির সমস্যা দূরীকরণে বাজেটে প্রকল্প রাখা দরকার। • কৃষকের জন্য শস্যবিমা চালুকরণে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ দিতে হবে। • ফেলে রাখা হাজারো পুকুর-জলাশয়ে মৎস্য চাষে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি। • কৃষি যন্ত্রপাতিভিত্তিক একটি শিল্প পার্ক স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ করা জরুরি। • প্রতিটি উপজেলায় কৃষিপণ্য সংরক্ষণে কোল্ডস্টোরেজ এবং বীজ সংরক্ষণে সাইলো নির্মাণে বাজেটে প্রকল্প নেওয়া উচিত। • জৈব কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ করা প্রয়োজন। • জাতীয় বাজেটে সংস্কৃতি খাতে ১ শতাংশ বরাদ্দ করে রংপুর-রাজশাহীতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য প্রকল্প গ্রহণ দরকার। • পোল্টি শিল্পের শিল্পের বিকাশে একটি পশু পরীক্ষাগার নির্মাণ করা দরকার। • রংপুর-রাজশাহী বিভাগের দরিদ্র নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ বরাদ্দ দরকার। • পঞ্চগড়ের পাঁচটি উপজেলার সমন্বয়ে একটি পর্যটন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। • পঞ্চগড় সীমান্ত জেলা হওয়ায় একটি উন্নত স্থলবন্দর নির্মাণের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। • পঞ্চগড়ে চা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের কারণে পরিবর্তিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন। • পঞ্চগড়ের প্রান্তিক চাষিদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে চা নিলামকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা জরুরি। • পঞ্চগড়ের বারোমাসি টমেটো, তরমুজসহ অন্য ফলমূল সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

- পঞ্চগড়ের প্রতিটি উপজেলায় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ জরুরি।
- পঞ্চগড়ের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোয় একজন করে মেডিকেল ও গাইনি চিকিৎসক প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
- পঞ্চগড়ের নারীদের স্বাবলম্বী হতে কুটির শিল্পভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- পঞ্চগড়ের নদ-নদী খননের জন্য কার্যক্রম শুরু করতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।
- পঞ্চগড়ের ক্ষুদ্র চা চাষিদের সারের সহজলভ্যতার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- পঞ্চগড়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের আধিক্য থাকায় পাবলিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রকল্প নেওয়া প্রয়োজন।
- পঞ্চগড়ে পাথর ও বালু সহজলভ্যতার কারণে পরিবেশ উপযোগী টাইলস-কাচ শিল্প বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ করা জরুরি।
- পঞ্চগড়ের জোতদার শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।
- পাবনার সুজানগরে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদিত হওয়ায় একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- নীলফামারীর উন্নতমানের আদা, আলু, তামাক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে কৃষি শিল্প বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ করা জরুরি।
- নীলফামারারীতে একটি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- দিনাজপুরের কৃষকের জন্য ভেজালমুক্ত উন্নতমানের সার, বীজ ও কীটনাশকের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- দিনাজপুরের সেচের পানির জন্য ভূগর্ভস্থ স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় মাস্টার প্লানের আওতায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বাজেটে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষভাবে জরুরি।
- দিনাজপুরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পতিত জায়গায় শাকসবজি-ফলমূল আবাদে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প প্রয়োজন।
- দিনাজপুরে বজ্রপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি সহায়তা দানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।
- দিনাজপুর অঞ্চলে মহাসড়কগুলোর পাশে ঘাস চাষের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের জন্য বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।
- দিনাজপুরের সদরপুরে টেক্সটাইল মিল পুনরায় চালু করে এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক ইপিজেড গঠনে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- দিনাজপুর ও রাজবাড়ীর শিল্প-সংস্কৃতি রক্ষায় জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- দিনাজপুরের উৎকৃষ্ট মাটির কারণে লিচু, মাল্টা ও চিনিগুড়া চালের চাষ সম্প্রসারণে বাজেট বরাদ্দ করা দরকার।
- দিনাজপুরে কৃষিচাষে উন্নত প্রযুক্তির বিকাশে একটি কৃষি প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ করা জরুরি।
- দিনাজপুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দরকার।

- দিনাজপুর রংপুর অঞ্চলে কর্মজীবী নারীদের মজুরি বৈষম্য কমাতে বাজেটে দিকনির্দেশনা ও বরাদ্দ প্রয়োজন।
- দারিদ্র্যপীড়িত কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সড়ক অবকাঠামো ও দারিদ্র্য নিরসনে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ জরুরি।
- কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর তীব্র ভাঙ্গনকাবলিত অংশে নিয়মিত পলি অপসারণে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ করা জরুরি।
- কুড়িগ্রামের নদীভাঙ্গনে ভূমিহীন মানুষজনের পুনবার্সনে জাতীয় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন।
- কুড়িগ্রামের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে বাজেটে দিকনির্দেশনা ও বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কুড়িগ্রামে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে জাতীয় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।
- কুড়িগ্রামে সীমান্ত এলাকায় একটি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট নির্মাণে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার।
- কুড়িগ্রামের 'পকেট অব পোভার্টি' এলাকার উন্নয়নে জাতীয় বাজেট বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ জরুরি।
- কুড়িগ্রামের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন উলিপুর এলাকায় বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় সেতু নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ দরকার।
- নদীকেন্দ্রিক কুড়িগ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে মৎস্য চাষ প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কুড়িগ্রামে দরিদ্র নারীদের জন্য গার্মেন্টস ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।
- কুড়িগ্রামের সীমান্তলাগায়ো চারটি স্থানে স্থলবন্দর নির্মাণ করে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে বাজেটে বরাদ্দ করা দরকার।
- কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা-বগুড়া মহাড়ক নির্মাণে মেগাপ্রজেক্ট প্রণয়নে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- রংপুর জেলায় ভাষা ও লোকনাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতি কর্মীদের বেতনভাতা প্রদানে বরাদ্দ জরুরি।
- রংপুরে বেগম রোকেয়া চর্চাকেন্দ্র ও টাউন হলের উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- রংপুরে প্রকৃত নারী উদ্যোক্তদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ দিননির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- রংপুরের মানুষেররা চার মাস কর্মহীন থাকতে বাধ্য হওয়ার পরিস্থিতি নিরসনে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- রংপুর বিভাগের চর এলাকার উন্নয়নের জন্য চর উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দরকার।
- গাইবান্ধা জেলার বাগদাফার্ম এলাকায় ঘোষিত ইপিজেড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাতিল করে অন্য এলাকায় গড়ে তোলার জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।
- গাইবান্ধায় মেডিকেল, কৃষি অথবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- গাইবান্ধায় দ্বিতীয় যমুনা সেতু অথবা টানেল নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- গাইবান্ধার বালাশি থেকে জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত সড়ক ও রেল সেতু নির্মাণে বরাদ্দ দিতে হবে।

- গাইবান্ধার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- রাজশাহী সিঙ্গেল লাইনের রেললাইন ডাবল লাইনে উন্নীতকরণে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া অতীব জরুরি।
- রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করতে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- রাজশাহী বিভাগে গ্যাস সংযোগ ও এ-সংক্রান্ত প্রণোদনার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- রাজশাহীর গোদাগাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় কৃষিকাজ বন্ধ করে মাছ চাষ করা বন্ধে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখা প্রয়োজন।
- রাজশাহীর আদিবাসী মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও বৈষম্য নিরসনে বাজেটে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
- রাজশাহীর ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রাজবংশী, সাঁওতাল, কোল সম্প্রদায়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দরকার।
- বগুড়ায় একটি বিমানবন্দর নির্মাণে বাজেটে প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- ২০০১ সালে ঘোষিত বগুড়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- বগুড়ার মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে একটি পর্যটনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- বগুড়া শহরকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করতে বাজেটে দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।
- বগুড়া শহরে সার কারখানা নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- নওগাঁ জেলার সাপাহারে ইপিজেড এবং আম সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নওগাঁর পশ্চিমাঞ্চলে রেললাইল নির্মাণে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- নওগাঁয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নওগাঁয় স্থলবন্দর নির্মাণের দীর্ঘদিন আগের ঘোষণা বাস্তবায়নে আসন্ন বাজেট বিশেষভাবে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নওগাঁর পুনর্ভবা নদীর দুই তীর বাঁধাই করার জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
- পুনর্ভবা ও আত্রাই নদী খনন, সংস্কার ও পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার।
- নওগাঁর তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ করা দরকার।
- নওগাঁর আদীবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে জাতীয় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প প্রয়োজন।
- ঠাকুরগাওয়ের রেশম কারখানা চালুকরণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- ঠাকুরগাওয়ের কমলা চাষ সম্প্রসারণে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- কৃষিপণ্যের পরিবহন সুবিধার জন্য পাবনায় রেলযোগাযোগ সম্প্রসারণে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- দরিদ্র মানুষের জন্য পাবনা পাইলটভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা চালুকরণে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- পাবনার সবজি সংরক্ষণাগার নির্মাণে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- পাবনার বেড়া উপজেলার বিলুপ্তপ্রায় তাঁত শিল্প রক্ষায় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: বরিশাল বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়
১৮ মার্চ, ২০২২ রোজ শুক্রবার, সময়: ৩:৩০ মিনিট

একনজরে বরিশাল বিভাগ

বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলা নিয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে বরিশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের মোট আয়তন ১৩২৯৫ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ৮৩,২৫,৬৬৬ জন। পৌরসভার সংখ্যা ২৪টি, উপজেলা ৪১, ইউনিয়ন ৩৫২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৪১৯৫টি। বরিশাল বিভাগের উত্তরে ঢাকা বিভাগ, পশ্চিমে খুলনা, পূর্বে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। নদ-নদী, খাল-বিল, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলীয় বাস্তবতায় বরিশাল প্রাকৃতিকভাবে যুগপৎভাবে সম্ভাবনাময় ও ভঙ্গুর। প্রাথমিক খাত কৃষি এবং এর সাথে সম্পর্কিত নানা পেশার সাথে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় অবস্থান, অধিক কৃষিনির্ভরতা, বছরব্যাপী দুর্যোগ, নিম্ন ভিত্তির শিল্প, জনগণের কর্মস্পৃহার অভাব, অসম উন্নয়ন বরাদ্দসহ প্রভৃতি কারণে বরিশালের দারিদ্র্য হার জাতীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি। জলবায়ু দারিদ্র্য এবং ছদ্ম ও মৌসুমী বেকারত্বের বৈশিষ্ট্য বরিশালে প্রকট। উত্তরে পদ্মা বহুমুখী ব্রিজ, দক্ষিণে পায়রা সমুদ্রবন্দর, পূর্বে ভোলার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পশ্চিমের মোংলা সমুদ্রবন্দর বরিশালকে বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনার একটি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। বরিশাল বিভাগের অনগ্রসরতা থেকে উত্তরণের জন্য এ অঞ্চলের সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ দৃষ্টি ও কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। নিম্নে এই বিভাগের বিভিন্ন খাত ও অগ্রাধিকারসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ক্রম	খাত	অগ্রাধিকার ইস্যু
০১	কৃষি	১. অবকাঠামো উন্নয়ন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কারণে কৃষিজমি কমছে, যা প্রতিরোধে উদ্যোগ নিতে হবে। ২. উপকূলীয় কৃষিতে লবণসহিষ্ণু কৃষির ব্যাপক প্রচলনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ। ৩. ভোলার চর কুকড়িমুকড়ি, চর পাতিলা, ঢালচরসহ পটুয়াখালী, বরগুনা ও বরিশালের চরাঞ্চলের জন্য বিশেষ কৃষি ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। ৪. বরিশালের পিরোজপুরের জেলার স্বরুপকাঠির আটঘর-কুড়িয়ানা ও ঝালকাঠির ভিমরুলিতে কৃষি অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা ও কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ভিমরুলিতে ভাসমান বাজার প্রকল্প গ্রহণ। ৫. স্বরুপকাঠির আটঘর-কুড়িয়ানায় পেয়ারা ও আমড়ার আচার, জ্যাম ও জেলি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
০২	শিল্প ও কর্মসংস্থান	১. বরিশালের শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণ ও কর্মসংস্থানের জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা অবিলম্বে বাস্তবায়ন এবং পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে সবুজ শিল্পায়ন বাস্তবায়ন।

		২. কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বাস্তবায়ন। ৩. বরিশালে শিল্প ও বিনিয়োগ বিকাশে বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ও রাজস্ব ছাড়ের ব্যবস্থা। ৪. শিল্প উৎপাদনে ভোলার গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং গৃহস্থালি ব্যবহার বন্ধকরণ।
০৩	নদীভাঙ্গন ও নাব্য	১. বরিশালের নদীভাঙ্গন জরিপ এবং ভাঙ্গন রোধে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। ২. বরিশালের নদ-নদীর নাব্য বিষয়ে জরিপ এবং নাব্য বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
০৪	উপকূলীয় খাত	১. জলবায়ু দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ। ২. দেশে উপকূলীয় পরিষদ গঠন। ৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ৪. বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কাঠামো নির্মাণ।
০৫	স্বাস্থ্য	১. বরিশালে নৌ-স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো চালু করার উদ্যোগ নেওয়া, যেমন ভাসমান ক্লিনিক। ২. বরিশালে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ৩. বরিশালে বিশেষায়িত ডায়েরিয়া হাসপাতাল স্থাপন করা।
০৬	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা	১. কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসাবিষয়ক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র অপরিহার্য। ২. দারিদ্র্য বিমোচন, ছদ্ম ও মৌসুমী বেকারত্ব রোধের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।০ ৩. বরিশালে সমুদ্রসম্পদ ও সমুদ্রবিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন।
০৭	অবকাঠামো	১. চার লেনবিশিষ্ট বরিশাল-কুয়াকাটা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা জরুরি। ২. ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা রেললাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। ৩. বরিশাল-ভোলা ব্রিজের জন্য বরাদ্দ চলমান রাখা। ৪. বরিশালে আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর ও স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
০৮.	আর্থিক ও রাজস্ব খাত	১. এসএমই খাতে এবং নারীদের স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ২. বিনিয়োগের জন্য কর অবকাশ সুবিধা বৃদ্ধি, কর্পোরেট হার ও ভ্যাট হার কমানো। ৩. কর পদ্ধতির সহজীকরণ করা প্রয়োজন।
০৯.	দারিদ্র্য বিমোচন	১. বরিশাল বিভাগের অতি উচ্চ দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা, পটুয়াখালীর গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা, ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা, বরিশালের হিজলা উপজেলা এবং বরগুনা সদর উপজেলার জন্য বিশেষ দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ।
১০.	সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি	১. জলবায়ু অভিঘাতে আক্রান্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পটুয়াখালী ও বরগুনার রাখাইন উপজাতি এবং উপকূলীয় মানুষের জন্য জলবায়ু ভর্তুকি প্রদান। ২. উপকূলীয় এলাকার ষাটোর্ধ্ব মানুষের জন্য উপকূলীয় জ্যেষ্ঠ নাগরিক **ভাতা** চালু করা।

বরিশালের সম্ভাবনা, সক্ষমতা, দুর্বলতা ও আশঙ্কা পর্যালোচনা

সম্ভাবনা ও সক্ষমতা	দুর্বলতা
১. সম্প্রসারণশীল বাজার। ২. শিক্ষার হার বেশি। ৩. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি; ৪. পল্লী দারিদ্র্য হ্রাসের হার বেশি। ৫. কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি বিদ্যমান। ৬. জন, জল ও জমির প্রাচুর্যতা। ৭. বসবাসের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর। ৮. স্বাদু পানির এলাকা। ১০. বরিশালের আন্তর্জাতিকমানের ওষুধ শিল্প । ১১. পর্যটন বিকাশে সম্ভাবনাপূর্ণ। ১২. সুপেয় পানির জলাধার, নদ-নদীপ্রধান। ১৩. কম জনঘনত্ব । ১৪. কৃষিপণ্য ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণে সম্ভাবনা। ১৫. কৃষি উৎপাদন অনুকূল জলবায়ু বিরাজমান। ১৬. জমির উর্বরতা শক্তি বেশি । ১৭. তুলনামূলকভাবে কম শ্রমমূল্য। ১৮. সাশ্রয়ী নৌ ও সড়ক ব্যবস্থা। ১৯. পদ্মা সেতু চালু হওয়া। ২০. বরিশালের শিল্পের পশ্চাৎবর্তী সংযোগ উপাদান হিসেবে ভোলায় গ্যাস ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পটুয়াখালীতে কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ। ২১. বরিশাল থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরত্বে পায়রা সমুদবন্দর নির্মাণ। ২২. কৃষি-অকৃষি ও শিল্পে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা ২৩. নৌবন্দরের উপস্থিতি। ২৪. কৃষি কাঁচামালের সহজলভ্যতা। ২৫. সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের প্রচুর সম্ভাবনা।	১. রেলপথ বা রেলযোগাযোগ না থাকা। ২. অপেক্ষাকৃত অনেক কম শিল্পায়ন। ৩. উদ্ভাবনীমূলক সাহসী বেসরকারি উদ্যোক্তার অভাব। ৪. দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড় হারের চেয়ে বেশি। ৫. উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা। ৬. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকট অভিঘাত। ৭. বরিশাল জেলায় গ্যাস কিংবা কোনো খনিজ দ্রব্য নেই। ৮. কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট নেই। ৯. সমুদ্রবন্দর কার্যকরভাবে চালু হয়নি। ১০. কৃষি, কারিগরি, চিকিৎসাবিষয়ক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই। ১১. কৃষি, কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই। ১২. বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নেই। ১৩. আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম নেই। ১৪. ইন্টারনেট অভিগম্যতার হার দেশের সর্বনিম্ন। ১৫. কৃষিতে বৈচিত্র্যকরণ কিংবা যান্ত্রিকীকরণের অভাব। ১৬. তিন ফসলী জমি কম। ১৭. সমুদ্র, নদী কিংবা মৎস্যসম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই। ১৮. কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কৃষকের নিজস্ব মূলধনের অপ্রতুলতা। ১৯. কৃষিপণ্যের পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা। ২০. পতিত জমির পরিমাণ বেশি । ২১. উপকূলীয় ও গ্রামীণ অনুন্নত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা। ২২. উন্নয়ন বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম । ২৩. বিদেশি বিনিয়োগ নেই। ২৪. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা ইপিজেড নেই। ২৫. আন্তর্জাতিকমানের তিনতারা বা পাঁচতারা আবাসিক হোটেল নেই। ২৬. 'বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' নেই। ২৭. ফিস প্রসেসিং প্লান্ট ও আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নেই।

আশঙ্কা

১. জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, লবণাক্ততা, ফসলের রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং নদীভাঙ্গন।
২. ভোলার গ্যাস রিজার্ভের স্বল্পতা।
৩. বরিশালে বিনিয়োগের ব্যাপারে অনাগ্রহ।
৪. পরোক্ষ করের পরিধি বৃদ্ধি।
৫. বরিশালের নদীর নাব্য কমে যাওয়া।
৬. বরিশালে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।
৭. অসম রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ।
৮. অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে বরিশালের জনসংখ্যা কমছে।
৯. জলবায়ু দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।
১০. কৃষিজমি কমছে।
১১. বরিশালের মাটির লবণাক্ততার মাত্রা ক্রমান্বয়ে ক্ষতিকর মাত্রার দিকে এগোচ্ছে।

আগামীর বরিশাল বিভাগ ও বাজেট ভাবনা

১. বিমানবন্দর, পায়রা নদী এবং বিশখালী নদীতে সেতু ও ফোর লেনের সড়ক।

সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্র/ তালতলীতে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র/ তালতলী টেংরাগিরি (সোনারচর) ও পাথরঘাটায় পর্যটনকেন্দ্র এবং পায়রাবন্দর এলাকাকে ঘিরে বরগুনায় বিমানবন্দর ও আধুনিক পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুললে দেশের আর্থিক অবস্থার অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বরগুনা জেলার সাথে মোংলা বন্দরের কানেকটিভিটি প্রস্তাবিত পায়রা নদী এবং বিশখালী নদীতে সেতু ও ফোর লেনের রাস্তা বাস্তবায়ন আবশ্যক।

২. পর্যটন ও অর্থনৈতিক খাত

বরগুনা জেলায় অতিদ্রুত টুরিস্ট জোন ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার আদলে টুরিস্টদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করলে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সাথে সাথে বরগুনা জেলায় একটি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণা করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, বরগুনা জেলায় কোনো গ্যাস নেই। জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩. চিকিৎসাখাত

বরগুনা জেলা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এ জেলার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বিধায় চিকিৎসার জন্য সবার পক্ষে বরিশাল যাওয়া সম্ভব না। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হয় অনেককেই। তাই বরগুনা জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই জরুরি।

যতদিন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত না হয়, ততদিন বরগুনা সদর হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকার ব্যবস্থা ও নিশ্চয়তা।

৪. **শিক্ষাখাত**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ৩২১টি সরকারিকৃত কলেজ সরকারি ঘোষণা করা হয় ২০১৬ সালে, জিও হয় ২০১৮ সালে, প্রায় ছয় বছর হওয়ার পরেও শিক্ষকেরা সরকারি বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কিছুই পাননি। অজ্ঞাত কারণে এক্ষেত্রে ধীরগতিতে সব কার্যক্রম চলছে। বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় বর্তমানে বোনাসের পরিমাণ বেসিকের মাত্র ২৫ শতাংশ, যা ১০০ শতাংশে উন্নীত করা দরকার। সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করা উচিত।

৫. **উপকূলীয় অঞ্চল**

বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বরগুনা জেলার কৃষি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা, উপকূলীয় বাঁধের যত্ন, দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, শিক্ষকদের মানসম্মত বেতনভাতা, কৃষিপণ্যের বিপণন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষা, সব শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সহজতর সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

বরিশাল নগরীর সমস্যার শেষ নেই: প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ক্রমেই অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত একযুগে আমরা উন্নয়নের সব সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বরিশাল তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

নগরীর পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্যে রক্ষা করে কীভাবে বরিশালকে একটি উন্নত, আধুনিক, সবুজ নগরীতে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবনা—

১. মাস্টার প্লান: বরিশালের জন্য করা মাস্টার প্লানের সময়সীমার ১২ বছর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু মাস্টারপ্লান উপেক্ষা করে কাজ করায় এর বাস্তব কোনো কার্যকারিতা নেই। বরিশাল নগরীর বর্তমান আয়তন ৫৮ বর্গ কিমি.। জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমান নতুন প্রস্তাবিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী বরিশাল নগরীর আয়তন ধরা হয়েছে ৪০৩ বর্গকিলোমিটার। ২০ বছর পরে জনসংখ্যা হবে প্রায় ৩০ লক্ষ। এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকল্পে আসন্ন বাজেটের আগেই মাস্টারপ্লান অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে নিজস্ব ভবন এবং মঞ্জুরিকৃত জনবলের সব শূন্যপদ পূরণ করার বিকল্প নেই। এই অফিসে অধিকাংশ পদই শূন্য।

২. বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ খসড়া অনুমোদনপূর্বক গেজেট প্রকাশ এবং কার্যক্রম

শুরু করতে হবে। নিজস্ব জনবল, সরঞ্জামাদি, এবং ভবন নির্মাণ অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট নাগরিকদের সংখ্যা ৩ জনের পরিবর্তে অন্তত ৩০ জন করতে হবে।

৩. সিটি কর্পোরেশনের জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা দরকার। আন্তঃসিটি কর্পোরেশনের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো হলে সুফল পাওয়া যাবে।

৪. বরিশাল নগরীতে যানজট ভয়ানক। পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সদর রোড, জেলখানার মোড়, নথুল্লাবাদ, সাগরদী, বটতলা এলাকায় অসহনীয় অবস্থায় উন্নিত হয়েছে। অপরিসর রাস্তা, যানবাহনের সংখ্যা অগুনতি, ফুটপাত ভাসমান হকারদের দখলে, সাইকেল লেন নেই। বাণিজ্যিক ভবনে পার্কিং ব্যবস্থা নেই। এমনকি সরকারি দপ্তরেও সেবাপ্রত্যাশীদের জন্য কোনো পার্কিং ব্যবস্থা রাখা হয় না। নগরময় পাবলিক ওয়াশরুমের অভাব প্রকট। নগরীর অন্তত হাতেম আলী কলেজ চৌমাথা, রুপাতলী, নথুল্লাবাদ, জেলখানার মোড়, সাগরদী এলাকায় পাঁচটি ওভারব্রিজ অথবা ওভারপাস নির্মাণ অতীব জরুরি।

৫. নগরবাসীর সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট। প্রতিদিন ৬ লক্ষ গ্যালন চাহিদার বিপরীতে অর্ধেক উৎপাদন হয়। ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানি শোধনাগার এখনো চালু করা যায়নি। দুটিই পরিত্যক্ত বলা যায়।

৬. ৩০ লক্ষ লোকের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মেট্রোরেলের প্রস্তুতি এখনই নিতে হবে। শহর এড়িয়ে বাইপাস সড়কের অনুমোদন থমকে আছে, দ্রুত এই জট খোলা দরকার। নৌ এবং সার্কুলার সড়কপথের বিষয়ে এখনই চিন্তাভাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করা দরকার।

৭. ওয়ান সিটি টু টাউনের আদলে কীর্তনখোলার তলদেশে দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণের বাস্তবতা যাচাই করতে হবে। ভোলার গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপন এ অঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনবে। প্রস্তাবিত চার লেনের যানবাহনের চাপ এড়ানো এবং কুয়াকাটা, পায়রা বন্দরে চলাচল নির্বিঘ্ন করতে কীর্তনখোলায় দ্বিতীয় সেতু প্রয়োজন।

৮. পর্যটন কর্পোরেশনের অবহেলায় বরিশালে কোনো মানসম্মত বা পাঁচতারকা হোটেল গড়ে ওঠেনি। এ কারণে বরিশালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ফুটবল খেলা দেখা হতে বরিশালবাসী বঞ্চিত। একটি বিভাগীয় নগরে একটি মাত্র স্টেডিয়াম থাকা বড় এক বঞ্চনা।

৯. বঙ্গবন্ধু উদ্যান ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ফাঁকা স্থান, পার্ক, উদ্যানের প্রকট অভাব।

১০. ব্যক্তিগত জলাশয়, পুকুর ভরাট থেকে রক্ষা করতে জলবায়ু তহবিল বা সরকারি অর্থায়নে অধিগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে।

১১. বিভাগে সাফারি পার্ক করা প্রয়োজন।

১২. ইতিহাস, ঐতিহ্য রক্ষায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জাদুঘর আজও খুলনা বিভাগের সাথে সংযুক্ত। অবিলম্বে আলাদা অফিস প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। এর বাইরে অনেক সরকারি দপ্তর বরিশালে স্থাপন করা প্রয়োজন।

১৩. নগরীর ৪৬টি প্রবহমান খালের ২৩-২৪টির এখন আর অস্তিত্ব নেই। অবশিষ্ট খালগুলো দখল-

দূষণে মৃতপ্রায়। ৫-৬টি কোনোরকমে টিকে আছে। সামান্য বৃষ্টিতে নগরী পানিতে সয়লাব হয়ে যায়, ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। এই দুর্দশা থেকে নাগরিকেরা মুক্তি চান। ড্রেনগুলো পুনর্নির্মাণ করা দরকার। খালের সীমানা চিহ্নিত করে, উচ্ছেদ, খনন, সৌন্দর্যকরণ, হাঁটার স্থান, পানি চলাচলের ব্যবস্থা করা হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ, নৌ-চলাচল, পণ্য পরিবহন সুবিধা এবং রাস্তায় ট্রাফিক কমে আসবে। নাগরিকদের চলাচলের সুবিধা হবে।

১৪. বরিশালের বিখ্যাত পেয়ারা ও আমড়ার জন্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।

১৫. নগরীর মধ্যে স্থাপিত ওষুধ কারখানার জন্য স্থান নির্ধারণ করে স্থানান্তর করা খুবই জরুরি।

১৬. ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অনেক বিলম্ব হয়েছে। আইইসিডিয়ার-এর আদলে একটি পরীক্ষাগার খুবই প্রয়োজন।

১৭. নদী ভাঙ্গনরোধ এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে উঁচু এবং টেকিসই বাঁধ নির্মাণ করার জন্য বিশেষ প্রকল্প দরকার। কীর্তনখোলায় অবৈধ দখলদারদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এদের তালিকা প্রকাশ, উচ্ছেদ, সীমানা পিলার নির্মাণ এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণ করে দখল-দূষণ রোধ করা আবশ্যক।

১৮. ইতিহাস, ঐতিহ্য রক্ষা, পর্যটক আগমন উৎসাহিত করতে বিজয়গুপ্ত, জীবনানন্দের বসতভিটা উদ্ধার এবং একটি একাডেমি করা দরকার। জীবনানন্দের স্মৃতিবিজড়িত ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনালয়ের সংস্কার, অশ্বিনীকুমার হলসহ সব ঐতিহাসিক স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।

১৯. শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক ইকোনমিক জোন, দ্বিতীয় বিসিক শিল্পনগরী, চামড়া শিল্পপার্ক স্থাপন কর্মসংস্থান বাড়াবে।

২০. বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরি মৃতপ্রায়। কিশোর-যুবাদের মাদকের ছোবল এবং ইন্টারনেট আসক্তি থেকে বাঁচাতে মডেল মসজিদের ন্যায় বিভাগ এবং জেলাপর্যায়ে বহুমুখী আধুনিক মডেল লাইব্রেরি তৈরির প্রকল্প নিতে হবে।

২১. নগরীতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা নেই। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা চরম অস্বস্তিকর, এর থেকে নগরবাসী পরিত্রাণ চায়। সরকারি এবং বেসরকারি কোনো হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা ভীষণ দুঃখজনক। বরিশালে বর্তমানে নির্মাণাধীন হাসপাতালে যাতে বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রাখা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

২২. নগরীর এবং নৌ-চলাচলকালে নদীতে যাতে মনুষ্য বর্জ্য না যায়, সে লক্ষ্যে সব জলযানে নতুন পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে।

২৩. মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মান্ধাতার আমলের রক্ষাপদ্ধতি বাদ দিয়ে ড্রোন পদ্ধতি প্রচলন করা অতীব জরুরি। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হবে না।

২০২২-২৩ বাজেটে প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট এবং বরাদ্দ পাওয়া না গেলে দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় বরিশাল আরও অনেক পিছিয়ে যাবে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে

সমতার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, বরিশাল নগরী এতটাই পিছিয়ে আছে যে স্বল্পসময়ে এর সমাধান সম্ভব না। এর জন্যে বাজেটে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

প্রণয়ন: মোঃ আখতারুজ্জামান খান, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ বরিশাল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; কাজী মিজানুর রহমান, সরকারি কর্মকর্তা (অব.) ও পরিবেশকর্মী; মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ, তালতলী সরকারি কলেজ, তালতলী, বরগুনা।

বরিশাল বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় সভাপতি: অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সঞ্চালক: অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	শাহ সাজেদা	অধ্যাপক সংগঠক, মহিলা পরিষদ, বরিশাল
২.	সাইদুর রহমান রিন্টু	উপজেলা চেয়ারম্যান; বরিশাল সদর উপজেলা; সভাপতি, বরিশাল চেম্বার
৩.	শাহিনা আজমিন	সাংবাদিক; বরিশাল
৪.	মোঃ শওকত হোসেন	চেয়ারম্যান; লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী
৫.	নাজমুন নাহার রিনা	নারী উদ্যোক্তা; রিনা কটন মিলস্, বরিশাল
৬.	রাহাত খান	সাংবাদিক; নিউজ ২৪ টিভি, বুর্যে প্রধান, বরিশাল
৭.	মোঃ জাকির হোসেন	সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কর্মী; বরিশাল
৮.	মোঃ কাওছার	ঝালমুড়ি বিক্রেতা; বরিশাল
৯.	বিষ্ণু রায়	ছাত্র; বরগুনা
১০.	মোঃ গোলাম মোস্তাফা	প্রভাষক; অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি তালতলী কলেজ, বরগুনা
১১.	মোঃ নওরোজ কবির	কম্পিউটার অপারেটর, পটুয়াখালী
১২.	তুহিন খান	মেম্বার, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, বরিশাল সদর
১৩.	মোঃ আখতারুজ্জামান খান	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
১৪.	মোঃ আমিনুর রহমান খান	অ্যাগ্রোবেইজড ব্যবসায়ী; বরিশাল
১৫.	মহিউদ্দিন আহম্মেদ	মেয়র ও শিল্পপতি; পটুয়াখালী পৌরসভা

১৬.	জ্যোতির্ময় বিশ্বাস	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
১৭.	ড. শামীম আহসান	সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি ঝালকাঠি মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি
১৮.	খেন সানওই	সভাপতি, রাখাইন ভাষা ও সংস্কৃতি সংঘ, তালতলী, বরগুনা
১৯.	কাজী মিজানুর রহমান	অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও পরিবেশকর্মী, বরিশাল
২০.	মিন্টু কুমার কর	সংস্কৃতিকর্মী, বরিশাল
২১.	মহসিন উল ইসলাম হাবুল	অধ্যাপক; শিক্ষক নেতা ও বিশিষ্ট রাজনীতিক
২২.	মেঘনাথ সমদ্দার	প্রভাষক; অর্থনীতি বিভাগ, মিরুখালী কলেজ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
২৩.	মোঃ লকিতুল্লাহ	অবসরপ্রাপ্ত কৃষক, বরিশাল
২৪.	ফজলুল কাদের মজনু মোল্লা	শিল্পপতি ও রাজনীতিক; সভাপতি ভোলা জেলা আওয়ামী লীগ, ভোলা
২৫.	আহাম্মেদ আবদুল্লাহ	প্রভাষক, অর্থনীতি, সরকারি ভোলা কলেজ, ভোলা
২৬.	মনিরুজ্জামান নাসিম আলী	সাংবাদিক; স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, পিরোজপুর
২৭.	সোহেল হওলাদার	রাজমিস্ত্রী; বরগুনা
২৮.	পুলক চ্যাটার্জী	সাংবাদিক; ব্যুরো প্রধান; দৈনিক সমকাল, বরিশাল
২৯.	হান্নানা বেগম	অধ্যাপক; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩০.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার	নির্বাহী পরিচালক (এলপিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩১.	ড. মোঃ সাইদুর রহমান	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩২.	এ জেড এম সালেহ্	অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এবং কোষাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৩.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৪.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৫.	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ	ফেলো চার্টার্ড অ্যাকউন্টেন্ট; পরিচালক ও বোর্ড চেয়ারম্যান, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লি. ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৩৬.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৭.	মোহাম্মদ আকবর কবীর	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৮.	বদরুল মুনির	উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩৯.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪০.	পার্থ সারথী ঘোষ	এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪১.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ, কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪২.	মোহাম্মদ আকবর কবীর	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৩.	নেছার আহমেদ	ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্যাংক এশিয়া এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৪.	ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৫.	খোরশেদুল আলম কাদেরী	পরিচালক, ওয়াগ্গাছড়া টি লিমিটেড, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৬.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৭.	মেহেরুননেছা	নারী উদ্যোক্তা, নরসিংদী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৮.	মোঃ আখতারুজ্জামান খান	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ বরিশাল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বরিশাল অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ
• বরিশাল বিভাগের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখাইনসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে। • বরিশাল বিভাগের জেলাশহরগুলোতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ওয়াশরুম নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। • চর এলাকার দরিদ্র কৃষকদের বোরো ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বাজেটে বিনা সুদ ও প্রণোদনাভিত্তিক বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত। • কৃষকদের দেওয়া সরকারি সহায়তার উপযোগিতা ফিরে পেতে কৃষকদের উৎপাদিত শস্য ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বাজেটে প্রকল্প রাখা দরকার। • বরিশাল বিভাগের রাজস্ব আয় বরিশাল বিভাগের জন্য ব্যয় করার দিকনির্দেশনা বাজেটে রাখতে হবে। • বরিশালের বিভিন্ন এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়কবাতি স্থাপনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। • ২০১৬ সালে সরকারি ঘোষিত ৩২১টি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। • বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় বিদ্যমান বেসিকের ২০ শতাংশ বোনাস ১০০ শতাংশ উন্নীত করতে বরাদ্দ দিতে হবে। • কৃষিজমির বিনাশ করে শিল্পায়ন বিকাশের প্রবণতা বন্ধে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ ও প্রকল্প রাখা প্রয়োজন। • বরিশাল বিভাগের করোনাভাইরাসে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারী উদ্যোক্তা ও কুটির শিল্প কর্মীদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। • বরিশাল বিভাগের ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের সম্পূরক কর ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা প্রয়োজন। • বরিশাল বিভাগের মৎস্য ও ফলমূল সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা জরুরি। • জনপ্রতিনিধিদের বাধ্যতামূলকভাবে বার্ষিক অথবা মেয়াদ ভিত্তিতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ-উদ্দিষ্ট প্রকল্প করা যেতে পারে। • বরিশাল বিভাগে নদ-নদীর নিয়মিত খনন ও নদী শাসনের জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখতে হবে। • প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করায় জেলেদের প্রনোদনাভিত্তিক কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। • বরিশাল বিভাগে বেসরকারি যুব উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। • বরিশাল বিভাগে ক্রমাগত লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধে বিশেষ প্রকল্প নিতে হবে।

- আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের শিক্ষার প্রসারে শতভাগ বৃত্তি নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে
- আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে বাজেটে প্রকল্প রাখতে হবে।
- রাখাইনদের দুর্বল আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- রাখাইনসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের দখলকৃত জমিজমা পুনরুদ্ধার ও রক্ষায় পৃথক ভূমি কমিশন ও ট্রাইবুনাল গঠন করা প্রয়োজন।
- রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রবীণদের জন্য বয়স্ক ভাতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় বাজেটে পৃথকভাবে বরাদ্দ রাখা উচিত।
- পায়রা সমদ্রবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণকৃত সাড়ে সাত হাজার জমির মালিকের কর্মসংস্থানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ জরুরি।
- বিরুদ্ধ জলবায়ুর কারণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের সমস্যা ও দাবির কথা বিশ্বপরিসরে তুলে ধরতে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় লবণসহিষ্ণু ফসলের প্রসারে বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন করা জরুরি।
- জলাবদ্ধতার নিরসন করে ফসল চাষ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।
- অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতির আলোকে ইউএনওর নেতৃত্বে কৃষকদের নিয়ে বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- বরিশাল বিভাগে পর্যটন শিল্প বিকাশে জাতীয় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।
- বরিশাল-কুয়াকাটা চার লেন মহাসড়ক নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- ভোলা জেলার গ্যাস অনুসন্ধানে বাজেটে বিশেষষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ভোলা জেলায় প্রস্তাবিত ইপিজেড দ্রুত বাস্তবায়ন করে শিল্পায়ন বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- ভোলা জেলার টেকসই সড়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ভোলা-বরিশাল ও ভোলা-লক্ষ্মীপুর ফেরি যোগাযোগ গতিশীল করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ভোলা-লক্ষ্মীপুর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- ভোলা জেলাসশ্লিষ্ট ব্লু ইকোনমি বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ভোলার গ্যাস দিয়ে বরিশালে শিল্প বিকাশ তরান্বিত করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- ভোলা জেলায় ইপিজেড নির্মাণ করে শিল্পায়ন বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বরগুনা জেলায় বিমানবন্দর নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- বরগুনার পায়রা ও মোংলার বিষখালী নদীর মধ্যে সেতু নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- বরিশাল-আমতলী ও বরিশাল বরগুনা চার লেন সড়ক নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- বরগুনা জেলায় গ্যাস সংযোগ দিতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা জরুরি।
- বরগুনা জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

- ঝালকাঠি জেলার পেয়ারা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে শিল্প গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- ঝালকাঠি জেলার ঐতিহ্যবাহী গামছা ও শীতলপাটি শিল্পের বিলুপ্তি রোধে বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- সেকেন্ড ক্যালকাটা খ্যাত ঝালকাঠির কাঁসা ও তামা শিল্প রক্ষায় বাজেটে প্রণোদনা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- পিরোজপুর জেলায় ভাসমান পদ্ধতির সবজি চাষ পদ্ধতি বিকাশে বাজেটে দৃষ্টি দিতে হবে।
- পিরোজপুরের সুপারি, ফলমূল বিপণন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বরাদ্দ রাখা জরুরি।
- পিরোজপুরের পোল্ট্রি, তাঁত, কাঠ শিল্প ও ক্রিকেট ব্যাট ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ শিল্প প্রসারে বাজেটে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
- পিরোজপুরের ডকইয়ার্ডটি আধুনিকায়নে বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- বরিশাল শহরের কীর্ত্তনখোলা নদীর নিচ দিয়ে 'ওয়ান টাউন টু সিটি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের দ্বিতীয় টানেল নির্মাণ করতে প্রকল্প প্রণয়ন করা জরুরি।
- বরিশাল জেলার শিল্প ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ প্রকল্প নেওয়া দরকার।
- বরিশাল জেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নে সবুজ বিপ্লব ঘটাতে নদীর তীর উঁচু করা ও তীব্র নদীভাঙ্গন রোধে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
"বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: সিলেট বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়"

২৫ মার্চ, ২০২২ রোজ শুক্রবার, সময়: ৩:৩০ মিনিট

১. একনজরে সিলেট বিভাগ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা নিয়ে ১৯৯৫ সালে সিলেট বিভাগ গঠিত হয়। ১২ হাজার ৫৯৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই বিভাগ বাংলাদেশের মোট ভূমির ৮.৫ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ বা ১ কোটি ২১ লক্ষ মানুষ (২০১৬) এই বিভাগে বসবাস করে। যেখানে দেশের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করে, সিলেট বিভাগে এটি মাত্র ১২.৫ শতাংশ। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক রূপরেখার বৈচিত্র্যের কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ আলাদা এই বিভাগ। মোট ভূমির মধ্যে সমতল ভূমি ৫৭.৫ শতাংশ, হাওর ৩০.২ শতাংশ এবং চা বাগান-বন-পার্বত্য ভূমি এলাকা ১২.৫ শতাংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সাধারণ অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সিলেট বিভাগ বেশ ভালো অবস্থানে থাকলেও সামাজিক সূচকসমূহে এই বিভাগ নিচের সারিতে রয়েছে। অথচ শোভন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিলেট বিভাগ হতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম হাতিয়ার। নিচে সিলেট বিভাগের সমস্যা ও সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো, যা বাজেট প্রণয়নকালে নীতিনির্ধারকেরা বিবেচনা করলে দেশ ও জাতি নিশ্চিতভাবে অনেক এগিয়ে যাবে—

২. সম্ভাবনা

২.১ স্বাস্থ্য

- বাংলাদেশ সরকার তার চতুর্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচিতে (এইচএনপিএসপি) স্বাস্থ্যখাতে ওপর জোর দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও অঞ্চলের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা গেলে স্বাস্থ্যখাতে অনেক পিছিয়ে থাকা সিলেট বিভাগের মানুষের নাজুক স্বাস্থ্য সূচকের অনেকটাই পরিবর্তন হবে।
- স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পকে দেশব্যাপী, বিশেষ করে আঞ্চলিক প্রয়োজন বিবেচনা করে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।
- আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ ঘোষণা করে সিলেট বিভাগের জন্য পৃথকভাবে এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে হবে ।

২.২ শিক্ষা

- সিলেট বিভাগে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল।
- সিলেট বিভাগে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় (যার মধ্যে তিনটি সরকারি) এবং পাঁচটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে।

- হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ নির্মাণাধীন।

২.৩ অর্থ ও ব্যাংকিং

- দেশের আটটি বিভাগের মধ্যে মাথাপিছু আমানতের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের চেয়ে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম এগিয়ে। তবে ঋণ ও অগ্রিম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই বিভাগে সবচেয়ে শেষের দিকে রয়েছে।
- প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ও চা রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ততায় এ অঞ্চলের মানুষের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থকড়ি থাকলেও বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আশানুরূপ নয়।
- অভিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রবাহিত করা গেলে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো।
- রেমিট্যান্সের প্রবাহ এফডিআই-এ রূপান্তরকরণে উৎসাহিত করা গেলে তা দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত বিবর্তন এবং উদ্ভাবনের কারণে এই অঞ্চলের অভিবাসীদের কাছ থেকে সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজে লাগানো গেলে এই অঞ্চলকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রযুক্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

২.৪ চা উৎপাদন

- দেশের ১৬৭টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৬টিই সিলেট অঞ্চলে। সিলেট বাংলাদেশের চা শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুকূল জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সুষ্ঠু ও সমন্বিত একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই অঞ্চলকে বিশ্বের অন্যতম চা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব।
- নির্মাণাধীন শিল্পপার্কে চা উৎপাদন ও চা-পাতা প্রক্রিয়াকরণকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ না দিলে এই অঞ্চলের চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা চা শিল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

২.৫ পর্যটন

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের পর্যটন খাতে এখন ৮.০৭ শতাংশ কর্মশক্তি নিয়োজিত এবং দেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ৩.০২ শতাংশ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে সিলেট বিভাগে অসংখ্য পর্যটন স্থান রয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ থাকলেও সুষ্ঠু পরকল্পনা ও অবকাঠোমোগত দুর্বলতায় এই শিল্পটি বিকশিত হতে পারছে না।

- পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা গেলে এই অঞ্চলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো।
- সিলেটের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি চালু থাকলেও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং অনুবর্তী অবকাঠামোর দুর্বলতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করা গেলে সিলেট বিভাগ সহজেই একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

২.৬ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

- তেল, গ্যাস, চুনাপাথর, সিলিকাসহ অসংখ্য খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি।
- বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি পাথরের খনি রয়েছে, যা সারা দেশে নির্মাণ প্রকল্পের জন্য নিয়মিত পাথর সরবরাহ করে থাকে।
- এই অঞ্চলের ১ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে পাথর আহরণ ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সরকারের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে এই শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে আরও লাভজনক করা সম্ভব।

২.৭ হাওড় ব্যবস্থাপনা

- বাংলাদেশে ৩৭৩টি হাওর রয়েছে, যার মধ্যে ২১৭টিই সিলেট বিভাগে অবস্থিত। ৬ লাখ ১৫ হাজার ৫৫৬ হেক্টর ভূমিজুড়ে বিস্তৃত হাওর অঞ্চলে কৃষি সম্পদ-মৎস্য-পশুসম্পদ এবং পর্যটনসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নে কাজে লাগানো গেলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক চেহারাই পাল্টে ফেলা সম্ভব।
- বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড (বিএইচডব্লিউডিবি) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পানির গুণমান বৃদ্ধি, প্রকৃতি পুনরুদ্ধার এবং দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন।

২.৮ শিল্প এলাকা ও হাইটেক পার্ক

- শ্রীহাট্টা অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশের বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীকে ইতিমধ্যেই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কাছে এবং কুশিয়ারা নদীতে সহজে প্রবেশ সুবিধার কারণে এই অঞ্চলটি দেশি ও বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করেছে।
- সিলেট শহরের ঠিক বাইরে নির্মিত হাইটেক পার্ক এই অঞ্চলে আইটিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহিত করবে, এটি সিলেটের পর্যটন সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- হবিগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে আরেকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হচ্ছে।
- এসব অর্থনৈতিক জোন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সিলেটের আঞ্চলিক অর্থনীতি সম্প্রসারিত করে প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এতে করে অগ্রসর-অনগ্রসর এলাকাসমূহের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পেয়ে জীবনমানের উন্নতি ঘটবে।

- বৈদেশিক মুদ্রার প্রাচুর্যকে বিলাসবহুল বাড়িঘর তৈরির মতো অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করার প্রবণতা বন্ধ করতে হলে করার রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের সুষ্ঠু ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা জরুরি।

৩. সমস্যাসমূহ

৩.১ স্বাস্থ্য

- প্রসবপূর্ব পরিচর্যা বাস Antenatal care (ANC)-এর ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ বাংলাদেশে সর্বনিম্ন অবস্থানে (১০.৮ শতাংশ) রয়েছে।
- সিলেটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের হার বাংলাদেশে সবচেয়ে কম (৩৮ শতাংশ) ।
- সিলেট বিভাগে নারীপ্রতি শিশুজন্মের হার সর্বাধিক ২.৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশ সরকারের ২০২২ সালের ২ শতাংশ লক্ষ্যের চেয়ে বেশি।
- আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ বাংলাদেশে সবচেয়ে কম (৪৫ শতাংশ)।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির মাত্র ১.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কমপক্ষে ৫ শতাংশ সুপারিশ করেছিল।
- আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সিলেট বিভাগের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ নেই।
- সিলেটে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প নেই।

৩.২ শিক্ষা

- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দিক থেকে সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার মধ্যে মৌলভীবাজারের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ। এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই, যা এই বিভাগের শিক্ষা বৈষম্যকে আরও তীব্র করেছে।

৩.৩ ব্যাকিং, অর্থ ও বিনিয়োগ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের (জুন ২০২১) তথ্য অনুসারে, সিলেট বিভাগের জন্য আমানত-ঋণ অনুপাত ০.২৪, যা দেশের ০.৮৩ তুলনায় লক্ষণীয় পরিমাণ কম, যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে যথাক্রমে ০.৮৮ এবং ০.৭৯।
- বিনিয়োগ তহবিলের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সিলেট থেকে অন্যান্য বিভাগে আমানত স্থানান্তর করা হয়। অথচ সিলেট বিভাগের প্রচুর উন্নয়ন সম্ভাবনা রয়েছে।
- সিলেট বিভাগে বিনিয়োগের পরিবেশের সৃষ্টিতে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ ও কর্মপরিকল্পনা রাখা প্রয়োজন।
- প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ও রপ্তানি থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের পরিবর্তে ভোগ ব্যয়ে চলে যায়। এ কারণে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও এলাকার মধ্যে আয় ও ব্যয়ে দৃষ্টিকটু রকম বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।
- এই বিভাগে বিনিয়োগের পরিবেশ অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য কোনোভাবেই অনুকূল নয়। বিভিন্ন রকম পদ্ধতিগত ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রবাসীরা বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে অর্থ

ব্যয়ের চেয়ে পরিবার ও পোষ্যদের জীবনমান উন্নয়নে শুধু প্রয়োজনীয় অর্থই প্রেরণ করতে বেশি আগ্রহী। শিক্ষাগত অনগ্রসরতা ও অঞ্চলকেন্দ্রিক মানসিকতা বিনিয়োগবিরোধী মনোভাব বা প্রবণতা সৃষ্টিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

- নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে প্রখর আঞ্চলিক মানসিকতাসম্পন্ন সিলেট বিভাগে ব্যবসা উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা ঐতিহাসিক কারণে একটু কঠিন ও জটিল। এ কারণে এই অঞ্চলের রেমিট্যান্স প্রাচুর্য উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত না হয়ে জীবনযাত্রার বিস্তৃত অর্থায়নে কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে।
- সিলেটের অন্যতম অর্থকড়ি ফসল চা-পাতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই পদ্ধতির সাথে জড়িত মানুষজনের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও দক্ষতা অভাবে এই ভীষণ লাভজনক এই শিল্পের বিকাশ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
- চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন অত্যন্ত কম এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থাও করুণ। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ও কঠিন বৈশ্বিক চা বাজারে অবস্থান ধরে রাখতে এবং বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে হলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষজনের বিশেষত শ্রমিকদেরে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো অপরিহার্য।
- সিলেট বিভাগ বিভিন্ন এলাকা পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরেই অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে রয়ে গেছে। এই বিভাগের ৩ জন অর্থমন্ত্রীর ৩০টিরও বেশি জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের পরও যোগাযোগ অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের করুণ অবস্থা উন্নয়ন অর্থনীতির পরিমণ্ডলে বিশেষ গবেষণার খোড়াক জোগাতে পারে বলে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পর্যটকেরা দূরত্ব ও যোগাযোগ অপ্রতুলতার কারণে প্রচুর সম্ভাবনাময় বেশ কয়েকটি পর্যটন গন্তব্যে প্রবেশ করা কঠিন। এ কারণে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হলেও এ অঞ্চলে এই শিল্পটি প্রত্যাশিত মাত্রার ধারেকাছেও যেতে পারছে না।
- পরিবেশবান্ধব যান চলাচলের সুযোগ থাকলেও যত্রতত্র অনানুষ্ঠানিকভাবে চালিত ডিজেল যানবাহন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে একদিকে এই অঞ্চলের পরিবেশ-প্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে পর্যটকেরা এই অঞ্চল ভ্রমণে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। পর্যটন ব্যবসার বিকাশের স্বার্থে একটি সুপরিকল্পিত ও কাঠামোবদ্ধ যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- অপরিকল্পিতভাবে ভবন ও সড়ক নির্মাণের কারণে এই অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয় ও পাহাড়ধসের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।
- নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে খনি থেকে পাথর উত্তোলন করা এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর 'বোমা মেশিন' এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কর সৃষ্টি করেছে।
- অরিকল্পিত পাথর আহরণ ও উত্তোলনের কারণে সরকার এসব খনি থেকে রাজস্ব হারাচ্ছে। পাশাাপশি মানুষের কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে।
- মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা প্রকৃতির। উজান থেকে নেমে আসা ঢলে আকস্মিক বন্যা, যথাযথ স্যানিটেশনের অভাব, পানীয়জলের অভাব, পর্যাপ্ত সড়ক নেটওয়ার্ক না থাকা, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া,

নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে এই অঞ্চলের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

- নদী, খাল ও হাওর থাকায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মাছ উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে এই অঞ্চল বিবেচিত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা, পানিতে ভেসে আসা পলি অপসারণে নিয়মিত খনন কার্যক্রম না থাকা এবং অপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত মাছ আহরণের কারণে এ অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।
- বিশেষ বিশেষ সময়ে মৎস্য আহরণ বন্ধ করে ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে জেলেদের জন্য যে ধরনের রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, এই অঞ্চলেও তেমন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছেন।
- হাইটেক পার্কটি এপ্রিল ২০২১ সালের মধ্যে শেষ করে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার কথা থাকলেও আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্লট হস্তান্তর করেও এই হাইটেক পার্ক এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। প্রকল্পের অহেতুকু এই বিলম্ব বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের আস্থা নষ্ট করছে।
- বিনিয়োগ জটিলতা কমাতে সিলেট বিভাগের বিনিয়োগে ওয়ান স্টপ পরিষেবা চালু করা জরুরি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

প্রণয়ন: অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; তানিয়া সুলতানা তন্বি, রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, আইসিডিডিআরবি, সিলেট; সৈয়দ আরাফাত জুবায়ের; অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সিলেট বিভাগের ওয়েবিনার মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় **সভাপতি:** অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত **সঞ্চালক:** অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	ড. মোঃ মাহবুবুল হাকিম	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
২.	তানিয়া সুলতানা তন্বি	গবেষণা তদন্তকারী; মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ আইসিডিডিআরবি
৩.	বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী	সাংবাদিক; সভাপতি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (ইএমজেএ), সিলেট
৪.	তারেক মাহমুদ	এসএভিপি; ক্লাস্টার প্রধান, সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড, সিলেট
৫.	আমিনুল হক চৌধুরী	আঞ্চলিক প্রধান; ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, সিলেট
৬.	কিশোলয় চক্রবর্তী	শিক্ষা অফিসার; বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট
৭.	আবুল কালাম আজাদ	মৎস্য কর্মকর্তা; সিলেট, জেলা মৎস্য অফিস, সিলেট
৮.	মোঃ রাজউদ্দিন	আইনজীবী; জিপি, জজ কোর্ট, সিলেট
৯.	সন্তনু দত্ত সন্টু	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ১৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট
১০.	শহিদুল ইসলাম শাহীন	আইনজীবী; সাবেক সভাপতি, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি, সিলেট
১১.	ড. সৈয়দ আশরাফুর রহমান	অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
১২.	ব্যারিস্টার ফয়েজ আহমেদ	আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
১৩.	ফজলুর রহমান	মেয়র, মৌলভীবাজার পৌরসভা
১৪.	সালেহ এলাহী কুট্টি	সাংবাদিক, মৌলভীবাজার
১৫.	ড. মুহাম্মদ আবু তাহের	ব্যাংকার, মৌলভীবাজার

১৬.	আকমল হোসেন নিপু	সাংবাদিক; সিলেট
১৭.	সরওয়ার আহমেদ	সাংবাদিক; সুনামগঞ্জ
১৮.	বকশী ইকবাল আহমেদ	ব্যবসায়ী; মৌলভীবাজার
১৯.	বকশী মিসবাহ উর রহমান	ব্যবসায়ী; মৌলভীবাজার
২০.	সমরজিৎ সিংহ	জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কর্মী, কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার
২১.	মুজিব উর রহমান রঞ্জু	সাংবাদিক, মৌলভীবাজার
২২.	ইমাদ উদ্দিন	সাংবাদিক, মৌলভীবাজার
২৩.	মো. নুরুল	সাংবাদিক, মৌলভীবাজার
২৪.	সৈয়দ হুমায়েদ আলী শাহিন	সাংবাদিক, মৌলভীবাজার
২৫.	ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক	অধ্যাপক; পলিটিক্যাল স্টাডিজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
২৬.	মোঃ মহিবুল ইসলাম	বীমা কর্মকর্তা; জোনাল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সিলেট
২৭.	শাহ ফখরুজ্জামান	আইনজীবী ও সাংবাদিক; জজ কোর্ট
২৮.	মঈন উদ্দিন আহমেদ	সাংবাদিক; হবিগঞ্জের মুখ, হবিগঞ্জ
২৯.	মোঃ আসাদুজ্জামান	শিক্ষক; আবু জাহের উচ্চবিদ্যালয়, হবিগঞ্জ
৩০.	জালাল উদ্দিন শাওন	অধ্যক্ষ; কবির কলেজ, হবিগঞ্জ
৩১.	আলী আসগর	অধ্যক্ষ; ধর্মগর ডিগ্রি কলেজ, মাধবপুর
৩২.	ফকরুদ্দিন আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক; শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, হবিগঞ্জ
৩৩.	হারুনুর রশীদ চৌধুরী	সাংবাদিক; এনটিভি, সিলেট জেলা
৩৪.	শুভ্রত বৈষ্ণব	উন্নয়নকর্মী; এনজিও এসডিএম ফাউন্ডেশন সুনামগঞ্জ
৩৫.	জাফর ইকবাল	উন্নয়নকর্মী; এনজিও; এএসএসইডি, হবিগঞ্জ
৩৬.	লিটন মিয়া	শিক্ষক; ডা. ইদ্রিস আলী উচ্চবিদ্যালয়, জাফলং, গোয়াইনঘাট, সিলেট
৩৭.	দেওয়ান মিয়া	ব্যবসায়ী; বিসিক, সিলেট
৩৮.	মিজানুর রহমান শামীম	ব্যবসায়ী; চেম্বার সভাপতি, সিলেট
৩৯.	আবু বক্কর সিদ্দিকী	আইনজীবী; জজ কোর্ট, সিলেট
৪০.	জাকারিয়া চৌধুরী	যুক্তরাজ্য প্রবাসী; উদ্যোক্তা, যুক্তরাজ্য
৪১.	হারুনুর রশীদ চৌধুরী	সাংবাদিক; এনটিভি
৪২.	চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা চেয়ারম্যান; শাল্লা উপজেলা, পরিষদ, সুনামগঞ্জ
৪৩.	করুণা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল	উপজেলা চেয়ারম্যান; তাহিরপুর উপজেলা পারিষদ, সুনামগঞ্জ
৪৪.	কাশ্মীর রেজা চৌধুরী	সভাপতি; পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা
৪৫.	খলিল রহমান	সাংবাদিক; সিলেট
৪৬.	পঙ্কজ কান্তি দে	সাংবাদিক; সুনামগঞ্জ
৪৭.	অধ্যাপক হান্নানা বেগম	অধ্যাপক; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪৮.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪৯.	পার্থ সারথী ঘোষ	এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫০.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫১.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ, কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫২.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫৩.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫৪.	ড. মোঃ মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫৫.	শাহানারা বেগম	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ নড়াইল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫৬.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৫৭.	শাহেদ আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
৫৮.	মেহেরুননেছা	নারী উদ্যোক্তা, নরসিংদী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সিলেট বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ
• দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সৎ মানুষ নিয়ে বাজেট প্রণয়নের প্রতিফলন আসন্ন বাজেট দলিলে থাকতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্ধেক সিলেটের উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য বাজেটে দিকনির্দেশনা রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটের পর্যটন সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে বালু ও পাথরের সহজলভ্যতা কাজে লাগিয়ে কাচ ও টাইলস কারখানা স্থাপনে বাজেটে প্রকল্প রাখতে হবে। • কৃষিখাতে স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে কৃষক ও কৃষিপণ্যে ভর্তুকির জন্যে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ ও প্রকল্প রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে প্রসবপূর্ব পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের শোচনীয় হার নিরসনে বাজেটে জরুরি বরাদ্দ দিতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে ট্রানজিটমুখী যোগাযোগ পরিসেবা বন্ধ করে গণমুখী সড়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটের ১৫৮টি চা বাগানে চরম হতদরিদ্র শ্রমিকদের মজুরিসহ নানাবিধ বৈষম্য নিরসনে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন। • বৃহত্তর সিলেটে নৌযোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে সুসমন্বিত সড়ক পরিবহন অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। • সিলেট বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্থাপনের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে হাওড়-বাঁওড়সমূহ সমষ্টিক ভিত্তিতে ব্যবহার ও বণ্টনের জন্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। • সিলেট বিভাগের ৫৪টি আন্তদেশীয় নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে যৌথনদী কমিশনের বিশেষ ভূমিকা পালনের নিমিত্তে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে। • সিলেট বিভাগে আশঙ্কাজনক হারে বনভূমি দখল-বেদখল কঠোর হস্তে দমনে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। • হাওড়াঞ্চলে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। • বৃহত্তর সিলেটে বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ে বা বাইপাসওয়ে নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শতভাগ রাষ্ট্রীকরণে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বৃহত্তর সিলেটে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিকল্পিত ব্যবহারকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বৃহত্তর সিলেটে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির দুর্ভোগ নিরসনে বাজেটে বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বৃহত্তর সিলেট হাওড়াঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ইলিশ মাছ প্রজনন নীতিমালার মতো বাজেটে প্রকল্প নিতে হবে।
- হাওড়াঞ্চলে ক্ষতিকর জাল ও অবৈধভাবে মাছ নিধন বন্ধে বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-কুলাউড়া-শাহাবাজপুর রেললাইন পুনরায় স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- হবিগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।
- হবিগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প বিকাশের প্রবণতা বন্ধে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- হবিগঞ্জের প্রবাসী নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে বাজেটে পরিকল্পনা নিতে হবে।
- হবিগঞ্জে সরকারি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
- হবিগঞ্জের অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে জরুরি ভিত্তিতে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- হবিগঞ্জে প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- হবিগঞ্জে একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- হবিগঞ্জের পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনে বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।
- হবিগঞ্জের অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নে জরুরি ভিত্তিতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
- হবিগঞ্জে প্রসবপূর্ব পরিচর্যাসেবা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের হার বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।
- হবিগঞ্জের শহরাঞ্চলে আশঙ্কাজনক হারে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া রোধে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় খরা মৌসুমে তীব্র কৃষি ও পানীয়জলের সংকট নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- সুনামগঞ্জের নদী ও হাওড়ের ভাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতি রোধে বাঁধ নির্মাণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- সুনামগঞ্জের ইউনিয়নভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা জরুরি।
- সুনামগঞ্জে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখতে হবে।

- সুনামগঞ্জের প্রকৃত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- সুনামগঞ্জের শিক্ষার হার বাড়ানো ও বর্ষাকালে হাওড়াঞ্চলে শিশুদের স্কুল যাতায়াতের জন্য বাজেটে প্রকল্প নিতে হবে।
- সুনামগঞ্জে কৃষি মৌসুমে সেচহীনতা ও জলাবদ্ধতার কারণে কৃষিযোগ্য ২৮ হাজার হেক্টর জমি চাষ উপযোগী করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সুনামগঞ্জের একটি হাওড় গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সুনামগঞ্জের শ্রমঘন শিল্প বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারের শমসেরনগরে বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- মৌলভীবাজারে চা নিলাম কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারে যেসব হাওড়কে হাওড় উন্নয়ন প্রকল্পে নেওয়া হয়নি, সেসবের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারে বিভিন্ন উপজেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারে বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীভাবে বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মৌলভীবাজারে আবাসিক গ্যাস লাইন স্থাপনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সিলেটে বন্ধ ও বন্ধপ্রায় সরকারি মিলকারখানা পুনরায় চালুকরণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সুনামগঞ্জের হাওড়-বাঁওড় ও বিভিন্ন এলাকা রক্ষায় কংস নদী থেকে গোমাই নদীর মুগদাখালী হয়ে আবিদনগর পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার, বটেরখাল নদীর মুখ থেকে মহাসিং নদের মুখ এবং সুমেশ্বরী ও সুরমা নদীর মোহনা অংশে জরুরি ভিত্তিতে খননকাজ চালাতে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।

"বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতি আলোচনা: চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়"

০২ এপ্রিল, ২০২২ রোজ শনিবার বিকেল ৩:৩০টা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় চট্টগ্রাম বিভাগের সমস্যা, সম্ভাবনা ও বাজেটে অগ্রাধিকারযোগ্য খাত ও ক্ষেত্র

একনজরে চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের আয়তন ৩৩৯০৪ বর্গ কিমি (বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ), জনসংখ্যা ২৯১৪৫০০০ জন (২০১১), উপজেলা ১০৩টি, থানা ১২০, পৌরসভা ৬২, ইউনিয়ন পরিষদ ৯৪৯ এবং সিটি কর্পোরেশন ২টি। পাহাড়, সমুদ্র, নদী ও সমতলবেষ্টিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অনুপম সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই বিভাগের দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মানচিত্রে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থান। চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা; পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি; উত্তরে ফেনী জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। এ ছাড়া দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের জেলারই একটি অংশ। চট্টগ্রাম জেলাকে বলা হয় বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে চট্টগ্রাম বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে বিবেচিত চট্টগ্রাম জেলা তথা বিভাগের যতটা উপযোগিতা, তার বড় একটি অংশই কাজে লাগানো যায়নি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা কারণে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তথা এই অঞ্চলের অর্থনীতিবিদদের চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনাসমূহ অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে যা তুলে ধরা হলো—

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি—চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বাজেট প্রস্তাবনা

- চট্টগ্রাম শহরে স্বাধীনতাপরবর্তী সরকারি উন্নতমানের কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ছাড়া উন্নত সুবিধাসংবলিত সরকারি কোনো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হয়নি। আসন্ন বাজেটে বিশেষায়িত হাসপাতালসহ ১ হাজার শয্যার নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।
- বর্তমান দেশের ২য় বৃহত্তম জনবহুল শহর চট্টগ্রামে স্বাধীনতাপরবর্তীকালে কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। তাই আসন্ন বাজেটে নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।
- চট্টগ্রাম শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন, যার একটি হলো দেওয়ান হাট ওভারব্রিজ ও অন্যটি হলো কদমতলি ফ্লাইওভার। এ দুটি লাইফলাইন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে, যা ভবিষ্যৎ চট্টগ্রাম শহরের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের রেল যোগাযোগের বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই

বর্তমান রেলস্টেশন ওখান থেকে সরিয়ে ১ কিলোমিটার দূরে টাইগারপাস এলাকায় নতুন রেলস্টেশন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে মিল রেখে বা একই নিয়ম মেনে করার জন্য প্রস্তাব করছি।
- অক্ট্রয় ট্যাক্স বা ডিউটি যা আগে বাতিল করা হয়েছিল, তা পুনরায় চালু বা বহাল করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরও গতিশীলতা আনতে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বন্দর কর্তৃপক্ষের চিহ্নিত সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং বন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে পরিবেশবান্ধব করা যায়, সে জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামস্থ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে গ্যাস ও বিদ্যুৎ এবং দক্ষ শ্রমিকের সংকট নিরসনে পরিবেশবান্ধব কারখানা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং অর্থায়নের স্বল্পতা দূর করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে ।
- চট্টগ্রামে অবস্থিত ডেইরি ও পোল্ট্রি ফার্মের আধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের পশুর অভাব দূর করার পাশাপাশি এ খাতের জন্য ব্যাংক সুদের হার কমানো, কাঁচামাল সরবরাহ সহজ ও শুল্কমুক্ত করা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধিতে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামের প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু ও মাতৃগর্ভকালীন মায়ের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও বরাদ্দ রাখতে হবে।
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জাহাজের ব্যবস্থা করা, জলদস্যুতা কমানোর ব্যবস্থা করা এবং মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন জেলেদের জন্য আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রণয়ন: অধ্যাপক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, সেনবাগ, নোয়াখালী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; এ টি এম কামরুদ্দিন চৌধুরী, ব্যবস্থাপক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, জুবলী রোড শাখা, চট্টগ্রাম; মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী, মায়াবীনি, ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; খোরশেদুল আলম কাদেরী, পরিচালক, ওয়াগ্গাছড়া টি লিমিটেড, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; অধ্যাপক হান্নানা বেগম, সন্দ্বীপ; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

চট্টগ্রাম বিভাগের ওয়েবিনার মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় সভাপতি: অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সঞ্চালক: অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম		
১.	মোঃ জাফর আলম	সদস্য, প্রশাসন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
	মোঃ নাসির উদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইস্টার্ন অ্যাপারেলস ও প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমই
২.	মোঃ রাকিবুর রহমান টুটুল	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাহার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, প্রেসিডেন্ট, ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশনস, বাংলাদেশ, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ডেইরি ফার্ম অ্যাসোসিয়েশন
৩.	ডাঃ বাসনা মুহুরী	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৪.	মাহফুজুল হক শাহ	ব্যবসায়ী; কো-চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট ও শিপিং, এফবিসিসিআই;
৫.	সাহেদ সরওয়ার	ব্যবসায়ী; কো-চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট অ্যান্ড শিপিং, এফবিসিসিআই
৬.	মোঃ মহিউদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, চাক্তাই খাতুনগঞ্জ আড়তদার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি
৭.	মিশকাত আহমদ	ইসি মেম্বার, বিএমএফএ, প্রোপাইটর: মিশকাত ট্রেড সেন্টার
৮.	মনোয়ারা হাকিম আলী	সভানেত্রী, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, চট্টগ্রাম
৯.	অধ্যাপক আব্দুল আলীম	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড
১০.	ড. এস এস আবু জাকের	অতিরিক্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড
১১.	জাফর আহমেদ রাজু	সোবহান ট্রেডার্স, চট্টগ্রাম
১২.	সাইয়েদ মোঃ তৈয়ব	মহানগর সার্ভিস, নোয়াখালী
১৩.	আ ন ম রাইসুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মুনস্টার হ্যাচারি, চট্টগ্রাম
১৪.	তরী চাকমা	উদ্যোক্তা, রাঙ্গামাটি

১৫.	বাদশা ফয়সাল	ফাউন্ডার ও নির্বাহী পরিচালক, গোবরা ট্যুরিজম, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
১৬.	কুন্তি চাকমা	উদ্যোক্তা, রাঙ্গামাটি
১৭.	কামরুল হাসান	উন্নয়নকর্মী, খাগড়াছড়ি
১৮.	দিশারী চাকমা	জুমচাষি, রাঙ্গামাটি
১৯.	মেহেদী হাসান	প্রভাষক; বাংলা বিভাগ, বান্দরবান সরকারি কলেজ
২০.	উত্তম দাস	সমাজকর্মী, বান্দরবান
২১.	সুমিনা চাকমা	নারী উদ্যোক্তা, খাড়ড়াছড়ি
২২.	ক্ষণিকা চাকমা	উদ্যোক্তা, জুমচাষ প্রোডাকশন, বান্দরবান
২৩.	সাইফুদ্দিন মিঠু	পর্যটন উদ্যোক্তা; তানজিম ট্যুরস খাগড়াছড়ি
২৪.	মোঃ নাসির উদ্দিন	জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
২৫.	মোঃ জসিম উদ্দিন	অধ্যক্ষ, ঈদগাহ রশীদ আহম্মদ কলেজ
২৬.	মোস্তফা কামাল চৌধুরী	সভাপতি, লবণ মিল মালিক সমিতি, কক্সবাজার
২৭.	মাসুদুর রহমান	ম্যানেজার, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, কক্সবাজার শাখা
২৮.	মোঃ জসিম উদ্দিন	অধ্যাপক, মহেশখালী কলেজ, মহেশখালী, কক্সবাজার
২৯	মোমেনুল আলম বাবু	ব্যবসায়ী: পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া চেম্বর অব কমার্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩০	এস আর এম ওসমান গণি সজীব	সাংস্কৃতিক সংগঠক; গণি সজীব কালচারাল সেন্টার, কুমিল্লা
৩১.	এ জেড এম আরিফ হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩২.	আবুল কাশেম হৃদয়	সম্পাদক, দৈনিক কুমিল্লরি কাগজ, কুমিল্লা ব্যুরো চিফ, চ্যানেল আই
৩৩.	মোঃ তাইফুল ইসলাম	গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩৪.	নারো সিং	সভাপতি, তাঁতী সমিতি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৩৫.	শামীমা আক্তার শম্পা	শিল্প উদ্যোক্তা, পদ্ম পুরাণ, কুমিল্লা
৩৬.	মিসেস দিলারা	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, নোয়াখালী
৩৭.	শ্যামল চক্রবর্তী	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, কানকির হাট কলেজ, নোয়াখালী
৩৮.	মো. আল হোসেইন	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, সোনাইমুড়ি সরকারি কলেজ, নোয়াখালী
৩৯.	মিসেস নার্গিস	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী
৪০.	মোহেদী আহসান	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দত্তপাড়া সরকারি কলেজ, নোয়াখালী
৪১.	মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিসেন্ট অ্যাসোসিয়েট ও রাঙ্গুনিয়া প্রেস, চট্টগ্রাম এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪২.	মারজান সবুজ	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৪৩.	ড. কাইউম	অধ্যাপক, বাণিজ্য অনুষদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী
৪৪.	ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জী	সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার, বিআইবিএম, ঢাকা; সন্দ্বীপ
৪৫.	সওগাতুল আনোয়ার খান	ব্যারিস্টার; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

৪৬.	সালেহা বেগম	সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, গ্রামীণ কমিনিকেশন
৪৭.	নুরুল আকতার	সভাপতি, সন্দীপ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম লি.
৪৮.	মো খোরশেদ	সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার; সাংবাদিক দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।
৪৯.	চৌধুরী ফরিদ	সাংবাদিক; সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম পেসক্লাব ও বিভাগীয় প্রধান, চ্যানেল আই চট্টগ্রাম
৫০.	ইফতেখারুল ইসলাম	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম
৫১.	শৈবাল আচার্য্য	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল
৫২.	ইফতেখার ফয়সল	স্টাফ রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, চট্টগ্রাম
৫৩.	এনডিসি জোবায়ের আহমেদ	কমডোর (অব.); ভাইস চেয়ারম্যান, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যু. লি. এবং সভাপতি, চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও গবেষণা পরিষদ
৫৪.	তপন দত্ত	প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম
৫৫.	অনিন্দ্য টিটো	ব্যুরো প্রধান, জিটিভি, সিটিজি
৫৬.	জামশেদ রহমান	ব্যুরো প্রধান, যমুনা টিভি, সিটিজি
৫৭.	মাসুদুল হক	ব্যুরো ইনচার্জ, ডিবিই, সিটিজি
৫৮.	সাইফুদ্দন আবু আনসারী	প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি
৫৯.	খোরশেদুল আলম কাদেরী	পরিচালক, ওয়াগ্গাছড়া টি লিমিটেড, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬০.	ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬১.	হান্নানা বেগম	অধ্যাপক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬২.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার	নির্বাহী পরিচালক (এলপিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৩.	শেখ আলী আহমেদ টুটুল	গবেষণা পরামর্শক; উপ-পরিচালক, এইচডিআরসি এবং যুগ্ম-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৪.	পার্থ সারথী ঘোষ	এফএভিপি অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. নারায়ণপুর, শেরপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৫.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৬.	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	অধ্যক্ষ, কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর এবং সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৭.	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল	ব্যাংকার; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৬৮.	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ	ফেলো চার্টার্ড অ্যাকউন্টেন্ট; পরিচালক ও বোর্ড চেয়ারম্যান, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লি. ঢাকা এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৬৯.	ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা বাংলাদেশ এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭০.	ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭১.	শাহানারা বেগম	সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ নড়াইল এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭২.	ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন	অধ্যাপক; অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৩.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ফার্স্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৭৪.	মেহেরুননেছা	নারী উদ্যোক্তা, নরসিংদী এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ওয়েবিনারে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশাসমূহ

- রাজধানী স্থানান্তর করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানে নিতে বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।
- জেলা ও অঞ্চলের বেশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের নিরিখে বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেওয়ার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।
- চট্টগ্রামে একটি অটিজম হাসপাতাল ও একটি মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামে হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট, অর্থোপেডিক, ডায়াবেটিক, চক্ষু, কিডনি, ক্যানসার, শিশুরোগসংক্রান্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।
- চট্টগ্রামে সড়ক-মহাসড়কে ওজন স্কেলের কারণে চরম ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিরসনে দেশে একসাথে ৩৫টি মহাসড়কে ওজন স্কেল দেওয়ার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।
- চট্টগ্রাম বিভাগসহ চট্টগ্রাম শহরের অবৈধ দখলে চলে যাওয়া ৩৫টি খাল পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামে বিভাগে একটি বে টার্মিনাল নির্মাণকাজ দ্রুত বাস্তবায়নে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রাম বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক কৃষি এবং লবণ শিল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামে রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্যে একটি অঞ্চল গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- কুমিল্লায় স্থাপিত ইপিজেডে বিমানবন্দর ও রেললাইন স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- নোয়াখালীর চেয়ারম্যানঘাট ও সুবর্ণচর অঞ্চলে সৃষ্ট চরে দ্রুত একটি ইপিজেড নির্মাণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- নোয়াখালীতে একটি বিমানবন্দর নির্মাণের জন্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।
- নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আশঙ্কাজনকভাবে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় করণীয় নির্ধারণে বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কুমিল্লায় কর্মসংস্থান ও শিল্প সংকট নিরসনে সর্বাগ্রে জেলার সড়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- কুমিল্লার খাদি ও বাটিক শিল্পের তাঁতীদের স্বল্প সুদে ঋণ ও প্রণোদনা দিতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- কুমিল্লার ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প নিতে হবে।
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় একটি ইপিজেড স্থাপনে বাজেটে জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলাসজহ বিল ও উঁচু জমি ফল উৎপাদনে সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সংরক্ষণ-প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সুবিধাসংবলিত প্রকল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

- ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাঁস, আশুগঞ্জের লালপুরে মিঠাপানির মৎস্য চাষ এবং শুঁটকি শিল্পের জন্য বাজেটে প্রকল্প নিতে হবে।
- সন্দ্বীপের জন্য বাজেটে একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সন্দ্বীপের ঐহিত্যবাহী নৌকা শিল্প পুনরুদ্ধার ও ব্লু-ইকোনমির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- সন্দ্বীপের সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হওয়ার শঙ্কা দূরীকরণে গবেষণাসহ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- সন্দ্বীপের যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- সন্দ্বীপের ১৭০০ কোটি টাকার ব্যাংক ডিপোজিটের মধ্যে মাত্র ২০০ কোটি টাকা সন্দ্বীপে বিনিয়োগ হচ্ছে এবং বাকি টাকা অন্য জেলায় বিনিয়োগ হচ্ছে, আসন্ন বাজেটে সন্দ্বীপের টাকার অন্তত অর্ধেক স্থানীয় উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।
- সন্দ্বীপের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- দ্বীপজেলা সন্দ্বীপ নিয়ে সন্দ্বীয় বাজেট প্রণয়নে বাজেটে বিশেষ একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সন্দ্বীপ জেলায় যাতায়াতে কুমিড়া থেকে গুপ্তছড়া নৌরুট প্রতিষ্ঠায় পন্টুন নির্মাণের জন্য বাজেটে জরুরিভাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।
- সন্দ্বীপ গুপ্তছড়া পন্টুন ড্রেজিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনে সন্দ্বীপের যাতায়াতকারীদের কাছ থেকে বাড়তি ৩০ থেকে ৫০ টাকা আদায় করা যায়।
- রাঙ্গামাটির সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের বিকাশে স্থানীয়পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বাজেটে লোকাল কমিউনিটি বেজড প্রকল্প নিতে হবে।
- রাঙ্গামাটির তাঁত শিল্প বিকাশে উদ্যোক্তাদের জন্য প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠায় বাজেটে বিশেষ প্রকল্প রাখতে হবে।
- রাঙ্গামাটিতে ফলমূল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের জন্য শিল্প স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- রাঙ্গামাটিতে প্রসূতি মৃত্যু, শিশুমৃত্যু, নারী স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
- রাঙ্গামাটির জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে।
- কক্সবাজারকে আধুনিক একটি শহর হিসেবে গড়ে তুলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- কক্সবাজারের পরিবেশের জন্যে মহাক্ষতিকর বিভিন্ন প্রকল্পের প্রভাব নিরসনে বাজেটে দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।
- কক্সবাজারের পর্যটন খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ টুরিজম অ্যালাউন্স হিসেবে স্থানীয় বাসিন্দা ও চাকরিজীবীদের প্রদান করতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- কক্সবাজারের লবণ শিল্পে নিয়োজিত চাষিদের জন্যে কম দামে রঙিন ও লিকুইড সালফেট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- খাগড়াছড়ির হস্তশিল্প বিকাশে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- খাগড়াছড়ির হলুদ চাষ সম্প্রসারণে বাজেটে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

- খাগড়াছড়ি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
- বান্দরবান জেলায় শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে চট্টগ্রামের বাণিজ্য অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেললাইনের উন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
- মিরসরাইয়ে নির্মাণাধীন ইপিজেডের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাজেট বিশেষ ও পৃথকভাবে বরাদ্দ করতে হবে।
- চট্টগ্রাম কালুরঘাটে সেতু নির্মাণের ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মিরসরাইসহ বিভিন্ন এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামের আন্দকিল্লায় ২৫০ শয্যার হাসপাতালটিকে ১০০০ শয্যায় উন্নীত করে মেডিকেল কলেজে পরিণত করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চিকিৎসকদের ৮২টি শূন্যপদে চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জকে ব্যবসায়িক বিশেষ জোন হিসেবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- চট্টগ্রামের কর্ণফুলী-হালদা নদীসহ অন্যান্য নদ-নদীর অবৈধ দখল অপসারণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্যে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- অক্ট্রয় ট্যাক্স, যা আগে বাতিল করা হয়েছিল, তা পুনরায় চালু করতে হবে।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দ্বিগুণ ট্যাক্স প্রদানের বিধান বন্ধে বাজেটে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।
- চট্টগ্রামের কদমতলীতে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের পূর্ণাঙ্গ উপযোগিতা পেতে বর্তমান স্টেশনটিকে ১ কিলোমিটার পশ্চিমে সরিয়ে নিতে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

জেন্ডার বাজেটের জন্য সুপারিশ

হান্নানা বেগম

জেন্ডার বাজেট ২০২২-২৩

- বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় স্থানীয় থানার নিয়মিত টহল জোরদার করা যেতে পারে। এতে করে ছাত্রীরা ইভটিজিংয়ের শিকার না হয়ে নিরাপদে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে।
- ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে যাচাই করে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দূরবর্তী ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত জেলা ও পাহাড়ি অঞ্চলে এই কর্মসূচি জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রথম প্রতিবন্ধক হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে বালিকা মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া। এই ক্ষেত্রে যদি সরকার উদ্যোগী হয়ে ঘোষণা করে যে ১৮ বছর পরবর্তীকালে গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হলে বিয়ের খরচ অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাহলে বাল্যবিবাহ কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
- মা ও শিশুর উন্নতসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার।
- নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেলের ডেটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন।
- বিভাগীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিপণিবিতান চালু করা প্রয়োজন।
- কৃষিক্ষেত্রে নারীর মজুরিহীন শ্রম। কৃষিখাতে শস্য উৎপাদনের নারীর ব্যাপক অবদান রয়েছে। বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ ও ফলমূলের বাগান তৈরির প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তবে নারীর মজুরিহীন এ রকম কার্যক্রমের যথাযথ স্বীকৃতি নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর মজুরিহীন সকল কার্যক্রমের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।
- কৃষিক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের জন্য যেসব বাধা কাজ করে তা হলো— ১. স্বল্পসুদে কৃষিঋণ সুবিধা প্রাপ্তির স্বল্পতা, ২. বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব, ৩. প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার কৃষিসহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা ৩. তদপুরি রয়েছে সামাজিক বাধা।
- কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান, তাদের উদ্যোগী ও প্রশংসিত কাজ নিয়ে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ভাবমূর্তি বাড়ানো এবং গণমাধ্যমকে আরো বেশি জেন্ডারবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন প্রচারণা চালানো। কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো প্রদর্শন করা।
- একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয় না। এটি একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া নারীর স্বার্থের অনুকূলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এ-সংক্রান্ত প্রযুক্তি আমদানি করা দরকার।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালির কাজের মর্যাদার উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশিদারিমূলক দায়িত্ব বণ্টনকে উৎসাহিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মকাণ্ড থাকা প্রয়োজন।
- প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি কর্মস্থানেই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।
- প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে মহিলা প্রশিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রসারিত করা দরকার।
- গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকাণ্ড আরও জোরদারকরণ এবং মহিলাদের ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে।
- নদীভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের তালিকা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সব পর্যায়ে নারীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করা দরকার।
- নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলাপর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে ডেটাব্যাংক থেকে নারী কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করা দরকার।
- দেশে বাল্যবিয়ে রোধে জিআইইউর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির মাধ্যমে কাজীদের বাল্যবিয়ের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- বর্তমানে চা বাগানে নিয়োজিত শতকরা ৬৫ ভাগই নারী শ্রমিক এবং চায়ের পাতা সংগ্রহকারীদের শতভাগই মহিলা শ্রমিক। সুতরাং চা বোর্ড কর্তৃক তাদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন।
- পোশাক শিল্প খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নারীবান্ধব করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন।
- আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রত্যেক থানায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা।
- কারাবন্দীদের আদালতে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক প্রিজনভ্যানের অথবা প্রিজনভানে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা।
- প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূলে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।
- আইসিটিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।

- গৃহায়ণ ও নগরায়ণ পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য আবাসন সুবিধা সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা।
- প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।
- নারীর প্রতি সহিংস হতে প্ররোচিত করে এমন ধরনের অনুষ্ঠান যাতে না হয়, সে বিষয়ে উপযুক্ত নিবৃত্তিমূলক আইন প্রণয়ন করা।
- মসজিদভিত্তিক প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলন করার বিষয়টি বিবেচনা করা।
- প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারীদের পরিবেশ সংরক্ষণের অবদানস্বরূপ স্বীকৃতি ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা।
- ভূমিবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি বাসে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা।
- নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং নৌবাণিজ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে।
- পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের হস্তনির্মিত পণ্য সামগ্রী Duty Free Shop-এ বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ইন্টারনেটে নারী হয়রানি প্রতিরোধ এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর মনিটরিং ও আইন প্রণয়ন।
- বিদ্যুৎখাতে কর্মরত নারীদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা সন্তানদের সেন্টারে নিরাপদে রেখে কর্মস্থলে কাজ করতে পারেন।
- নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তাঁদের তালিকা প্রণয়ন ও ডেটাবেজ তৈরি করা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

কার্যনির্বাহক কমিটি ২০২২-২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	এ জেড এম সালেহ্
যুগ্ম-সম্পাদক	:	বদরুল মুনির শেখ আলী আহমেদ টুটুল
সহ-সম্পাদক	:	পার্থ সারথী ঘোষ মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন মোঃ হাবিবুল ইসলাম
সদস্য	:	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল ড. জামালউদ্দিন আহমেদ *এফসিএ* অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী অধ্যাপক শাহানারা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম মোঃ মোজাম্মেল হক শাহেদ আহমেদ মেহেরুননেছা খোরশেদুল আলম কাদেরী নেছার আহমেদ মোহাম্মদ আকবর কবীর মোঃ আখতারুজ্জামান খান

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৮০-০২-২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com
Website: www.bea-bd.org

978-984-35-2528-4